শাকুর মজিদ

হুমায়ূন আহমেদ

যে ছিল এক মুগ্ধকর



১৯৮৬ সালে হুমায়ূন আহমেদের একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার
নিতে গিয়ে তাঁকে কাছ থেকে দেখতে শুরু করেন এ বইয়ের
লেখক শাকুর মজিদ। ২০০৮ সাল থেকে হুমায়ূন
আহমেদের সঙ্গে মিশেছেন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে।
প্রায় ৩২ বছর ধরে কাছে এবং দূরে থেকে হুমায়ূন আহমেদকে
তিনি যেভাবে দেখেছেন তার বিবরণ
ধরা থাকল এই বইয়ে।

হুমায়ূন আহমেদ : যে ছিল এক মুগ্ধকর শাকুর মজিদ



হুমায়ূন আহমেদ ৪০ বছরের বেশি সময় ধরে লেখালেখি, নাট্যনির্দেশনা ও চলচ্চিত্র নির্মাণে ব্যাপৃত ছিলেন। এর মধ্যে প্রায় ৩২ বছর ধরে শাকুর মজিদ তাঁর সঙ্গে মিশেছেন। একটা পর্যায়ে শাকুর মজিদ ছিলেন মূলত হুমায়ূন আহমেদের ব্যক্তিজীবনের অন্তরঙ্গ অনুরাগী আর কৌতূহলী পর্যবেক্ষক। তাঁর একান্ত নিজস্ব অনুভূতিগুলোই এই বইতে প্রকাশ পেয়েছে। বড় মাপের কোনো মানুষের কথা বলতে গিয়ে তাঁদের কাছের মানুষেরা প্রায়শই অতিশয়োক্তি করে তাঁদের রচনাকে অনাকর্ষক করেন; সাধারণ পর্যায় থেকে তুলে তাঁকে মহামানবের স্তরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। শাকুর মজিদ এ ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এ বই কেবল স্মৃতিকথাই নয়, এর মধ্যে একজন সাধারণ লেখকের অসাধারণ হয়ে ওঠা এবং তাঁর বিবর্তনের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।

প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী



শাকুর মজিদ

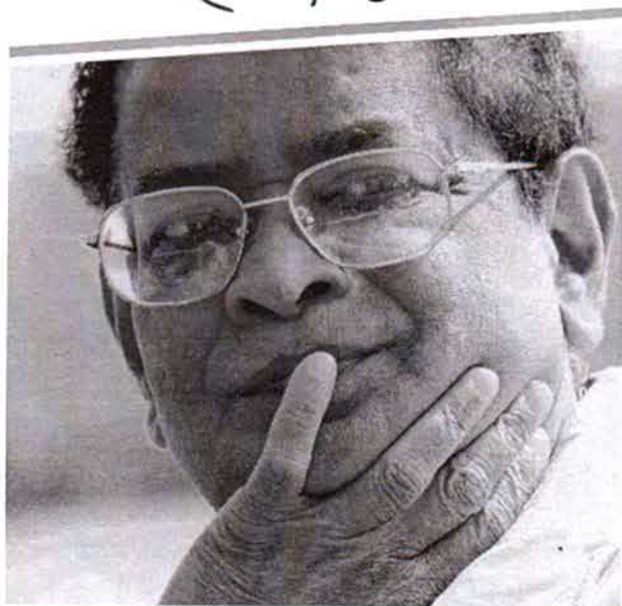
জন্ম ২২ নভেম্বর ১৯৬৫, সিলেটের বিয়ানীবাজার উপজেলার মাথিউরা গ্রামে। শৈশবে কবিতা দিয়ে লেখালেখি শুরু। বেশ কয়েকটি টেলিভিশন-নাটক ও টেলিফিল্মের চিত্রনাট্যের রচয়িতা। নাটক-টেলিফিল্ম পরিচালনাও করেছেন। বাউল শাহ আবদুল করিমকে নিয়ে লিখেছেন মঞ্চনাটক *মহাজনের নাও*, বানিয়েছেন তথ্যচিত্র *ভাটির পুরুষ*। দেশ-বিদেশের ভ্রমণচিত্র নিয়ে প্রায় তিন শ প্রামাণ্যচিত্র বানিয়েছেন। প্রকাশিত হয়েছে *অষ্টভ্রমণ*, *সুলতানের শহর*, *লেস ওয়ালেসার দেশে*সহ ১৩টি ভ্রমণকাহিনি। মঞ্চনাটকের আলোকচিত্র নিয়ে বেরিয়েছে বাংলাদেশের প্রথম আলোকচিত্র গ্রন্থ *রিদম অন দ্য স্টেজ*। আত্মজৈবনিক গ্রন্থ *ক্লাস সেভেন ১৯৭৮*। আলোকচিত্রী ও নির্মাতা হিসেবে দেশে-বিদেশে বেশ কয়েকটি পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছেন।

শাকুর মজিদ একজন পেশাদার স্থপতি এবং আহসানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের খণ্ডকালীন শিক্ষক।

হুমায়ূন আহমেদ : যে ছিল এক মুগ্ধকর

শাকুর মজিদ

হুমায়ূন আহমেদ
যে ছিল এক মুগ্ধকর



প্রথমা প্রকাশন

উৎসর্গ

বন্ধু মাজহারুল ইসলামকে
যার সঙ্গে পরিচয় না হলে হুমায়ূন আহমেদ হয়তো সারা জীবন
আমার কাছে অচেনাই থেকে যেতেন

সবিনয় নিবেদন

খুব কাছে থেকে দেখা কোনো ব্যক্তি বা বিষয়ের বর্ণনা দেওয়া কঠিন। আরও কঠিন খুব কাছের মানুষ সম্পর্কে স্মৃতিচারণা করা। আমার কাজটা অনেক সহজ হয়েছিল অন্য কারণে।

হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে আমার পরিচয় ও জানাশোনা প্রায় ৩২ বছরের। এ দীর্ঘ সময়ে আমরা তিনটি পর্যায় পার হয়েছি। এক সময় তিনি আমার কাছে ছিলেন দূর আকাশের তারার মতো, তারপর এই মর্ত্য-চরাচরে আমার সামনে বিচরণ করা আর দশজন মানুষের একজন এবং শেষে আমার গায়ের সঙ্গে গা লাগিয়ে, পায়ে পায়ে হেঁটে যাওয়া কোনো এক সহযাত্রী। এই তিন স্তরে আমি তাঁকে যে সময় যেভাবে দেখেছি সে ভাবেই সে সময়ের কথা লিখেছি।

ক্যামেরায় যেমন আমরা লং শট, মিড শট, ক্লোজ শটে একটা চরিত্র বা বিষয়কে দেখি, তাঁর প্রতি আমার দৃষ্টিও ছিল সে রকম। বহুবার আই-লেভেল থেকে সরে এসে তাঁকে লো-অ্যাঙ্গেল বা টপ অ্যাঙ্গেলেও দেখার চেষ্টা করেছি। তাঁকে যখন যেভাবে দেখেছি সেভাবে তার বর্ণনা দিয়েছি। সেসব বিবরণ যখন নিজে পাঠ করেছি, কখনো কখনো মনে হয়েছে, তাঁর সঙ্গে আমার কোনো হার্দিক ঘনিষ্ঠতাই ছিল না। আমার দেখার চোখে ত্রুটি থাকতে পারে, কিন্তু তার প্রকাশে আমি কোনো চাতুর্যের আশ্রয় নিইনি। সাদা-সিধে, সহজ-সরল, গড়পড়তা উচ্চতার একজন মানুষকে অস্বাভাবিক আকার দিয়ে বর্ণনা করার চেষ্টা করিনি। বত্রিশ বছরের স্মৃতিচারণায় তথ্যগত ভ্রান্তি না রাখার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করেছি। তার পরও কোথাও কোনো নাম, সন-তারিখ বা স্থান যদি ওলট-পালট হয়ে যায়, পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের চেষ্টা করব।

হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে আমার একান্ত স্মৃতিগাঁথা নিজের মধ্যেই হয়তো থেকে যেত, যদি *প্রথম আলোর* সম্পাদক মতিউর রহমান আমাকে এ বিষয়ে বইটি লেখার আমন্ত্রণ না জানাতেন। একই পত্রিকার ব্যবস্থাপনা সম্পাদক সাজ্জাদ শরিফের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। এ ছাড়া *প্রথম আলোর* নিউজ রুম ম্যানেজার অরুণ বসু, প্রথমা প্রকাশনের প্রধান সমন্বয়কারী জাফর আহমদ রাশেদ বইটিকে যথাসম্ভব নির্ভুল করার জন্য যে প্রয়াস নিয়েছেন, তা দেখে আমি মুগ্ধ। কৃতজ্ঞতা *প্রথম আলো* ও প্রথমা পরিবারের জন্য।

শাকুর মজিদ
৩০ জানুয়ারি, ২০১৩

সূচিপত্র

শঙ্খনীল মুগ্ধতা	১১
প্রথম দর্শনের মুগ্ধতা	১৯
ছিয়াশির বইমেলায়	৩৪
রবীন্দ্র-রচনার মুগ্ধ পাঠক	৩৫
প্রধান অতিথির মুগ্ধতা	৩৭
অঙ্গনা ও হুমায়ূনের জহুরি চোখ	৩৯
বহুব্রীহি ও 'তুই রাজাকার'	৪৮
বাংলাবাজার পত্রিকা ও বিস্মৃত হুমায়ূন	৫২
আগুনের পরশমণি : এক চলচ্চিত্রকারের আবির্ভাব	৫৪
টইটুম্বুর ও হুমায়ূন-জননী	৫৮
ভাটির পুরুষ ও কিছু মুগ্ধতার গল্প	৬১
২৪ ক্যারেটম্যান ও বৈরাতি যখন এক কাতারে	৬৬
প্রিয় মরণগীতি	৬৯
এক দেশান্তরী যুবকের মুগ্ধতা	৭৫
অন্তরঙ্গ পর্বের সূচনা	৮২
তাঁর সঙ্গে সুন্দরবনে	৯৯
অকৃতী অধমের হাতে পাঁচটি নীলপদ্ম	১১১
তাঁর শেষ ছবি	১১৬
আড্ডাবাজ হুমায়ূন	১২৪
যে আড্ডায় তিনি ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন	১৩৩
তাঁর কয়েকটি জন্মদিন	১৩৬
দখিন হাওয়ার দুঃখী আড্ডা	১৪২
আপনি ভালো আছেন তো!	১৪৭



শঙ্খনীল মুগ্ধতা

১৯৮০ সাল। আমি তখন ক্লাস নাইনে পড়ি। পাঠ্যবইয়ের বাইরেও গল্প-উপন্যাসের প্রতি আমার বাড়তি ঝোঁক। বিশেষ করে রহস্য উপন্যাস। কাজী আনোয়ার হোসেন, রোমেনা আফাজ, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, নিমাই ভট্টাচার্য্য প্রায় শেষ। আমি যেখানে পড়াশোনা করি, এটা একটা আধা সামরিক আবাসিক বিদ্যালয়। পড়ি ক্লাস নাইনে, কিন্তু কাগজে-কলমে ক্লাস সেভেন থেকেই ওটাকে কলেজ বলা হয়। ক্যাডেট কলেজ।

ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজের লাইব্রেরিটা চমৎকার। দোতলা দালানের এই লাইব্রেরি ভবনে থরে থরে বই। ইংরেজি এবং বিদেশি বই-ই বেশি। বাংলা বইও একেবারে কম নয়। কিন্তু আমার পছন্দের বইগুলো দোতলার কোনার দিকের শেলফে। এখানে বাংলা ফিকশনের সমাহার।

নাম না-জানা কিংবা অচেনা লেখকদের ভালো বই বেছে নেওয়ার একটা কৌশল আবিষ্কার করি আমি। বইয়ের তাকে যে বইটির মলাট ছেঁড়া বা ঝুলঝুলা বাঁধাই, এ রকম বই-ই বেশির ভাগ সময়ই লাইব্রেরি থেকে ইস্যু করি। একসময় ফিকশনের শেলফে বাঁধাই-ছুটে-যাওয়া একটা বই দেখি। নাম *শঙ্খনীল কারাগার*। লেখকের নাম হুমায়ূন আহমেদ।

কিছুদিন আগে এক বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ টেলিভিশনে হুমায়ুন ফরীদি অভিনীত একটা নাটক দেখেছিলাম। নাম *নির্বাসন*। মুক্তিযুদ্ধে আহত পঙ্গু এক তরুণ বিছানায় শুয়ে থাকে। জরী নামের একটি মেয়েকে সে পছন্দ করত, তার বিয়ে হয়ে যায়। ঘরে বসে ছেলেটা সারা দিন উল্টা সংখ্যা গোনে। গল্প হুমায়ূন আহমেদের। নাট্যরূপ দিয়েছেন অভিনেতা আফজাল হোসেন। নাসির উদ্দীন ইউসুফ নাটকটি প্রযোজনা করেছিলেন।

শঙ্খনীল কারাগার হাতে নিয়ে চিন্তায় পড়ে যাই। ঔপন্যাসিক হিসেবে এ নামের কোনো লেখকের কথা তো শুনিনি! হাতে নিয়ে বইটি ওল্টাই। দেখি, প্রায় পুরো বইটিই আন্ডারলাইন করা। কয়েক হাতে করা। কিছু পেনসিলে, কিছু লাল কালির কলমে, কিছু বলপয়েন্টে। বইটি ইস্যু করার জন্য লাইব্রেরিয়ানের কাছে যাই। সর্বোচ্চ সাত দিন নিজের কাছে রাখা যায় বই। সাত দিনের পর ফেরত দিলে দিনপ্রতি ২৫ পয়সা জরিমানা। বই কেউ ফেরত না দিলে মহা শাস্তি। কলেজ থেকে বহিষ্কার পর্যন্ত হতে পারে।

লাইব্রেরিয়ান শামসু ভাই হতাশ করে দিয়ে বলেন, দুই দিনের মধ্যে এ বই ফেরত দিতে হবে। কিছু বই বাঁধাইয়ের জন্য চট্টগ্রাম পাঠানো হবে। এ বইটাও যাবে। এ বইটির চাহিদা অনেক, দ্বিতীয় কোনো কপি নেই। আমি রেজিস্ট্রি বুকে সাইন করে বইটি নিয়ে হাউসে চলে যাই।

ক্যাডেট কলেজে অনেক জটিল নিয়মকানুন। দুপুরের খাবারের পর 'রেস্ট টাইম' ৪৫ মিনিট। এ সময় চিত হয়ে শুয়ে থাকা বাধ্যতামূলক। প্রথম ১৫ মিনিট পার হলে রুম প্রিফেক্টের অনুমতি নিয়ে বাকি আধা ঘণ্টা 'গল্পের বই' পড়া যায়। এ সময় ক্লাসের বই পড়া নিষেধ। পরবর্তী ৩০ মিনিট ফ্রি টাইম। ফ্রি টাইমে যেকোনো বই পড়া যায়; চিঠি লেখা, জুতা পালিশ করা যায়। এর পর বাকি দেড় ঘণ্টা 'আফটারনুন প্রেপ টাইম'। প্রেপ টাইমে গল্পের বই পড়া নিষেধ। ক্যাডেট কলেজের ছেলেরা চালাক-চতুর হয়। আইন ভাঙার কৌশল বের করতে তাদের সমস্যা হয় না।

AMARBOI.COM

আমি রেস্ট টাইমেই বইটি পড়া শুরু করে দিই। রেস্ট টাইম-ফ্রি টাইম শেষ, বই শেষ হয় না। এর মধ্যেই বাংলা বইয়ের মলাট এঁটে দিয়েছি *শঙ্খনীল কারাগার*-এর মলাটের ওপরে। ফ্রি টাইম শেষে বই নিয়ে 'প্রেপ'-এ যাই। নোট খাতা আর কলম নিয়ে বসে থাকি। আমার সামনে পাঠ্যবইয়ের মলাটের ভেতর *শঙ্খনীল কারাগার*। বই পড়ি, কয়েক লাইন পর পর খাতার ওপর লিখি—মন্টুর কথা, রাবেয়ার কথা, রুনু-ঝনুর কথা, সদ্য রিটায়ার করা বাবার কথা। রাবেয়া আপার জন্য আমার খুব মন খারাপ হয়। এই আপা অনেক দুঃখী। তাঁর বিয়ে হচ্ছে না। গায়ের রংটা যে কালো তাঁর!

দুপুরের প্রেপেও বইটা শেষ হয় না। 'আফটারনুন প্রেপ'-এর পর 'গেমস'। আজ খেলতে ইচ্ছে হচ্ছে না। মাথার মধ্যে রুনু এসে ভর করে। রুনু একটা ভেজাল করে ফেলেছে। অন্য ছেলেকে লেখা একটা চিঠি চলে গেছে তার হবু বরের কাছে। বর এখন রুনুকে বিয়ে করতে চায় না। সে চায়

ঝুনুকে। ঝুনুও রাজি হয়ে যায়। রুনুর কী হবে তাহলে? গেমস শেষ হয়। মাগরিবের নামাজ শেষে আবার ক্লাসরুমে ফিরে যাই এবং বইটি শেষ করি।

বই শেষ করে আর কিছু ভালো লাগে না। রাবেয়া আপার জন্য এক অপরিসীম মায়া জমে মনে। তাঁর শেষ চিঠিটি আবার পড়ি। বারবার পড়ি। মাঝে মাঝে টের পাই, গাল বেয়ে পানি পড়ছে। এ সময় এমনটি প্রায়ই হতো। খুব সহজেই কান্না এসে যেত। নিঃশব্দে চোখ মুছে *শঙ্খনীল কারাগার*-এর জ্যোৎস্নার চাদরে ডুব দিই। লেখক বইটি শেষ করেছেন এক রাতের বর্ণনা দিয়ে। এই বর্ণনার মধ্যে কাব্য আছে। গদ্য পড়তে পড়তে মনে হয় কবিতা পড়ছি :

> গভীর রাতে ঘুম ভেঙ্গে যায় প্রায়ই। ছাড়াছাড়া অর্থহীন স্বপ্ন দেখতে দেখতে হঠাৎ জেগে উঠি।...মাথার কাছের জানালা মনে হয় সরে গিয়েছে পায়ের কাছে।
>
> কোনো কোনো রাতে অপূর্ব জোছনা হয়। সারা ঘর নরম আলোয় ভাসতে থাকে। ভাবি, একা একা বেড়ালে বেশ হতো। আবার চাদর মুড়ি দিয়ে নিজেকে গুটিয়ে ফেলি। যেন বাইরের উথাল পাথাল চাঁদের আলোর সঙ্গে আমার কোন যোগ নেই।
>
> মাঝে মাঝে বৃষ্টি নামে। এক ঘেয়ে কান্নার সুরের মতো সে শব্দ।...

ক্লাসে আমার পাশে বসত ফজলে। ফজলেও খুব বইপোকা। সে বলল, এই লেখকের আরও দুটো বই আছে লাইব্রেরিতে। একটির নাম *নন্দিত নরকে*, আরেকটি *তোমাদের জন্য ভালোবাসা*।

দুই দিনের মাথায় *নন্দিত নরকে* পড়া হয়ে যায়। পর পর দুটি বই পড়ার পর মাথা আরও ঘুরপাক খায়। দুই বইতেই একই চরিত্র। এখানেও রাবেয়া, মন্টু, খোকা।

*নন্দিত নরকে*র কাহিনিটা বেশ জটিল। বোবা, অবিবাহিতা বড় বোনের পেটে বাচ্চা আসার কারণে মন্টু বাড়ির গৃহশিক্ষককে খুন করে। কী বিশ্রী অবস্থা! মন্টুর ফাঁসি হয়ে যায়। ওর জন্য খুব মায়া লাগে। মন্টু তো আমার বয়সীই হবে।

নন্দিত নরকে আসলে লেখকের লেখা দ্বিতীয় বই, কিন্তু প্রকাশের দিক থেকে প্রথম। বেরোয় ১৯৭২ সালে। এই বইয়ের পেছনের মলাটে দেখি বেশ কজন বুদ্ধিজীবী মন্তব্য লিখেছেন। মনে পড়ে, ড. আহমদ শরীফ তাঁর ভূমিকায় লিখেছিলেন, 'হুমায়ূন আহমেদ বয়সে তরুণ, মননে প্রাচীন দ্রষ্টা, মেজাজে জীবন-রসিক, স্বভাবে রূপদর্শী, যোগ্যতায় দক্ষ রূপকার। ভবিষ্যতে তিনি বিশিষ্ট জীবন শিল্পী হবেন—এই বিশ্বাস ও প্রত্যাশা নিয়ে অপেক্ষা করব।'

AMARBOI.COM

এরপর পড়ি *তোমাদের জন্য ভালোবাসা*। ভিন্ন গ্রহ থেকে এক মানুষ আসে পৃথিবীতে। ফজলে বলে, ওটা হচ্ছে 'সায়েন্স ফিকশন'। আমি প্রথম জানলাম যে সায়েন্স ফিকশন নামেও একধরনের উপন্যাস আছে। *তোমাদের জন্য ভালোবাসাটা* খুব বেশি ভালো লাগল না। আমি *শঙ্খনীল কারাগার* আর *নন্দিত নরকে* নিয়েই মজে থাকি।

তিনটি বই পড়া শেষ হলে প্রায় প্রতিদিনই লাইব্রেরিয়ান শামসু ভাইকে জিজ্ঞেস করি, 'লাইব্রেরিতে হুমায়ূন আহমেদের আর কোনো বই আছে?'

শামসু ভাই একটা বড় রেজিস্ট্রি খাতা বের করেন। অনেকক্ষণ সময় নিয়ে, অনেক পাতা ওল্টানো-পাল্টানোর পর বললেন, 'না, আর নেই।'

আমি আবার ফজলের কাছে আসি। হুমায়ূন আহমেদ নামটা সে আগেও শুনেছে। বলল, 'বোধ হয় মারা গেছে। বেঁচে থাকলে তো আরও লিখত। ১৯৭২-এ *নন্দিত নরকে*, আর ১৯৭৩-এ *শঙ্খনীল কারাগার* বেরোনোর পরও আর লিখবে না কেন?' আমি তার কথা মেনে নিই।

এর কয়েক দিন পরের ঘটনা। 'ইন্টার হাউস লাইব্রেরি কমপিটিশন'-এ চার হাউসের ভাগে পড়ল চারটে বইয়ের ওপর আলোচনা। প্রতি হাউস থেকে একজন মঞ্চে যাবে বইয়ের ওপর আলোচনা করতে। আমাদের শহীদুল্লাহ হাউসের ভাগে পড়ল *শঙ্খনীল কারাগার*।

এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য বইটির ওপর নিজেও একটা রিভিউ লিখে জমা দিই। আমার উচ্চারণে সিলেটি আঞ্চলিকতার ছোঁয়া ছিল মাত্রাতিরিক্ত, তাই মঞ্চে আমাকে পাঠানো হয়নি। সেবার আমাদের হাউস 'বুক রিভিউ'তে ফার্স্ট হয়। আমার আনন্দ কে দেখে!

AMARBOI.COM

শঙ্খনীল কারাগার নিয়ে পরের বছর, ১৯৮১ সালে, বিটিভিতে নাটক প্রচারিত হলো। মুস্তাফিজুর রহমানের প্রযোজনায় ফেরদৌসী মজুমদার অভিনয় করলেন রাবেয়া আপার চরিত্রে, ছোট বোন রুনু সুবর্ণা মোস্তফা, ঝুনুর চরিত্রে নায়লা আজাদ নূপুর, বাবা মমতাজউদ্দীন আহমদ। নাটকটি দেখি আর মুগ্ধ হই।

১৯৮১ সালের শেষের দিকে এসএসসি পরীক্ষার 'টেস্ট' শুরু হয়। এই পরীক্ষায় বাংলা দ্বিতীয় পত্রে একটা বিষয় ছিল, রচনা। এই রচনার জন্য আমাদের প্রধান ভরসা ছিল হরলাল রায়ের লেখা বই। সেখানে প্রিয় লেখকের তালিকায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আর প্রিয় উপন্যাসে *দত্তার* কথা আছে। আমাদের অনেকেই তা মুখস্থ করে রেখেছে। পরীক্ষায় এলে ঝেড়ে দেবে।

বাংলা দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষা দিতে গিয়ে দেখি, পাঁচটা রচনার একটিতে

আছে 'তোমার প্রিয় বই'। সুযোগ পেয়ে যাই *শঙ্খনীল কারাগার* নিয়ে লেখার।

বাংলা পড়াতেন হুমায়ূন কবীর স্যার। টেস্টের খাতা নিয়ে ক্লাসে এসে তিনি সবার হাতে খাতা তুলে দিতেন। কে কোন কারণে কোথায় কম নম্বর পেল, এটা দেখানোই উদ্দেশ্য। এটা সব বিষয়ের শিক্ষকই করতেন।

যথারীতি একে একে ক্যাডেট নম্বর ডাকা হচ্ছে। একজন-একজন করে এসে খাতা নিয়ে যাচ্ছে। আমার খাতা আসছে না। সব খাতা সবার হাতে পৌঁছে গেছে। একটি খাতা স্যারের কাছে। এই খাতা হাতে নিয়ে মিস্টার হুমায়ূন কবীর ডাকেন, 'ক্যাডেট নম্বর ১২৩৬ কে?'

—'জি স্যার, আমি।'

খাতা হাতে পেয়ে আমি মহা খুশি। সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছি। হুমায়ূন কবীর স্যার ডেকে নিয়ে গেলেন ডায়াসের কাছে। সেখানে দাঁড়িয়ে পুরো রচনাটি পড়ে শোনাতে হলো ক্লাসের সবাইকে।

এর পর একটা সমস্যা হয়ে গেল—ক্লাসমেটরা প্রায় সবাই আমাকে হুমায়ূন আহমেদের বিষয়ে 'বিশেষজ্ঞ' বলে ডাকা শুরু করে দিল। হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাস নিয়ে নাটক হবে, আমার কাছে খবর চলে আসে। একসময় এ খবরও আসে যে হুমায়ূন আহমেদ আসলে মারা যাননি। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিস্ট্রির শিক্ষক। আমেরিকা গিয়েছিলেন পিএইচডি করতে। পিএইডি শেষ করে দেশে চলে এসেছেন। ১৯৮৩ সালের ১৮ আগস্ট বিটিভিতে *প্রথম প্রহর* নামে তাঁর একটি নাটক দেখানো হয়। কলেজ অডিটরিয়ামের রঙিন টেলিভিশনে আমরা সে নাটক দেখি। এটাই হুমায়ূন আহমেদের লেখা প্রথম টেলিভিশন নাটক।

উচ্চমাধ্যমিকের পাট চুকিয়ে ক্যাডেট কলেজ থেকে বের হই ১৯৮৪ সালে। কলেজ শেষ করে কিছুদিনের জন্য ঠাঁই হয় মাতৃভূমি সিলেটের এক গ্রামে—বিয়ানীবাজার থানার মাথিউরা গ্রাম। দিনরাত ভর্তি পরীক্ষার জন্য পড়াশোনা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই। একবার সিলেট শহরে গেলাম মেডিকেলের ভর্তি পরীক্ষা দিতে। শহরে দুই রাত থাকতে হলো বন্ধু তুহীনের বাসায়। তুহীনের ছোট ভাই ফাহিম (বর্তমানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কর্নেল) বলল, 'শাকুর ভাই, চলো, আজ পাশের বাসায় টিভি দেখতে যাব। খুব সুন্দর একটা ধারাবাহিক নাটক হচ্ছে—*এইসব দিনরাত্রি*। গত পর্বে বেকার ছোট ভাই একটা মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে এসেছে, দেখি আজ কী হয়!'

AMARBOI.COM

ফাহিমদের বাসায় টিভি নেই, টিভি দেখতে যেতে হয় পাশের বাসায়। আমার সংকোচ হয়। *এইসব দিনরাত্রি* দেখতে যাই না। পরে শুনি, এই নাটকের নাট্যকার হুমায়ূন আহমেদ। তখন খুব খারাপ লাগে।

এর পর বহু দিন যায়। সব ভর্তি পরীক্ষায়ই উত্তীর্ণ হই। ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং, আর্কিটেকচার—সবই। সিদ্ধান্ত নিই, আমি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়েই ভর্তি হব, আর্কিটেকচারে।

১৯৮৪ সালেই ভর্তি হলাম বটে, শুনলাম, এরশাদীয় সেশনজটের কল্যাণে ১৯৮৬ সালের আগে ক্লাস শুরু হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। এ সময় গ্রামের বাড়িতে বসে বসে সময় কাটানো আর গল্প-কবিতা-উপন্যাস পড়া ছাড়া কোনো কাজ হাতে ছিল না। পড়তে পড়তে একসময় লিখতেও ইচ্ছে করত। কবিতা, গল্প লিখি এবং ডাকযোগে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় পাঠাতেও থাকি। কোথাও কোথাও সেগুলো ছাপা হতো; কোথাও ছাপা হতো কি হতো না, তার খবরও জানতে পারতাম না।

আমার অবসর কাটে বই পড়ে। হাতের কাছে বা বন্ধুর ঘরে, যেখানেই হুমায়ূন আহমেদের কোনো বই পাই, পড়ে ফেলি। ঈদসংখ্যা বেরোলে খুঁজি কোথায় হুমায়ূন আহমেদ আছেন। পাওয়ামাত্র গোগ্রাসে গিলতে থাকি। ভাবি, যদি কোনো দিন ঢাকা যাওয়া হয়, এই লেখককে খুঁজে বের করে তাঁর সঙ্গে দেখা করবই।

এর মধ্যে আমাদের মারাত্মক পারিবারিক বিপর্যয় ঘটে। ১৯৮৫ সালের ২৪ জুলাই ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে আমার বাবা মারা যান। পাঁচ ভাইবোনের বড় ভাই হিসেবে আমার কাঁধে এসে পড়ে সংসারের বোঝা। শুনি, ঢাকায় টিউশনি করে অনেক টাকা কামাই করা যায়। আমার একাডেমিক রেকর্ড ভালো। বুয়েটে চান্স পেয়েছি, আবার বোর্ডে স্ট্যান্ড করা, সুতরাং টিউশনি করে পয়সা জমিয়ে নিজের খরচ চালাব, বাড়িতে ভাইবোনদের কিছু দেব, এই আশায় চলে আসি ঢাকায়। ঢাকা এসে ঠাঁই হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজের ডা. ফজলে রাব্বী ছাত্রাবাসের ২১ নম্বর রুমে। আমাদের কলেজের দু-তিনজন আছে হোস্টেলে, সুতরাং প্রায় জোর করে এসে থাকা শুরু করি। আলাউদ্দিনের (বর্তমানে আমেরিকার এক হাসপাতালের বিশিষ্ট সার্জন) ছোট বিছানায় দুজন কাত হয়ে ঘুমাই।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের ৮ নম্বর কামরাটি ছিল ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের ছেলেদের। সেখানেও যাই। বাবুর (ডা. মুহিব্বুল আবরার, সেভ দ্য চিলড্রেন) সঙ্গে পরিচয় হয়। বাবু আমাদের ব্যাচমেট, মেডিকেলে

AMARBOI.COM

ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। বাবুর একটা অটোফোকাস ক্যামেরাও আছে, ইয়াসিকা এমএফটু। চা-শিঙাড়া খাইয়ে বাবুর সঙ্গে ভাব জমানোর চেষ্টা করি। বাবুর ক্যামেরায় টিপ দিলেই ছবি ওঠে। ছবি তুলতে খুবই আনন্দ আমার। হোস্টেলের সামনে আলিয়া মাদ্রাসার গেটের কাছে ভিখিরিদের ছবি তুলি, নিউ মার্কেটে নিয়ে ফিল্ম প্রসেস করি। বি-টু সাইজের ছবি প্রিন্ট করে নিয়ে আসি। ১০ টাকায় পাঁচ কপি প্রিন্ট করা যায়।

একজন একটি টিউশনি জোগাড় করে দিয়েছে। যে মেয়েটিকে পড়াই, তার বড় ভাই মন্ত্রী (মাইদুল ইসলাম)। দিনে দুই ঘণ্টা, সপ্তাহে তিন দিন। মাসে ৬০০ টাকা বেতন। টিউশনি শেষে আমার হাতে অনেক সময়, আমি আরও কিছু কাজ চাই।

একসময় বাবু বলে, 'তুই তো লিখতে পারিস, পত্রিকায় লেখ না, অনেক টাকা পাওয়া যায়।'

পত্রিকায় ছাপার হরফে কেবল লেখা দেখেই তুষ্ট ছিলাম এত দিন। এখন শুনলাম, এখান থেকে টাকাও আসে। বিষয়টি মাথায় চক্কর দিতে থাকে। সিলেটের গ্রাম থেকে ডাকযোগে কয়েকটি লেখা পাঠিয়েছিলাম এক পত্রিকায়, কিছু কবিতা, কিছু গল্প। একটি কবিতা এবং একটি গল্প ছাপা হয়েছে অনেক আগে। তাহলে কি এগুলোর জন্য টাকা পাওয়া যাবে?

অনেক কষ্টে ঠিকানা জোগাড় করে হাজির হই টিকাটুলীর অভয় দাস লেনের ১৩/বি বাড়িতে। এই বাড়ি থেকে বেরোয় *মাসিক রোকসানা*। সম্পাদক হিসেবে নাম ছাপা হয় সৈয়দা আফসানার, কিন্তু পত্রিকা দেখেন প্রায়বৃদ্ধ এক ভদ্রলোক। তিনিই বিমান দুর্ঘটনায় নিহত পাইলট রোকসানার বাবা। মেয়ের নামে পত্রিকা বের করছেন। তাঁর বাসার ড্রয়িংরুমই পত্রিকার অফিস।

পত্রিকার একজন লেখক দেখা করতে এসেছেন শুনে তিনি খুবই খুশি। তিনি 'কোন' আইসক্রিম আনিয়ে খাওয়ান আমাকে। আইসক্রিম খাওয়ার ফাঁকে তাঁর কাছে আমার মনোবাসনা উত্থাপন করি। লেখার জন্য সম্মানী পাওয়া যায় কি না, জানতে চাই।

চশমার ফাঁক দিয়ে তিনি তাকান আমার দিকে। বলেন, গল্প-কবিতার জন্য টাকা নাই। কিছু ফিচার, অনুবাদ, এসবের কাজেই তিনি লেখকসম্মানী দেন, যত পৃষ্ঠা ছাপা হবে তত শ টাকা, এটা তাঁর পত্রিকার নিয়ম। জানতে চান, আমি কোন বিষয়ে লিখতে আগ্রহী।

আমার মাথায় কোনো বিষয় আসে না। মাথার মধ্যে তখনো হুমায়ূন আহমেদ। ভাবলাম তাঁর কাছে যাওয়ার এটা একটা সুযোগ হয়ে যেতে

AMARBOI.COM

পারে। আমি সময় নষ্ট না করে বলে ফেললাম, 'কোনো লেখকের ওপর লেখা যাবে?'

'কাকে নিয়ে লিখবেন?'

'হুমায়ূন আহমেদ।'

মনে হলো তিনি নাম শোনেননি। তাঁকে চেনানোর জন্য বললাম, '*এইসব দিনরাত্রি* নাটকটি যিনি লিখেছেন।'

'ঠিক আছে, লিখে আনুন, ছোট লেখা যেন হয়, এক-দেড় পৃষ্ঠা।'

অভয় দাস লেনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে একধরনের চাপা উত্তেজনা অনুভব করি। নিজেকে 'সাংবাদিক' হিসেবে চিন্তা করি আমি। সাংবাদিকেরা কেমন হয়, তা-ও জানি না। কোনো সাংবাদিকের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। কিন্তু কাজটা হাতছাড়া করা যাবে না। আমি উঠেপড়ে লাগি।

তখন মুঠোফোনের যুগ আসেনি। ছাত্রছাত্রীদের হোস্টেলে ফোন করার জন্য বিশেষ বাক্স থাকত। সেটাতে কয়েন ঢুকিয়ে ফোন করতে হতো। ঢাকা মেডিকেল কলেজের ডা. ফজলে রাব্বী ছাত্রাবাসের দুটি কয়েন বাক্সই ব্যস্ত থাকে। লাইনে দাঁড়াতে হয়। মেডিকেলের ছাত্ররা আমাদের মতো বাইরের আবাসিক অতিথিদের 'প্যারাসাইট' নামে ডাকে। প্যারাসাইটদের লাইনে দেখলে হোস্টেলের অরিজিনাল ছাত্ররা বিরক্ত হয়। কিন্তু উপায় নেই। আমাকে ফোন করতে হবে। আমি কয়েকটা সিকি হাতে নিয়ে দাঁড়াই এবং একসময় লাইনের সামনে এসে ফোন ধরার সুযোগ পাই। ফোন করি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এক্সচেঞ্জে। কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের ড. হুমায়ূন আহমেদকে চাই। ওপাশ থেকে অপারেটরের সংযোগ ঘটিয়ে দেন সায়েন্স ফ্যাকাল্টিতে কার্জন হলে। সেখানে যিনি ফোন ধরলেন, তিনি খুবই দয়াবান এক ভদ্রলোক। সাংবাদিক পরিচয় জানার পর তিনি আমাকে জানালেন, ড. হুমায়ূন আহমেদ এখন তাঁর রুমে নেই, তিনি বাসায় চলে গেছেন। তিনি তাঁর বাসার ফোন নম্বরটি দিয়ে দেন।

সঙ্গে সঙ্গে লাইন কেটে আরও দুটি সিকি ঢুকে যায় কয়েন বাক্সের ছিদ্র দিয়ে। ওপাশে ফোন ধরেন স্বয়ং ড. হুমায়ূন আহমেদ।

'স্যার, আমি *মাসিক রোকসানা* পত্রিকার সাংবাদিক, আপনার একটি সাক্ষাৎকার নিতে চাই। আমি কি আপনার বাসায় আসতে পারি?'

'আসুন। কবে আসবেন?'

'কাল আসি, স্যার?'

'কাল বিকাল তিনটায়।'

AMARBOI.COM

বাসার ঠিকানা জেনে ফোন রেখে কাঁপতে থাকি। কাল বিকেল তিনটা, এখন থেকে প্রায় ২২ ঘণ্টা বাকি। আমার চোখে মুগ্ধ হওয়ার স্বপ্ন। বাবুকে সব ঘটনা খুলে বলি। বাবু উৎসাহী হয়ে পড়ে। সে প্ল্যান করেছে, তাদের রুমের বড় টেপ-রেকর্ডারটা নিয়ে যাবে। সারা রাত জেগে নোটবুকে কতগুলো প্রশ্ন লিখে রাখি। হাতের কাছে ছিল একটা উপন্যাস, *তোমাকে*, সেটাও পড়ে ফেলি। কাল মুগ্ধকর দর্শনের পালা।



প্রথম দর্শনের মুগ্ধতা

AMARBOI.COM

১৯৮৬ সালের ২১ জানুয়ারি। বেলা পৌনে তিনটায় আমাদের রিকশা এসে থামে আজিমপুর গোরস্তানের উত্তর পাশের একটা রাস্তায়। ছোট গলিপথের ভেতর দুটি বাড়ির মাঝখানের সরু গলিপথ দিয়ে কিছু দূর হেঁটে বাড়িটা পেয়ে যাই। পেছনের একটা সিঁড়ি দিয়ে উঠে দরজায় বেল টিপতেই এক তরুণ হাসিমুখে দরজা খুলে ভেতরে সোফায় বসতে বলেন। তরুণের দাদাভাই তাঁকে আগেই জানিয়ে রেখেছেন যে এখন একজন সাংবাদিক বাসায় আসতে পারে। নিজের পরিচয় দেন তিনি, নাম আহসান হাবীব। কার্টুন আঁকেন। *উন্মাদ* নামের একটা পত্রিকার সহকারী সম্পাদক। ড্রয়িংরুমের এক পাশে একটা ছবি আঁকার কাগজ। রং-তুলি ছড়ানো। এক কিশোরী বসে ছবি আঁকছে। অতিথি আসায় ছবি আঁকা বন্ধ করে সে ভেতরে চলে যায়।

আহসান হাবীবের সঙ্গে আলাপচারিতার মধ্যেই প্রায় ৪০ বছর বয়সী এক যুবক ঘরে ঢুকলেন। তাঁর হাতে কিছু কাগজপত্র। একটা ফুলহাতা শার্টের ওপর পরেছেন বগলকাটা সোয়েটার, চোখে চশমা। মনে হলো, তিনি খুবই ব্যস্ত। এসেই বলেন, 'বলুন ভাই, কী করতে পারি?'

ব্যাগের ভেতর থেকে নোটবুক বের করি। টের পাই, আমি বেশ নার্ভাস। কিন্তু প্রকাশ করতে চাই না। শক্ত করে বসে সাংবাদিকের মতো কঠিন গলা নিয়ে বলি, 'প্রথমেই ব্যক্তিগত কিছু প্রশ্ন দিয়ে শুরু করব, তারপর আমরা অন্য প্রসঙ্গে আসব।'

হুমায়ূন আহমেদ রাজি তাতে। নোটবুকের মধ্যে টুকে নিলাম তাঁর জীবনবৃত্তান্ত।

১৯৪৮ সালের ১৩ নভেম্বর ময়মনসিংহের মোহনগঞ্জে তাঁর জন্ম। এটা তাঁর মামার বাড়ি। বাবা শহীদ ফয়জুর রহমান আহমেদ, মা আয়েশা আক্তার খানম। তিন ভাই তিন বোনের মধ্যে তিনিই বড়। পুলিশ অফিসার বাবার সঙ্গে ছোটবেলাতেই অনেক জায়গা ঘুরেছেন, অর্জন করেছেন বিচিত্র অভিজ্ঞতা। সিলেটের মীরাবাজারে কিশোরীমোহন পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা সেরে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় যথাক্রমে বগুড়া জিলা স্কুল আর ঢাকা কলেজ থেকে উত্তীর্ণ হন। ১৯৬৫ সালে রাজশাহী বোর্ড থেকে সম্মিলিত মেধা তালিকায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। মেধা তালিকায় স্থান লাভের বিষয়টি অবশ্য উল্লেখ না করার অনুরোধ করেন তিনি। উচ্চমাধ্যমিক পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন রসায়ন বিভাগে। এমএসসিতে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় হন। বেশ কিছুদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। এরপর আমেরিকায় যান। আমেরিকার নর্থ ডাকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে পলিমার রসায়নে ডক্টরেট করে ১৯৮২ সালে দেশে ফেরত আসেন। এখন পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত আছেন।

প্রাথমিক পরিচয়পর্ব শেষে প্রশ্ন করা শুরু করি। বাবু টেপ-রেকর্ডার অন করে।

'আমেরিকায় থেকে না গিয়ে দেশে ফিরলেন কেন?'

'ফিরলাম, যাতে আপনাদের জন্য *এইসব দিনরাত্রি* লিখতে পারি। না ফিরলে কে লিখত?'

প্রশ্নের উত্তর শুনে একটু ঘাবড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। কিন্তু আমাকে ঘাবড়ালে চলবে না। তাঁর কথাগুলো হুবহু লিখে ফেলার চেষ্টা করি।

প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখতেও যথেষ্ট সময় লাগে। তিনি তখন ঘন ঘন ঘড়ির দিকে তাকান এবং একসময় বলেন, 'ভাই, এক কাজ করেন, আপনার এই খাতাটা রেখে যান। কাল একসময় এসে নিয়ে যাবেন, আমি রাতে আপনার সব প্রশ্নের জবাব লিখে রাখব।'

এটুকু বলে তিনি সোফা থেকে উঠে দাঁড়ান। তিনি এখন বাংলাবাজার যাবেন। অনিন্দ্য প্রকাশনী থেকে তাঁর *এইসব দিনরাত্রি* উপন্যাস হিসেবে বেরোবে। আজ প্রকাশককে পাণ্ডুলিপির কিছু অংশ দেবেন। প্রেসে বসে বসে আগের কম্পোজ হওয়া অংশগুলোর প্রুফ কাটবেন। তিনি আমাদের নিয়ে নেমে আসেন নিচে এবং হাঁটতে হাঁটতে নিউ মার্কেটের পেছন দিকের রাস্তায় দাঁড়িয়ে রিকশার জন্য অপেক্ষা

AMARBOI.COM

করেন। হুমায়ূন আহমেদ রিকশায় উঠে একটা সিগারেট ধরান। তিনি অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত আমরা তাঁর চলে যাওয়ার পথের দিকে চেয়ে থাকি।

পরের দিন যথারীতি এসে আবার হাজির হই তাঁর নিউ পল্টন লাইনের বাসায়। বাবুর উৎসাহ শেষ। হুমায়ূন আহমেদকে তার দেখা হয়ে গেছে। আজ সে এল না। আমি টেপ-রেকর্ডার বগলদাবা করে তাঁর বাসায় গিয়ে হাজির হই এবং মুগ্ধ হয়ে দেখি, আমার নোটবুকটা তিনি ফেরত দিচ্ছেন। পাতা উল্টে দেখি, সব প্রশ্নের জবাব তাঁর নিজের হাতের লেখা। এ উত্তরপত্রের সঙ্গে মিল রেখে আরও কিছু কথাবার্তা হয়। পরবর্তী সময়ে পত্রিকায় যেভাবে ছাপা হয়েছিল, তা ছিল অনেকটা এ রকম :

'লেখালেখির প্রতি অনুরাগ কখন থেকে?'

'বানান করে করে প্রথম গল্পটি যেদিন পড়লাম—মনে হয় সেদিন থেকেই। তবে সুদূর শৈশবের স্মৃতি মনে নেই।'

'প্রথম লেখা কীভাবে ছাপা হলো?'

'*নন্দিত নরকে* লেখা খাতাটি বন্ধু আনিস সাবেত *মুখপত্র* পত্রিকার সম্পাদককে দিয়ে এলেন। সেটা ছাপা হলো। প্রথম লেখা ছাপানোর পেছনে কোনো মজার গল্প নেই। এরপর আহমদ ছফা প্রথম বইটির জন্য প্রকাশক জোগাড় করেছেন। খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি।'

AMARBOI.COM

'দ্বিতীয়টা?'

'প্রকাশক নিজেই চেয়ে নেন।'

'*নন্দিত নরকে* আর *শঙ্খনীল কারাগার*-এর পাত্র-পাত্রীদের নাম একই কেন?'

'নতুন নাম খুঁজে পাইনি।'

'ওই দুটোর খোকা চরিত্রের সঙ্গে লেখকের ব্যক্তিজীবনের কি সাদৃশ্য আছে?'

'আমি বোধ হয় অত ভালো নই। তবে আমিও মাঝে মাঝে খোকার মতো হতে চাই। তা ছাড়া লেখকও খোকার মতো খানিকটা বোকা।'

'এ দুটোর প্লট কী করে পেয়েছেন?'

'মনে নেই। তবে আমি আগে কখনো প্লট ভেবে লিখতে বসি না।'

হুমায়ূন আহমেদ জানালেন, লিখতে লিখতেই পাত্র-পাত্রীরা এসে যায়, চরিত্র সৃষ্টি হয়, কাহিনি গড়ায়। লেখার জন্য কোনো রকম পরিবেশ কিংবা মুডের জন্য কোনো রকমের উপকরণের প্রয়োজন হয় না। চাপের মুখে একটানা সাত-আট ঘণ্টা লেখার অভিজ্ঞতাও তাঁর আছে। তবে সাধারণত অবসর পেলেই লেখেন, আর পড়েন।

'নির্জনে লেখেন না?'

'আমার একটা বড় বাড়ি হলে চেষ্টা করে দেখতাম।'

'বড় বাড়ির জন্য ইচ্ছা হয় না?'

'মাঝে মাঝে হয়।'

হুমায়ূন আহমেদের গল্পের পাত্র-পাত্রীরা মধ্যবিত্ত পরিবারের। তাঁর কথায়, 'মধ্যবিত্তকেই তো ভালো করে দেখেছি সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতায়—এর বাইরে লিখব কীভাবে?'

'কেন? উচ্চবিত্ত পরিবারের প্লটেও কিছু কিছু তো লিখেছেন, যেমন—*একা একা*।'

'কিছু উচ্চবিত্তদেরও দেখেছি।' তিনি তাঁর স্ত্রী গুলতেকিনের নানার কথা ইঙ্গিত করেন।

'গল্প-উপন্যাস ছেড়ে নাটক লিখতে এলেন কখন?'

'১৯৭৪ সনে *নন্দিত নরকে* উপন্যাসটিকে মঞ্চনাটকে রূপ দিই। রেডিওর জন্য *শঙ্খনীল কারাগার*-এর বেতার নাট্যরূপ দিই ১৯৭৫-এ। টিভির জন্য প্রথম নাটক লিখি *প্রথম প্রহর* ১৯৮৩ সনে।'

'কেন নাটকে এলেন?'

'টাকার জন্য।'

এর পর কথা হলো বাংলাদেশ টেলিভিশনের সবচেয়ে জনপ্রিয় ধারাবাহিক নাটক *এইসব দিনরাত্রি* নিয়ে। জানালেন যে মুস্তাফিজুর রহমান সাহেবের আগ্রহে এক সপ্তাহের একটি নাটককে বড় করে দেওয়া হলো সিরিজ নাটকে। দর্শক হিসেবেও তাঁর কাছে নাটকটি উপভোগ্য ছিল। তবে *এইসব দিনরাত্রি* লিখে বিটিভি থেকে যে সম্মানী পেয়েছিলেন, সেটা দিয়ে একটা রঙিন টেলিভিশন কিনেছিলেন।

'এরপর সিরিজ নাটক লেখার ইচ্ছে আছে?'

'আর্থিক ঝামেলায় পড়লে হয়তো লিখব।'

'সিনেমার জন্য কাহিনি লেখার ইচ্ছে আছে?'

'যদি কেউ মুক্তিযুদ্ধের ওপর ভালো ছবি করতে চায়, তাহলে লিখব।'

হুমায়ূন আহমেদ এমন অনেক উপন্যাসও লিখেছেন, যেগুলোর শিরোনামে গল্প বেরিয়েছিল অনেক আগে। অথচ উপন্যাসকেও যে গল্পের পরিবর্ধিত রূপ বলা যাবে, এমনও হয় না। তবে কেন? হুমায়ূন আহমেদের জবাব—নতুন নাম খুঁজে পান না। তাঁর মতে, নাম দেওয়ার জন্যই দেওয়া।

'আচ্ছা, আপনি এত বেশি লেখার সময় কখনো আপনার লেখার মান সম্পর্কে সন্দিহান হন না?'

AMARBOI.COM

'হ্যাঁ, আমি প্রচুর লিখি। আবার না লিখেও থাকতে পারি। প্রথম চারটি উপন্যাস প্রকাশের পর আমি সাত বছর কিছুই লিখিনি। আবার হয়তো একটা সময় আসবে, যখন কিছুই লিখব না।'

'একঘেয়ে ঠেকায় একসময় যদি কেউ আপনার লেখা না পড়ে, তখন আপনি কী করবেন?'

'কী আর করব? মন খারাপ করা ছাড়া কিছু করার আছে কি?'

'আচ্ছা, আপনি লেখেন কেন?'

'বলা মুশকিল, তবে লিখতে ভালো লাগে।'

'অমরত্ব পাওয়ার বিন্দুমাত্র আশায়ও কি আপনি লেখেন?'

'না। অমরত্ব মহাপুরুষদের জন্য। আমি মহাপুরুষ নই, সাধারণ মানুষ।'

'আপনি কি নিজেকে কোনো সময় জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক বলে মনে করেন?'

'যখন জানলাম, আমার একই বইয়ের প্রথম মুদ্রণ এক মাসে বিক্রি হয়ে গেছে।' এটুকু বলে, আস্তে করে বলেন, 'তবে এটা হালকা ধরনের ভৌতিক উপন্যাস, গর্ব করার মতো কোনো রচনা নয়।'

'নিজের কাছে আপনার পরিচয় কি একজন লেখক, না শিক্ষক?'

'লেখক।'

'উপন্যাসের শিরোনামে রবীন্দ্র-জীবনানন্দ থেকে ধার করেন কেন?'

'এঁদের কাছ থেকে ধার করতে লজ্জা লাগে না বলেই।'

'যদি বলা হয়, *তোমাকে* প্রেমের উপন্যাস (কভারে লেখা আছে) হিসেবে সার্থক নয়—আপনি কী বলবেন?'

'কিছু বলব না।'

'আচ্ছা, একটু অন্য ধরনের প্রশ্ন, "প্রেম" ছাড়া ছেলেমেয়েদের বন্ধুত্ব হতে পারে?'

'পারবে না কেন?'

'দুটো ছেলে বা দুটো মেয়ের মধ্যে যে রকম বন্ধুত্ব হয়—একটা ছেলে আর একটি মেয়ের মধ্যেও কি একই রকম বন্ধুত্ব হতে পারে?'

'তা অবশ্য নয়, কারণ এখানে ফ্রয়েডীয় কিছু ব্যাপার-স্যাপার আছে।'

'তাহলে যে বললেন?'

'আসলে ব্যাপারটা একটু জটিল—আপনি অন্য প্রশ্ন করুন।'

'আপনার জীবনের স্মরণীয় ঘটনা কোনটা?'

'তিনটে উপন্যাস লিখে বাংলা একাডেমী পুরস্কার পাওয়াটা আমার কাছে একটা স্মরণীয় ঘটনা। না না, এটা লিখবেন না, তাহলে লোকজন মনে করতে

AMARBOI.COM

পারে আমার গর্ব হচ্ছে—লিখুন গুলতেকিনের সঙ্গে পরিচয়।'

'দুঃখজনক ঘটনা?'

'বাবার মৃত্যু।'

এর মধ্যে সালোয়ার-কামিজ পরা এক তরুণী নাশতার ট্রে হাতে ড্রয়িংরুমের ঢোকেন। বুঝতে বাকি থাকে না, তিনিই হুমায়ূন আহমেদের স্ত্রী গুলতেকিন আহমেদ। চায়ের সঙ্গে নাশতা এসেছে—বিস্কুট, চানাচুর আর মিষ্টি। নিজেই তুলে দিচ্ছিলেন সাংবাদিকের পিরিচে। তাঁর চোখেমুখে অনেক আনন্দ। সাংবাদিক এসেছেন তাঁর স্বামীর সাক্ষাৎকার নিতে। হুমায়ূন আহমেদই সুযোগ করে দিলেন কথা বলার। প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁর নাতনি গুলতেকিন আহমেদ। গুলতেকিন নামটা তাঁর দাদা ইব্রাহীম খাঁ রেখেছেন। হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাস *শঙ্খনীল কারাগার* পড়ার পর ক্লাস এইটের ছাত্রী গুলতেকিন একটা চিঠি লেখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ প্রভাষক হুমায়ূন আহমেদকে। এর পর দেখা হয়। মেলামেশা বাড়ে। ঘনিষ্ঠতার পরিণতিতে ১৯৭৩ সালে এসএসসি পাস করার পর তাঁদের বিয়ে হয়।

AMARBOI.COM

এরপর স্বামীর সঙ্গে চলে যান আমেরিকা। ফিরেছেন সাড়ে তিন বছর আগে ১৯৮২ সালে। আবার শুরু করেছেন পড়াশোনা। কিছুদিন আগে ভর্তি হয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে। তিন মেয়ে—নোভা, শীলা আর বিপাশার মা। নিজেই মেয়েদের দেখাশোনা করেন। মেয়েরা বড় হয়ে কে কী হবে—এ নিয়ে তাঁর কোনো ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নেই। যে যা হতে পারে, হবে।

তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম, 'আচ্ছা, আপনি বিয়ের আগে যখন হুমায়ূন আহমেদের *নন্দিত নরকে* কিংবা *শঙ্খনীল কারাগার* পড়লেন, তখন কি এ দুটোকে লেখকের আত্মজীবনীমূলক লেখা মনে করতেন?'

'কিছুটা মনে হতো।'

'*নন্দিত নরক*-এর "খোকা" নিখুঁতভাবে একটা মেয়েকে ভালোবাসত। সে ভালোবাসার কথা কোনো দিন মেয়েটিকে জানানোর সাহস পায়নি—তার ভালোবাসা আজীবন নিভৃতেই থেকে গেল। আচ্ছা, সেই খোকাটির জন্য কি তখন আপনার দুঃখ হতো?' (হুমায়ূন আহমেদ তখন মিটমিট করে হাসছেন)।

'তা তো হতো।'

'বিয়ের পরও যদি কোনো নায়িকার প্রতি লেখকের অতিরিক্ত অনুভূতি দেখা দিত, আপনি কী করতেন?'

'গল্প তো গল্পই। তবে সত্যি সত্যি সে কিছু করলে তো খারাপ লাগতই।'

'আচ্ছা, তাঁর কোনো গল্প-উপন্যাসে আপনার কোনো চরিত্র এসেছিল?'

'খণ্ড খণ্ড এসেছে, পুরোপুরিভাবে নয়।'

হুমায়ূন আহমেদ জবাব দিলেন, '*এইসব দিনরাত্রিতে* নীলুর চরিত্রের সঙ্গে ওর অনেক মিল ছিল।'

'আচ্ছা, লেখালেখির ব্যাপারে আপনি হুমায়ূন আহমেদকে কীভাবে সহযোগিতা করেন?'

'কখনো চা বানিয়ে দিই। তা ছাড়া ও লেখার সময় প্রচুর বানান ভুল করে, সেগুলোও ঠিক করে দিই।'

'তাঁকে নিয়ে আপনার গর্ব হয়?'

'কিছুটা তো হয়ই।'

'আচ্ছা, মনে করেন, একদিন এমন হলো যে তাঁর লেখা কেউ আর পড়ছে না—তখন আপনার মানসিক অবস্থা কেমন হবে?'

'তখন যদি ও লেখা ছেড়ে সংসারের দিকে কিছুটা মন দেয়, তাহলে ভালোই হবে।'

'একজন পাঠক হিসেবে ওনার লেখা আপনার কেমন লাগে?'

'তার লেখা আমার সব সময়ই ভালো লাগে।'

হুমায়ূন আহমেদের একটা বৈশিষ্ট্য যে তাঁর বেশির ভাগ কাহিনিতেই বিশেষ কয়েকটি নাম বারবার ঘুরে ঘুরে আসে। অথচ প্রতিটি চরিত্রই স্বতন্ত্র। এটা কেন হয়—শুনতে চাইলে সহজ উত্তর দেন, 'নতুন নাম খুঁজে পাই না।' সাংবাদিকের বিশ্বাস হতে চায় না। পাশে বসা তাঁর স্ত্রী জানালেন, 'ও উপন্যাস লিখতে বসে আমাকে নাম জিজ্ঞেস করে। আমি সঙ্গে সঙ্গে বলতে না পারলে বলে, আমি তাহলে আগের নামটিই লিখি? এভাবেই একই নাম বারবার আসে—আসলে অন্য কিছু নয়।'

AMARBOI.COM

'আচ্ছা "নীলু"কে আপনি চেনেন?'

'না।'

'এ নামটা কেন বারবার আপনার গল্পে-উপন্যাসে আসে?'

'নামটা সুন্দর।'

এ সময় তাঁর স্ত্রী জানালেন যে তাঁরা যখন আমেরিকায় ছিলেন, তখন পাশের বাসায় এক শ্রীলঙ্কান পরিবার থাকত। ওই বাসার একটি মেয়ের নাম ছিল নীলু। হুমায়ূন আহমেদ হাত দিয়ে দেখালেন এবং বললেন, 'এতটুকু, চার-পাঁচ বছরের মেয়ে।'

'নীলগঞ্জই বা কেন আসে?'

'সম্ভবত নীল থেকে।'

গুলতেকিন আহমেদ ভেতরে চলে যান।

একসময় টের পাই, আমি পরিণত হয়ে গেছি এক মুগ্ধ সাংবাদিকে। কিন্তু এখন এই সাংবাদিকের নোটবুকে লেখা সব প্রশ্নপত্রের সব উত্তর নেওয়া শেষ। এবার তাহলে কী নিয়ে আলাপ হবে? নাকি উঠে চলে যাব? ভাবছি, আরও কিছু সময় এখানে কাটানো যায় কীভাবে। এবার আমি জানতে চাই *শঙ্খনীল কারাগার* বিষয়ে। লেখককে বলি, হোস্টেলে আমার এক বন্ধু আছে যে ১৮ বার পড়েছে বইটি। এবং এই বইয়ের অনেক অংশ সে মুখস্থ বলে দিতে পারে।

এ বইয়ের উৎসর্গপত্রের পর এক পাতাজুড়ে কবিতার দুটো লাইন :

দিতে পারো একশ' ফানুশ এনে
আজন্ম সলজ্জ সাধ, একদিন আকাশে কিছু ফানুস উড়াই

তাঁকে জিজ্ঞেস করি, 'ওটা কার কবিতা, স্যার?'

'আমার।'

তাহলে হুমায়ূন আহমেদ কবিও!

শোনা গেল নতুন কাহিনি।

কবি হওয়ার সম্ভাবনা তাঁর ছিল, কিন্তু হয়নি। ১৯৬৭-৬৮ সালের দিকে, যখন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসীন হলের ছাত্র, তখন 'ফানুস' নামে এ কবিতাটি লেখেন। কবিতা লিখে পাঠিয়ে দেন *দৈনিক পাকিস্তান*-এর 'মহিলা অঙ্গন' পাতার সম্পাদকের কাছে। কবি হিসেবে নাম লেখেন তাঁর বোন সুফিয়া আহমেদ শেফুর। ছাপাও হয় কবিতাটি। এটাই ছিল ছাপার হরফে তাঁর প্রথম লেখা, কিন্তু হুমায়ূন আহমেদ নামে নয়, বোনের নামে। শেফু তখন দশম শ্রেণীর ছাত্রী।

AMARBOI.COM

'কেন স্যার?'

'এর আগে দু-একটা কবিতা পাঠিয়েছিলাম, ছাপা হয়নি। পরে ভাবলাম, দেখি, *মহিলা অঙ্গন* বিভাগে মহিলার নামে পাঠালে ছাপে কি না। কাজ হলো, এই তো।'

'বাংলা সাহিত্যে কার কার লেখা আপনার প্রিয়?'

'বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, বিমল কর, সতীনাথ ভাদুড়ী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।'

'শংকর কেমন লাগে?'

'ভালো। ওঁর প্রথম দিকের কিছু উপন্যাস খুবই ভালো।'

'বাংলা সাহিত্য ছাড়া বিদেশি কোনো সাহিত্য পড়েন?'

'একসময় প্রচুর পড়েছি। এখনো কিছু পড়ি।'

'প্রিয় কে?'

'প্রিয় হচ্ছেন জন স্টেইনবেক।'

'আপনার মতে, বড় গল্প আর উপন্যাসের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?'

'জানি না।'

'*শঙ্খনীল কারাগার*-এর মুখবন্ধে *নন্দিত নরকে*কে "গল্প" বলে উল্লেখ করলেন। অথচ এটা "উপন্যাস" হিসেবে বিবেচিত এবং পুরস্কৃত। তাহলে "গল্প" বললেন কেন?'

'আমাকে এসব জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। এ-জাতীয় প্রশ্ন করা উচিত সাহিত্যের ছাত্রকে। আমি একবার একটি বইয়ের সমালোচনা লিখেছিলাম *রোববার* পত্রিকায়। পরবর্তী সময়ে সবাই তাকে গল্প বলতে লাগল এবং আমিও আমার গল্পগ্রন্থে (আনন্দ বেদনার কাব্য) ঢুকিয়ে দিলাম।'

'আপনাকে যদি উপন্যাসের সংজ্ঞা দিতে বলা হয়, তাহলে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করবেন?'

'কোনোভাবেই করব না। আমি যদি জানতাম, উপন্যাস কী, তাহলে তো নিজেই লিখতাম। যা লিখেছি তার কোনোটাই কি সত্যিকার অর্থে উপন্যাস হয়েছে?'

'ভবিষ্যতে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস লেখার কোনো পরিকল্পনা আছে?'

'হ্যাঁ, মুক্তিযুদ্ধের ওপর বৃহৎ ক্যানভাসে একটা উপন্যাস লিখব এবং এ জন্য আমি পড়াশোনাও করছি।'

'বঙ্কিম, শরৎ থেকে বর্তমানকালের উপন্যাসগুলোর ধারা অনেকখানি পরিবর্তিত—এর কারণ কী বলে আপনি মনে করেন?'

'সময়ের প্রভাব। উপন্যাস তো সময়েরই ছবি। সময় বদলালে উপন্যাস বদলাবে।'

'উপন্যাস সৃষ্টিতে বাস্তব অভিজ্ঞতা কতটুকু প্রয়োজনীয় বলে আপনি মনে করেন?'

'অনেকখানি।'

'একটা সার্থক উপন্যাসের কী কী গুণ থাকা আবশ্যক বলে মনে করেন?'

'একটা সার্থক উপন্যাসে সমাজ ও কাল উঠে আসবে। লেখক একটি দর্শন দিতে চেষ্টা করবেন। উপন্যাস মানে তো শুধু গল্প নয়। গল্পের বাইরেও কিছু।'

'সুন্দর গল্পের জন্য সুন্দর কাহিনিই কি অত্যাবশ্যকীয়?'

'না।'

AMARBOI.COM

'আচ্ছা, সাহিত্য দিয়ে সমাজ-সংস্কার কীভাবে করা যায়?'

'জানি না। আমি নিজে সমাজ-সংস্কারের কথা ভেবে কিছু লিখি না।'

'যখন লেখেন, তখন আপনি কোন শ্রেণীর পাঠকের কথা বিবেচনা করেন?'

'সায়েন্স ফিকশনগুলি কম বয়সীদের জন্য লেখা। অন্য সব যখন লিখি তখন কোন শ্রেণীর পাঠকের জন্য লিখছি, তা মনে থাকে না। যাদের ইচ্ছা হয় পড়বে।'

'আপনার লেখায় রাজনৈতিক কোনো বক্তব্য দেখা যায় না কেন?'

'এখন থেকে দেখতে পারবেন।'

'তার মানে, রাজনীতি আসবে?'

'হুঁ।' মাথা নাড়েন হুমায়ূন আহমেদ।

'এটা কী ধরনের হতে পারে?'

'আগেভাগে কিছু বলতে চাই না।'

'এত দিন না আসার কারণ?'

'এত দিন আমার ঝোঁক ছিল গল্প বলার দিকে। যে সমাজ যে কাল এই গল্প তৈরি করেছে তাকে অবহেলা করেছি। মনে হয়েছে, ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখই সব।'

'আপনি কি মনে করেন যে প্রতিটি মানুষেরই রাজনীতি করা উচিত?'

'অফকোর্স, ইটস অ্যা পার্ট অব আওয়ার লাইফ।'

'ব্যক্তিগতভাবে আপনি কোন রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী?'

'আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, প্রতিটি মানুষের অধিকার সমান।'

'আপনি রাজনীতি করেন?'

'না, আমি রাজনীতি করি না।'

'ছাত্রাবস্থায়ও কি করেননি?'

'আমি যখন ছাত্র ছিলাম তখন বই পড়া ছাড়া আর কিছুই বুঝতাম না; এখন বুঝতে পারছি কী ভুলই-না করেছি।'

'আপনি এরশাদকে সমর্থন করেন?'

'কে? এরশাদ? সে আবার কে? সে কি আমাদের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট যে তাঁকে আমি সমর্থন করব? নাটক লিখেছি *নৃপতি*, সামনের মাসেই (ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬) মঞ্চস্থ হচ্ছে, দেখবেন কেমন নৃপতি তাঁকে বানিয়েছি।'

'বাংলাদেশের তরুণ লেখকদের মধ্যে কে আপনার প্রিয়?'

'ইমদাদুল হক মিলন, মঞ্জু সরকার।'

AMARBOI.COM

'প্রিয় ঔপন্যাসিক?'

'সৈয়দ হক, শওকত ওসমান, শওকত আলী।'

'কবি?'

'শামসুর রাহমান, নির্মলেন্দু গুণ।'

'নাট্যকার?'

'হুমায়ূন আহমেদ।'

'কবিতা?'

'জীবনানন্দ দাশের "আট বছর আগে একদিন"।'

'নাটক?'

'*নৃপতি*।'

'"বাবা" আপনার উপন্যাসে আসেনি?'

'"বাবা" আমার গল্প-উপন্যাসে অনেকবার অনেকভাবে এসেছেন (*শঙ্খনীল কারাগার*)।

'নতুন লেখকদের জন্য আপনার কী উপদেশ?'

'নতুন লেখকদের জন্য আমার একটাই কথা—পড়তে হবে, প্রচুর পড়তে হবে—সব লেখকের লেখা পড়তে হবে। তাতে ভাষার ওপর দখল আসবে—কোন লেখক কীভাবে চরিত্রগুলো নিয়ে ট্রিট করছেন, সেটাও পরিষ্কার হবে। আবার চোখ-কানও খোলা রাখা দরকার। যেমন, কোন পেশার লোক কীভাবে কথা বলে, কীভাবে হাঁটে, চলে—এসবও দেখতে হবে। তা ছাড়া, কবিতা পড়া থাকলে বোধ হয় ভাষার প্রতি দখলটা তাড়াতাড়ি আসে।'

AMARBOI.COM

আজিমপুরের নিউ পল্টন লাইনের দোতলার এই ছোট্ট বাসাতে লোকজন গিজগিজ করছে। এর মধ্যে তাঁর তিন শিশুকন্যা ছাড়াও ছোট ভাই আহসান হাবীব (শাহীন) আর ছোট এক বোনের সঙ্গে দেখা হয়েছে। বাবার কাছে ছোট্ট কন্যা শীলা এসে ঘুরঘুর করে কিছুক্ষণ পর পর। শীলাকে দেখিয়ে বলেন, 'ওর একটা ছবি তুলে দেন, ভাই, পত্রিকায় ছাপিয়ে দিয়েন। মেয়েটার খুব শখ, পত্রিকায় তার ছবি যেন ছাপে। নিচে ক্যাপশন লিখে দেবেন—বড় হয়ে আমি অভিনেত্রী হতে চাই।'

শীলাকে কোলে নিয়ে হুমায়ূন আহমেদ পা তুলে বসে থাকেন বেতের সোফার ওপর। এর মধ্যে মধ্য-তিরিশের এক জোড়া তরুণ-তরুণী সামনে দিয়ে বেরিয়ে যান। লেখক বলেন, 'আমার ছোট ভাই আর তার বউ। ওর নাম

ইকবাল, খুব ব্রিলিয়ান্ট। আর ওটা তার বউ। ওরা আমেরিকায় আছে। পড়াশোনা করছে। দুজনই ডক্টরেট।'

কিছুক্ষণ পর শ্মশ্রুমণ্ডিত একজন এসে ঢোকেন ঘরে। তাঁকে চিনতে সমস্যা হয় না। পত্রিকায় অনেক ছবি দেখেছি তাঁর। কবি নির্মলেন্দু গুণ। এই কবিকেও এখানে সামনাসামনি দেখব, এমনটা আশা করিনি। আমার মুগ্ধতার মাত্রা আরও বেড়ে যায়। অটো ফোকাস ক্যামেরাটা লেখকের ছোট ভাই আহসান হাবীবকে ডেকে এনে ধরিয়ে দিই। এই দুজনের সঙ্গে ছবি তোলার জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে উঠি।

সাক্ষাৎকার পর্ব প্রায় শেষ। প্রশ্ন করার মতো নতুন কিছু খুঁজে পাই না। লেখকের সাক্ষাৎকার নিতে এসে তাঁর স্ত্রীর সাক্ষাৎকারও নেওয়া হয়ে গেছে। এবার মনে হলো, তাঁর মায়ের একটা সাক্ষাৎকার নিতে পারলে খারাপ হয় না। মুগ্ধ সাংবাদিক তার প্রিয় লেখককে অনুরোধ করে তাঁর মাকে ডেকে আনার জন্য।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা ইস্তিরি করা সাদা কাপড়ের লাল ডোরা শাড়ি পরে এসে হাজির হন লেখকজননী।

গল্প শুরু হলো মিসেস আয়শা আক্তার খানমের সঙ্গে।

'আপনার ছেলেমেয়েরা কে কী করেন?'

'বড় ছেলে হুমায়ূন আহমেদ। মেজো ছেলে জাফর ইকবাল—আমেরিকাতে পোস্ট ডক্টরেট করছে, সে বাচ্চাদের জন্য লেখে, তিনটা বই বেরিয়েছে। ছোট্ট আহসান হাবীব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভূগোলে এমএসসি পাস করেছে এবার, সে আবার ভালো কার্টুন আঁকে। *উন্মাদ* না কী যেন কার্টুন পত্রিকা—এটার সহকারী সম্পাদক। বড় মেয়ে সুফিয়া হায়দার, পিরোজপুর মহিলা কলেজের বাংলার অধ্যাপিকা। ওর বর উকিল। মেজো মেয়ে বিএসসি পাস করে ঢাকায় আছে, ওর বর আর্মির মেজর। ছোট মেয়ে রোকসানা আহমেদও খুব ভালো ছবি আঁকে; শংকর পুরস্কার পেয়েছে। ক্লাস এইট পর্যন্ত লেখাপড়া করেছে, ডিফ অ্যান্ড ডাম্প স্কুলে; ও আবার বোবা, কথা বলতে পারে না।'

'আপনার সব ছেলেমেয়েই প্রতিভাবান এবং সমাজে সুপরিচিত। এঁদের এ সাফল্যের পেছনে আপনার কী অবদান আছে বলে মনে করেন?'

'না, আমার কোনো অবদান নেই। ওরাই ওদের স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছে।'

'আচ্ছা, আপনার বড় ছেলে হুমায়ূন আহমেদ ছোটবেলায় কেমন ছিলেন?'

AMARBOI.COM

'ও খুব চালাক ছিল। কথা বলত বুড়ো লোকের মতো এবং সে বুঝতও অনেক বেশি। তা ছাড়া লেখাপড়ায়ও অত্যন্ত ভালো ছিল। ক্লাস এইটে সে বৃত্তি পেয়েছিল, মেট্রিকে সেকেন্ড স্ট্যান্ড করেছিল। ওর বাবা ওর সব কাগজপত্র জমিয়ে রাখতেন ফাইলের ভেতর। যে কাগজগুলোতে ওর ছবি উঠেছিল, নাম উঠেছিল, সে কাগজগুলো আমার কাছে এখনো আছে। তার বাবা বলত যে ওগুলো আলমারির মধ্যে যত্ন করে রেখো, তোমার ছেলে একদিন খুব বিখ্যাত হবে, তখন কাগজের লোকেরা এসব খুঁজতে আসবে।'

'হুমায়ূন আহমেদ যে একদিন বড় লেখকই হবেন—এটা আপনারা বুঝতে পেরেছিলেন?'

'ওর বাবা বুঝেছিল।'

'কীভাবে?'

'ও তখন ঢাকায় চলে এসেছে—মুহসীন হলের ছাত্র। একবার একটা উপন্যাস লিখে আনল। সম্ভবত *শঙ্খনীল কারাগার*। বাসার সবাই আমরা পড়লাম কিন্তু তার বাবাকে পড়ানোর সাহস তার ছিল না। একদিন আমাকে দিয়ে সে লেখাটি তার বাবার কাছে পাঠাল। তারপর, আমার পাশ দিয়ে শুধু ঘুরঘুর করে, অর্থাৎ জানতে চায়, তার বাপ এটা পড়ে কী বললেন। এ রকম দু-এক দিন যাওয়ার পর এক রাতে সবাই যখন শুয়ে গেছে, তখন তার বাবা তাকে ডাকলেন। খুব ভয়ে ভয়ে সে গেল। আমিও তখন সঙ্গে ছিলাম। তার বাবা পাণ্ডুলিপিটা তার হাতে ফেরত দিয়ে বললেন, "এটা যত্ন করে রেখে দিস—তুই একদিন খুব নামকরা লেখক হবি।"'

'তাঁর বাবা কি তাঁর প্রকাশিত কোনো লেখা পড়েছেন?'

'না, উনি তো একাত্তরে স্বাধীনতাযুদ্ধে শহীদ হলেন।'

'হুমায়ূন আহমেদের লেখা আপনার কেমন লাগে?'

'খুব ভালো। মনেই হয় না যে এটা ও লিখেছে।'

'কোনোটা খারাপ লাগেনি?'

'না।'

'আচ্ছা, তাঁর কোনো গল্প-উপন্যাস কিংবা নাটকের "মা"র চরিত্রে আপনার চরিত্র কিংবা তার খণ্ডাংশ এসেছে বলে আপনার মনে হয়?'

'কী জানি, (হেসে) আমার চরিত্র আমি বুঝতে পারি না, তবে *এইসব দিনরাত্রির* সেই মা নাকি আমি—তো, এটা অনেকেই বলেন। আমার তো মনে হয় না।'

AMARBOI.COM

'আপনার চোখে হুমায়ূন আহমেদকে কী মনে হয়, একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নাকি লেখক?'

'লেখকই বেশি।'

'তাঁর চরিত্রের একটা দোষের কথা বলুন।'

'সে রাগে খুব বেশি। আবার রাগ থাকেও না বেশি সময়।'

'তাঁর ছোটবেলাকার একটা মজার ঘটনা বলুন।'

'আমরা তখন সিলেট মীরাবাজারে ছিলাম। আমাদের বাসার পাশেই ছিল গরুর ঘর। একদিন রাত্রিবেলা আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে বলে কি, "মা, শুনে যাও, গরুরা কথা বলে।" সে কিন্তু এখনো মাঝে মাঝে বলে যে গরুর কথা সে শোনে। এ কি ওর পাগলামি, না অন্য কিছু, কিছুই বোঝা যায় না।'

'আপনার সব ছেলেমেয়ের ওপর কি আপনি সন্তুষ্ট?'

'অবশ্যই।'

এবার সত্যি সত্যি উঠে আসার পালা। তিনি দুটো বই বের করেন। *প্রথম প্রহর* নামে একটা উপন্যাস বেরিয়েছে কিছুদিন আগে। একটি আমার আর অপরটি গতকাল আমার সঙ্গে আসা অপর তরুণের (বাবু) জন্য। এর আগে লেখক জেনেছিলেন, সাংবাদিক যে হোস্টেলে থাকেন, সেখানে তাঁর এক ভক্ত আছে, যে *শঙ্খনীল কারাগার* বইটি ১৮ বার পড়েছে। সেই তরুণের জন্য নিয়ে এলেন আরেকটি বই *শঙ্খনীল কারাগার*।

লেখক বই বের করে কলম হাতে নিয়ে লিখতে শুরু করার আগে নাম জানতে চাইলেন ওই মুগ্ধ পাঠকের। বলি, 'স্যার, নাম লিখতে হবে না, শুধু সই করে দিলেই হবে।'

AMARBOI.COM

তিনি লেখা বন্ধ করে তাকান আমার দিকে। জিজ্ঞেস করেন, 'আপনার নাম কী?'

'শাকুর মজিদ।'

হুমায়ূন আহমেদ *শঙ্খনীল কারাগার* বইটিতে লিখলেন 'শাকুর মজিদ, আমার বইয়ের মুগ্ধ পাঠককে' লিখে সই করে বই তিনটি দিয়ে দেন।

রাতে ঢাকা মেডিকেলের হোস্টেলের 'প্যারাসাইট' এই মুগ্ধ 'সাংবাদিক' এক দিস্তা নিউজপ্রিন্ট খাতা নিয়ে লিখতে বসে যায় এবং ২৪ পাতা লিখে পরদিন সকালবেলা অভয় দাস লেনের সেই বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়।

প্রায়বৃদ্ধ এই সম্পাদক মহোদয় এত ভারী খাতার লেখা হাতে নিয়েই বিরক্তি প্রকাশ করেন। তিনি আস্তে আস্তে পাতা ওল্টান, মাঝে মাঝে দু-চার

লাইন পড়েনও। এবং একপর্যায়ে খুব দ্রুত পাতা ওল্টানোর কাজ শেষ করে এই বিজ্ঞ সম্পাদক লেখাটি প্রায় ফিরিয়ে দেবার মতো করে টেবিলে রেখে দেন। মুখে বলেন, 'এটাকে ছয়-সাত পৃষ্ঠার মধ্যে নিয়ে আসেন। আমরা দুই পৃষ্ঠার বেশি এ লেখকের-জন্য দিতে পারব না। আপনি বরং এক কাজ করুন, এই রিডার্স ডাইজেস্টটা নিয়ে যান, আপনার জন্য আমি আর্টিকেল ঠিক করে রেখেছি, ওটা বরং ট্র্যানসলেট করে কাল দিয়ে যান। আর এই লেখাটি যদি অন্য কোথাও দিতে চান, আমার আপত্তি নেই।'

বিধ্বস্ত সাংবাদিক খুব দ্রুত অভয় দাস লেনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়, রিডার্স ডাইজেস্টটি সে আর নিয়ে আসে না।

রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে বায়তুল মোকাররমের সামনে ফুটপাতে বিছিয়ে রাখা এক পত্রিকার স্টলের সামনে এসে দাঁড়াই। অনেক পত্রিকা সেখানে। নামী পত্রিকা হচ্ছে *বিচিত্রা, রোববার, সন্ধানী*। এরা কি এই নতুন লেখকের লেখা ছাপবে?

অখ্যাত পত্রিকা খুঁজতে খুঁজতে একটা পত্রিকা হাতে নিই। তার নাম *পাক্ষিক দিশা*। পত্রিকায় সম্পাদকের নাম লেখা শামসুন্নাহার জ্যোৎস্না, ঠিকানা ৭৮/বি কাকরাইল, চতুর্থ তলা। পাতা উল্টিয়ে দেখি এখানে আর্ট-কালচারের কিছু লেখা আছে। ছয় টাকা দিয়ে পত্রিকাটি কিনে এই ঠিকানা অনুযায়ী হেঁটে হেঁটে এসে উপস্থিত হই এবং দেখা হয়ে যায় সেই সম্পাদকের সঙ্গে।

তিনি লেখাটি রেখে দেন এবং আগামীকাল সন্ধ্যার পর তাঁর অফিসে আসতে বলেন। পরদিন সন্ধ্যায় এসে আমার মন ভালো হয়ে যায়। অপর এক ভদ্রলোক এবার বসেছেন এই চেয়ারে, তিনি *বাংলাদেশ টাইমস*-এর বড় সাংবাদিক। এই পত্রিকাটা তিনি দেখে দেন। তিনি এই তরুণ সাংবাদিককে বলেন, 'আপনার কাছে যেসব ছবি আছে, কাল নিয়ে আসেন। রঙিন ছবি থাকলে দেবেন, আমরা কভারে দেব। আর সামনের সংখ্যায় বইমেলার ওপর আমরা স্টোরি করব। আপনি বইমেলাটা কভার করুন, লেখকদের ছবিসহ একটা বড় রিপোর্ট দেবেন আপনি।'

পরদিন আবার হুমায়ূন আহমেদের বাড়িতে গিয়ে হাজির হই, ফটোর ফ্রেম খুলে একটা রঙিন ছবি নিয়ে আসি। আমেরিকায় তোলা লেখক দম্পতির ছবি, তাঁদের কোলে দুই শিশুকন্যা, নোভা ও শীলা।

এর সপ্তাহ খানেক পর নীলক্ষেতের ফুটপাতে আবিষ্কার করি, এই পত্রিকার (*পাক্ষিক দিশা*, ১৯৮৬ সালের ২ ফেব্রুয়ারি) নতুন সংখ্যাটি। সংখ্যাটির কভার দেখে মন খারাপ। সামনে একুশে ফেব্রুয়ারি, তাই পলাশ ফুলের ছবি কভারে।

AMARBOI.COM

যে রঙিন ছবিটা লেখকের বাড়ি থেকে ফ্রেম খুলে নিয়ে এসেছিলাম, তা কভারে নেই। ভয়ে ভয়ে পাতা ওল্টাই এবং দেখি যে সাত পৃষ্ঠায় পুরা লেখাটিই ছাপা হয়ে গেছে। দুই কপি কিনে নিই। এক কপি *দিশা* আর ফ্রেম থেকে খুলে আনা ছবিটা নিয়ে সন্ধ্যায় হাজির হই নিউ পল্টন লাইনের বাসায়। লেখক বাড়িতে নেই, বাংলাবাজারে। লেখকপত্নী খুবই খুশি। তিনি ইতিমধ্যে পাঁচ কপি *দিশা* কিনে এনেছেন নীলক্ষেতের ফুটপাত থেকে।



ছিয়াশির বইমেলায়

১৯৮৬ সালের ফেব্রুয়ারি ,মাস। বুয়েটে ক্লাস শুরু হয়েছে আমাদের। ক্লাস করে, টিউশনি করে আর কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে, ব্যাগের মধ্যে নিজের জোগাড় করা আরেকটা অটো ফোকাস ক্যামেরা আর নোটবুক রেখে সাংবাদিক সাংবাদিক ভাব করে বেড়াই। বিকেল হলেই হেঁটে হেঁটে বাংলা একাডেমী মাঠে চলে আসি। ঢাকা মেডিকেলের হোস্টেল থেকে বইমেলার চত্বর তো হাঁটাপথই। *পাক্ষিক দিশা* থেকে অ্যাসাইনমেন্ট আছে এই মেলা 'কভার' করার। 'কভার' করার বিষয়টি আসলে কী, আমি জানি না।

স্টলগুলোতে বড় বড় লেখক বসছেন। একটা স্টলের সামনে বড় বড় হরফে লেখা, 'এখানে নির্মলেন্দু গুণকে পাওয়া যায়'। এর আগে রেলস্টেশনের চায়ের দোকানে লেখা দেখেছি, 'এখানে ভালো চা পাওয়া যায়'। কিন্তু ঢাকার লেখকেরাও কি এভাবে বসেন?

আরেক স্টলে দেখি, কবি রফিক আজাদ বসে আছেন। 'ভাত দে হারামজাদা'র কবি। তাঁর কাছে গিয়ে ছবি তুলি। এরশাদকে নিয়ে ব্যঙ্গ করে কবিতা 'সব শালা কবি হতে চায়' লিখে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কবি মোহাম্মদ রফিক বেশ আলোচনায়। তিনি একটা টেবিলের ওপর তাঁর কবিতার বই নিয়ে বসেছেন খোলা মাঠে। খোলা মাঠে টেবিল-কাম-স্টল বানিয়ে তরুণ লেখক-লেখিকাদের বেশ ভিড়। ফেরদৌস নাহার, সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলালরা আড্ডা মারছেন আর পরিচিত লোক পেলে নিজের বই বিক্রির চেষ্টা করছেন।

AMARBOI.COM

হঠাৎ এক স্টলের সামনে দেখি এক সুদর্শন যুবক দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর সামনে বেশ কজন তরুণীর ভিড়। তিনি একে একে অটোগ্রাফ দিচ্ছেন। একজন জানালেন, ইনি ইমদাদুল হক মিলন। তাঁর ছবি তোলার জন্য ক্যামেরা তাক করতেই তিনি বেশ সচেতনভাবে ক্যামেরার সামনে দাঁড়ান, পোজ দিয়ে ছবি তোলার সময় মডেলরা যেমন করেন, অনেকটা সে রকম। এই লেখকের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করে, সাহস হয় না।

কামরুল হাসান এক স্টলের সামনের টেবিলে বসে কাগজের ওপর ছবি এঁকে দিচ্ছেন, যে-ই চাইছে তার মুখের দিকে তাকিয়ে কলম দিয়ে কয়েকটা আঁচড় দিচ্ছেন, প্রতিকৃতি হয়ে যাচ্ছে।

আরেকটা স্টলের সামনে বেশ ভিড় দেখে এগিয়ে যাই। একটু উঁকি মেরে দেখি, হুমায়ূন আহমেদ এখানে বসে আছেন। তাঁর সামনেও তরুণীদের ভিড়। তিনি পেছনের একটা চেয়ারে বসে। একটা একটা বই তাঁর কাছে যাচ্ছে তিনি নাম জিজ্ঞেস করছেন, নাম লিখছেন, সই করছেন, বই ফেরত দিচ্ছেন।

এই অটোগ্রাফ-শিকারিদের মধ্যে দেখি অ্যাপ্রন পরা কয়েজন তরুণী লাইন ধরে দাঁড়িয়ে। তাঁদের একজনের ববকাট চুল। তিনি যখন বইটি হুমায়ূন আহমেদের কাছে বাড়িয়ে দিচ্ছেন, তখনই আমার ক্যামেরায় ফ্লাশ বাতি জ্বলে ওঠে।

অ্যাপ্রন পরা এই মেডিকেল ছাত্রী একসময় অতি বিখ্যাত হয়ে যান। এর বেশ কয়েক বছর পর, হুমায়ূন আহমেদের ৫০তম জন্মদিনে এই ছবিটি উপহার দিয়েছিলাম। সে গল্প পরে বলব।

AMARBOI.COM



রবীন্দ্র-রচনার মুগ্ধ পাঠক

বইমেলা 'কভার' করার ব্যাপারটা ধীরে ধীরে বুঝতে পারি। মেলা নিয়ে লেখা ও ছবি *পাক্ষিক দিশায়* প্রকাশিত হয়। দিনে দিনে আমি তরুণ সাংবাদিক হিসেবে *দিশা* পত্রিকার সম্পাদকের প্রিয়ভাজন হয়ে উঠি। প্রতি সংখ্যায় তিন-চারটি লেখা ছাপা হয়। এর মধ্যে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস শুরু হয়ে গেছে, তিতুমীর হলে নিজের সিটও হয়েছে। পত্রপত্রিকার অফিসে ঘন ঘন

দৌড়াদৌড়ির জন্য নিজস্ব একটা বাহনও দরকার হয়। দুই মাসের মাথায় লাল রঙের একটা হিরো সাইকেল হয়ে যায় আমার।

তিতুমীর হলে রিডিংরুমে পত্রিকা পড়ার একটা জায়গা আছে। সেখানে দৈনিক পত্রিকার বাইরে *বিচিত্রা, রোববার* আর *সন্ধানী*ও আছে। আমি তখন নিজের দায়িত্বে সেখানে সেঁটে রাখি *পাক্ষিক দিশা*। মাঝে মাঝে লক্ষ করি, হুমায়ূন আহমেদের সাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছে যে সংখ্যায় সেটি ছাত্ররা বেশ মনোযোগ দিয়ে পড়ছে।

হুমায়ূন আহমেদের সাক্ষাৎকার ছাপা হওয়ার পর আমার নিজের মধ্যেও সাংবাদিক-সাংবাদিক ভাব আসতে থাকে। ঢাকার বিভিন্ন পত্রিকায় মাঝে মাঝে আমার লেখা দেখা যায়; লন্ডন থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক *সুরমায়* প্রতি সপ্তাহে আমি 'ঢাকার দিনকাল' শিরোনামে একটা কলাম লিখি। একই পত্রিকায় ঢাকা থেকে আরও দুজন বড় সাংবাদিক খবর পাঠান—*দৈনিক ইত্তেফাক*-এর কূটনৈতিক প্রতিবেদক মতিউর রহমান চৌধুরী ও *সাপ্তাহিক চিত্রালী*র ফারুখ ফয়সল। আমি তাঁদের সঙ্গেও দেখা-সাক্ষাৎ করি, উপদেশ নিই। আমার কাণ্ডকারখানা দেখে ডিপার্টমেন্টের আর্ট-কালচারের সঙ্গে যুক্ত সিনিয়র ভাইয়েরাও আমাকে বেশ পাত্তা দিতে শুরু করেছেন। এঁদের কেউ কেউ আমার সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁদের একজন স্থাপত্য বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র কাজী মোহাম্মাদ আরিফ। তাঁর একটা আইডিয়া, সামনে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুবার্ষিকী। এ উপলক্ষে আমরা কয়েকজনের মতামত নিয়ে একটা রিপোর্ট করব। তারপর ছাপার জন্য *বিচিত্রায়* নিয়ে যাব।

AMARBOI.COM

আমাদের তালিকা তৈরি হয়। যাঁদের তিনি ব্যক্তিগতভাবে চেনেন এবং যাঁদের কাছে যাওয়া যাবে, সে রকম একটা তালিকাও তৈরি করি। ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, ইমদাদুল হক মিলন, শিল্পী রফিকুন নবী, শিশুসাহিত্যিক আলী ইমাম, সংগীতশিল্পী কাদেরী কিবরিয়া, একজন কলেজশিক্ষিকা, দুজন কলেজছাত্রী এবং ড. হুমায়ূন আহমেদ। দায়িত্ব ভাগ হয়ে যায়। বেশির ভাগ বুদ্ধিজীবী তাঁর ব্যক্তিগত পরিচিত। তিনি তাঁদের কাছে চলে যান। আমার ওপর দায়িত্ব পড়ল হুমায়ূন আহমেদের মন্তব্য নিয়ে আসা।

লিখিত পাঁচটি প্রশ্ন নিয়ে তাঁর বাসায় পৌঁছাতে দেরি হয় না। প্রশ্নপত্র হাতে নিয়েই তিনি বলেন, 'আপনি একটু বসেন, আমি আসছি।' চলে গেলেন ঘরের ভেতর। মিনিট দশেক পর ফেরত এলেন। দেখি, আমার প্রশ্নপত্রের সব উত্তরের জায়গায় ফাঁকা, কিছুই লেখেননি। যেটি তিনি লিখে আনলেন, তা হলো :

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস সম্পর্কে আমি কিছু বলব এত বড় ধৃষ্টতা আমার নেই, এই সব বিচার বিবেচনা করবেন সাহিত্যের অধ্যাপকরা। আমি রবীন্দ্ররচনার একজন মুগ্ধ পাঠক। এর বেশি কিছু না। বাংলা সাহিত্যে এত বড় মাপের একজন এসেছেন এটা ভাবলেই মন ভরে যায়। রবীন্দ্ররচনা পাঠের মুগ্ধতা আমার কখনো কাটবে না। একজন বিমুগ্ধ পাঠককে কোনো প্রশ্ন করা বৃথা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করছেন এটা ভাবতেই আমি সংকোচ বোধ করছি। আমাকে ক্ষমা করুন।

সব উত্তর জোগাড় করা হলো, একত্র করা হলো, এবার পত্রিকায় ছাপানোর পালা। প্রথমে গেলাম *সাপ্তাহিক বিচিত্রায়* মঈনুল আহসান সাবেরের কাছে। তিনি ভালো গল্প-উপন্যাস লেখেন, এমন আশা রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে তিনি লুফে নেবেন। তিনি লেখা রেখে দিয়ে আগামীকাল এসে খোঁজ নিতে বলেন। জানালেন, বিষয়টি শাহরিয়ার কবির সাহেব দেখেন, তিনি এলে সিদ্ধান্ত হবে। পরদিন শাহরিয়ার কবির আমাকে প্রায় ধমক দিয়ে বলেন, 'আপনি *বিচিত্রা* পড়েন? দেখেছেন কখনো? আমরা কি রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুদিনে কোনো সংখ্যা করি?'

তাঁকে বলতে পারতাম, 'আগে করেন নাই তো কী হয়েছে, এ বছর থেকে করেন।' বলে কী লাভ! আমি সেই *পাক্ষিক দিশার* অফিসে যাই। ১৯৮৬ সালের ১২ মে *পাক্ষিক দিশার* প্রথম বর্ষ ১৫তম সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের লম্বা দাড়িওয়ালা একটা ছবি দিয়ে প্রচ্ছদ ছাপা হয়।

এ দফায় হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে আমার একটা বিরতিপর্ব শুরু হয়। বড় কোনো প্রয়োজন না পড়ায় তাঁর সঙ্গে আমার আর কোনো দেখাসাক্ষাৎ বা যোগাযোগ হয় না।

AMARBOI.COM



প্রধান অতিথির মুগ্ধতা

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের হলে জানাজানি হয় যে, *এইসব দিনরাত্রির* নাট্যকার হুমায়ূন আহমেদকে হলের একজন ছাত্র ভালো চেনে, তার সঙ্গে খাতির আছে। সুতরাং সামনের বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার সময় এক সন্ধ্যায় হুমায়ূন আহমেদকে উপস্থিত করার দায়িত্ব পড়ে আমার ওপর। তিনি প্রধান অতিথি।

১৯৮৭ সালের অক্টোবর মাস। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের তিতুমীর হলের বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে এসেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. হুমায়ূন আহমেদ। মঞ্চে সভাপতির আসনে বসে আছেন তিতুমীর হলের প্রভোস্ট প্রফেসর ড. ফিরোজ আহমেদ। প্রধান অতিথির বক্তৃতায় হুমায়ূন আহমেদ দুটি গল্প শোনান। প্রথমটির শিরোনাম 'প্রধান অতিথি'।

হুমায়ূন আহমেদ বলেন, তখন তিনি কুমিল্লায় ছিলেন। তরুণ লেখক হিসেবে তাঁর কিছু নামডাক হয়েছে। একবার একদল তরুণ এসে তাঁকে বলল, আগামীকাল তাদের ক্লাবের উদ্বোধন, তাঁকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হতে হবে। আয়োজকেরা তাঁকে যথাসময়ে নিয়ে যাবেন। তিনি শোনামাত্র রাজি হয়ে যান।

পরদিন ইস্ত্রি করা কাপড় পরে তৈরি হয়ে বসে থাকেন দুপুর থেকে। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা আসে, তাকে কেউ নিতে আসে না। সন্ধ্যায় তিনি নিজেই গিয়ে হাজির হন ক্লাবে, শোনেন অনুষ্ঠান শেষ। প্রধান অতিথি হিসেবে আগে যাঁকে ঠিক করা হয়েছিল, তিনি রাজি হতে চাইছিলেন না। পরে আবার রাজি হয়ে যান। তাঁকে নিয়েই অনুষ্ঠান করে ক্লাবের তরুণেরা। হুমায়ূন আহমেদ ছিলেন 'স্ট্যান্ডবাই প্রধান অতিথি'। মূল প্রধান অতিথি চলে আসার কারণে তাঁকে আর দরকার হয়নি।

হাসির রোল পড়ে ছাত্রদের মধ্যে। হুমায়ূন আহমেদ জানান, আজ বিকেল পর্যন্ত তাঁর এমন আশঙ্কাই হয়েছিল। কিন্তু ঠিক সময়েই 'প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়' লেখা একটা মাইক্রোবাস তাঁর বাড়ির গলির মোড়ে দেখে তিনি অনেকটা নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন যে এবার বোধ হয় মিস হবে না। জানালেন, কোনো অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে এটাই তাঁর প্রথম উপস্থিতি।

অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীদের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে তিনি ফলাফল ঘোষণা করেন এবং বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। সবশেষে একটা মুগ্ধতার গল্প শোনান ছাত্রদের।

তখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ প্রভাষক। এমএ ক্লাসের ফাইনাল পরীক্ষার এক্সটারনাল হিসেবে গিয়েছেন বরিশালের এক কলেজে। পরীক্ষা নেওয়া শেষ, মৌখিক পরীক্ষাও প্রায় শেষ। কাল ঢাকা ফিরে রেজাল্ট জমা দিতে হবে। এমন সময় জানতে পারলেন, এমএ ক্লাসের এক ছাত্রী মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেনি, মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা। মেয়েটি ভালো ছাত্রী, ভালো রেজাল্ট তার। কিন্তু মৌখিক পরীক্ষায় অংশ না নিলে সে আর এ বছর পাস করতে পারবে না। বিকেলবেলা তিনি ঠিক করলেন, এ মেয়েটির বাড়ি যাবেন তিনি।

AMARBOI.COM

কলেজের শিক্ষকেরা অবাক। একি! এটা কী করে সম্ভব? কিন্তু এক্সটারনাল নাছোড়বান্দা। অবশেষে নৌকা জোগাড় হলো। তিন-চার মাইলের পথ। নৌকা করে তাঁরা যখন সেই মেয়েটির বাড়িতে গিয়ে পৌছান, তখন এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয়।

জানা গেল, মেয়েটি সেই দিনই একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছে। এই অবস্থায় তার এক্সটারনাল শিক্ষককে দেখে মেয়েটি হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে।

এক্সটারনাল কেমিস্ট্রির সবচেয়ে সহজ একটা প্রশ্ন করেন, 'সালফিউরিক অ্যাসিডের সমীকরণ বলো?'

এর উত্তর ক্লাস নাইনের ছেলেমেয়েরাও জানে। মেয়েটি বলে, 'স্যার, আমি আপনার কোনো প্রশ্নের জবাব দেব না। আমি পরীক্ষা দিতে যেতে পারিনি, আমি ফেল করার যোগ্য। আপনি আমার বাড়িতে এসেছেন এর চেয়ে বড় কোনো পাওয়া আমার নাই। পরীক্ষা পাসের চেয়ে বড় আনন্দ পেয়ে গেছি আমি।'

প্রধান অতিথি তখন ছাত্রদের বলেন, 'আমি আসলে মেয়েটাকে পাস করানোর জন্য ওর বাড়িতে যাইনি। আমি গিয়েছিলাম আমার নিজের আনন্দ উপভোগ করার জন্য। আমি জানি, মেয়েটি আমাকে দেখে বিস্মিত হবে। ওর চোখেমুখে মুগ্ধতার যে চিহ্ন ভেসে উঠবে, ওটা দেখে আমি আনন্দিত হব। মানুষের মুগ্ধতা আমাকে বড় আনন্দ দেয়। আমি নিজেও মুগ্ধ হতে পছন্দ করি, আমার পাঠকদেরও আমি মুগ্ধ করতে চাই।'

AMARBOI.COM

এই গল্পটা হুমায়ূন আহমেদ পরে অনেক সুন্দর করে লিখেছেন। বহু আড্ডায় বলেছেনও।

আমি কিছুদিন বুয়েটের পড়ালেখার চাপে ব্যস্ত হয়ে থাকি। তাঁর সঙ্গে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত আমার আর কোনো দেখাসাক্ষাৎ বা যোগাযোগ হয় না।



অঙ্গনা ও হুমায়ূনের জহুরি চোখ

১৯৮৮ সালে *অঙ্গনা* নামের একটা পাক্ষিক পত্রিকা দ্বিতীয় দফায় হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে আমার সংযোগ করিয়ে দিল। আমি তখন থার্ড ইয়ারে উঠেছি। বুয়েটের তিতুমীর হলের চারতলার একটি কামরায় থাকি আমরা

তিনজন। তিনজনই আর্কিটেকচারের ছাত্র। আগের বছর আমার সঙ্গে এক কামরায় থাকবে বলে শের-এ-বাংলা হল থেকে অনেক ঝামেলা-যন্ত্রণা করে তিতুমীর হলে চলে এসেছে শওকত। ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ থেকে আমরা তিনজন মাত্র সুযোগ পেয়েছি স্থাপত্য বিভাগে। আমাদের অন্য বন্ধু রম্য রহীম থাকে নজরুল ইসলাম হলে।

আমি আর শওকতের চলাফেরা দেখে ছেলেরা আমাদের নাম দিয়েছিল 'মানিকজোড়'। আমাদের দুজনের এক রুটিন, এক মানিব্যাগ। সবকিছু একসঙ্গে করি।

আমাদের মানিব্যাগ কখনো আমার কাছে, কখনো শওকতের কাছে থাকে, কিন্তু শওকতের ক্যামেরাটা সারাক্ষণ আমিই রাখি। সেকেন্ড ইয়ারে আমাদের ৫০ নম্বরের একটা ফটোগ্রাফি কোর্স ছিল। আমার ক্যামেরা নিই, শওকতের জন্য একটা ব্রান্ড নিউ 'আসাহি প্যানট্যাক্স' ক্যামেরা চলে এল কুমিল্লা থেকে। এরপর এটা আমিই ব্যবহার করি। এমনকি শওকতের ক্লাস প্রজেক্টের ছবিগুলোও আমি তুলে দিয়ে তাকে ভারমুক্ত রাখি।

শওকতের বাবা কুমিল্লায় প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে চাকরি শেষ করে এ বছর অবসর নিয়েছেন। এখন ঢাকায় এসে একটা প্রাইভেট ফার্মে উপদেষ্টা হিসেবে যোগ দিয়েছেন। থাকছেন পশ্চিম রাজাবাজারে একটা ভাড়া করা ফ্ল্যাটে।

একদিন রাতে বাসা থেকে এসে শওকত বলে, তার মা আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। তাঁর মাথায় ভূত চেপেছে, তিনি পত্রিকা বের করবেন।

পরদিন বিকেলে আমার টিউশনি ছিল না। সুতরাং দুজন মিলে চলে গেলাম ইন্দিরা রোডে পশ্চিম রাজাবাজারে। এই প্রথম তার মাকে দেখি। তার নাম আয়শা (বেগম) মোমেন। যেসব পত্রিকায় আমার লেখা বেরিয়েছে, তিনি তার সবই দেখেছেন। এখন ঢাকায় সেটেল করবেন, তাঁর গাড়িতে 'সাংবাদিক' লেখা একটা স্টিকার থাকা দরকার, সুতরাং যেভাবেই হোক একটা পত্রিকা তিনি বের করতে চান। কলকাতার *সানন্দা* টাইপ পত্রিকা হতে হবে। মানি ইজ নো প্রবলেম।

রাতে শওকতের বাসায় থেকে যাই। সারা রাত চিন্তা করলাম, কী করে পত্রিকা প্রকাশ করা যায়! বুদ্ধিও পেয়ে গেলাম। পরদিন হাজির হলাম *আনন্দপত্র* অফিসে।

'বাংলাদেশের স্থাপত্যরীতি' দিয়ে শুরু হয়েছিল এই হাউসে আমার লেখালেখি। তখন মাসিক *নিপুণ*-এর জন্য এ লেখা লিখেছিলাম। পরে এর সম্পাদক মোস্তাফা জব্বার বাংলা ভাষার প্রথম কম্পিউটার কম্পোজের সাপ্তাহিক বের করেন *আনন্দপত্র* নামে। কম্পিউটারে কম্পোজ হয়ে আমার

AMARBOI.COM

লেখা ছাপা হবে, এ আনন্দে আমি এ সাপ্তাহিকে লেখার আগ্রহ প্রকাশ করি। মোস্তাফা জব্বার আমার আগের লেখা ছেপেছেন *নিপুণ*-এ।

এই অফিসের একজন সাংবাদিক আছেন, মোহন খান। মোস্তাফা জব্বার যদিও সম্পাদক, কিন্তু এক দিন ছাড়া আর কখনো তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। আমার যোগাযোগ ছিল মোহন খানের সঙ্গে। তিনি আমাকে খুব পছন্দ করেন। কয়েক মাস ধরে আমি এই সাপ্তাহিকে লিখছি ঢাকার কড়চা বিভাগে। এখানে আমাকে বাংলা সিনেমার রিভিউ লিখতে হয়। প্রতি সপ্তাহে দুটি ছবি মুক্তি পায়। আমাদের হল থেকে তিন টাকার রিকশা-দূরত্বে বলাকা আর বিনাকা সিনেমা হল। আমরা যেকোনো হলে একটি সিনেমার জন্য দুজনে দুটি টিকিট কাটি। ইন্টারভেলের সময় বাথরুমের প্যাসেজ দিয়ে হল এক্সচেঞ্জ করে আমরা চলে যাই অন্য হলে। হাফ সিনেমা দেখলেই লেখার মতো উপাদান পেয়ে যাই। পুরো সিনেমা দেখা একসময় মারাত্মক অত্যাচার বলেও মনে হতে থাকে। অর্ধেক দেখেও আমি যা লিখতাম, মোহন ভাই তারই প্রশংসা করতেন। অ্যাকাউন্টসের লোকটাকে ডেকে এনে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। মাস শেষে বিল পেয়ে যেতাম।

AMARBOI.COM

আমি মোহন খানকে নানা রকম প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে আসি আয়শা মোমেনের বাসায়। আমাদের কাজ শুরু হয়ে যায়। আমি ডিএফপি, ডিসি অফিস, হকার্স অ্যাসোসিয়েশনে দৌড়াদৌড়ি করি, মোহন ভাই লেখা জোগাড়ের ধারণা দেন।

আমাকে বানানো হয়েছে সহকারী সম্পাদক, তিনি নির্বাহী সম্পাদক। আমাদের সম্পাদক আয়শা মোমেন ৩০ দিনের মাথায় পত্রিকা প্রকাশ করতে চান, গাড়িতে লাগাতে চান 'সাংবাদিক' লেখা স্টিকার।

পত্রিকাটি হবে নারীবিষয়ক, নাম *অঙ্গনা*। উদ্বোধনী সংখ্যায় জাহানারা ইমামের একটা সাক্ষাৎকার প্রকাশের সিদ্ধান্ত হলো। প্রথম সংখ্যা বেরোল প্রচ্ছদে জাহানারা ইমামের ফুল পেজ ছবি দিয়ে। জাহানারা ইমাম খুব খুশি। অনেক মধুর সম্পর্ক তৈরি হয় তাঁর সঙ্গে। কারণে-অকারণে আমি তাঁর এলিফ্যান্ট রোডের বাড়িতে চলে যেতাম। ছেলের মতো স্নেহ করতেন আমাকে। একসময় এই পাক্ষিক *অঙ্গনার* উপদেষ্টা হিসেবে তাঁর নামটিও আমি ব্যবহার করার অনুমতি পাই।

সম্পাদকের ফ্ল্যাটের কোনায় কেয়ারটেকার বা ড্রাইভারের জন্য একটা রুম ছিল, সেটাকে অফিস বানানো হয়। এ অফিসে বসে দুজনের বেশি লোক কাজ করতে পারে না। একটিমাত্র টেবিল। সেটাই সম্পাদকের, সেটাই পেস্টারের। সম্পাদককে কখনো অফিসে বসতে হতো না। তিনি শুধু খবর নিতেন নতুন

সংখ্যা কবে আসবে। মাসে দুটি সংখ্যা বের করতে হতো, স্টাফ মাত্র দুজন। এ পত্রিকার রিপোর্টার, ফটোগ্রাফার, আংশিক এডিটর, সার্কুলেশন ম্যানেজার, পেস্টার, গ্রাফিক ডিজাইনারের প্রায় সব কাজই আমাকে করতে হয়। আমার ক্লাস ফাঁকি দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। একদিন মোহন ভাই বলেন, তোমাকে একটা ছেলে দিই, ভালো হাত, ওর নাম মাহফুজুর রহমান, আমাদের রিপোর্টার হিসেবে ওকে দিয়ে কিছু অ্যাসাইনমেন্ট করাতে পারব।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্র মাহফুজুর রহমান। এক বছর আগে ফেনী থেকে ঢাকায় এসেছে। পাস কোর্সে বিএ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে, সম্ভবত ম্যানেজমেন্টে। ছেলেটি খুবই নম্র, ভদ্র ও পরিশ্রমী। আমার চেয়ে বছর খানেকের ছোট হবে বয়সে কিংবা একই বয়সী। মাহফুজ লেগে গেল কাজে। ১ হাজার ৫০০ টাকা বেতন, পদবি চিফ রিপোর্টার। মাহফুজই একমাত্র রিপোর্টার। মোহন ভাই অনেক সিনে সাংবাদিকের লেখা আনতেন। পত্রিকা প্রকাশের পর বিল নিয়ে সমস্যা হয়। দ্বিতীয়বার কেউ লেখা দেন না। তখন আমি আর মাহফুজ মিলে পাতা ভরাই। মাহফুজ অনেক লিখতে পারত। প্রতিবেদন তৈরি করে, ইন্টারভিউ করে; কিছু অনুবাদের কাজও তার ভাইকে দিয়ে করিয়ে আনে।

আমাদের সম্পাদক একদিন বললেন, তাকে কোনো এক ভাবি বলেছেন যে হুমায়ূন আহমেদের লেখা দিতে পারলে পত্রিকাটি ভালো চলবে। সুতরাং যে করেই হোক, হুমায়ূন আহমেদের লেখা চাই।

আমি হুমায়ূন আহমেদকে চিনি। সুতরাং আমার ওপর দায়িত্ব পড়ল তাঁর লেখা নিয়ে আসার। *উন্মাদ* পত্রিকায় 'এলে বেলে' শিরোনামে কিছু লেখা পড়েছেন তিনি হুমায়ূন আহমেদের। এই টাইপের লেখা পাবলিক বেশি খায়, সুতরাং এ ধরনের লেখা নিয়ে আসতে হবে। লেখার জন্য লেখককে সম্মানী দিতে হয়—এটা অনেক কষ্টে বোঝানো হলো তাঁকে। তিনি মুখ কালো করে বললেন, 'লাগলে তো দিতেই হবে। দেখো, যত কমে পারো নিয়ে আসো।'

হুমায়ূন আহমেদের সাক্ষাৎকার প্রকাশ করে ঢাকায় আমার সাংবাদিকতা জীবনের সূচনা হয়েছিল। হুমায়ূন আহমেদের সেই স্মৃতি মনে থাকার কথা নয়। এর মধ্যে শুনেছি, তিনি বাসা বদল করেছেন এবং শহীদুল্লাহ হলের হাউস টিউটরের বাসায় থাকেন। তাঁর কোনো ফোন নম্বর আমার কাছে নেই। আমার দু-একজন বন্ধু শহীদুল্লাহ হলে থাকে।

আমি প্রথমেই শহীদুল্লাহ হলে গিয়ে আমার বন্ধুদের খুঁজে বের করি। ইরফান আর হাসান আছে ওখানে। তাদের ক্লাসও সায়েন্স ফ্যাকাল্টিতে।

AMARBOI.COM

সুতরাং হুমায়ূন আহমেদ সম্পর্কে তারা নিশ্চয়ই ভালো তথ্য দিতে পারবে। আমি হলে গিয়ে মজার গল্প শুনি।

হাসান বলে, 'হুমায়ূন আহমেদের মাথায় ছিট আছে।'

'মানে?'

'ছিট না থাকলে কেউ রাতের বেলা এই পুকুরে বাচ্চা বাচ্চা মেয়েদের নিয়ে গোসল করতে নামে?'

আমি অবাক হই। আমার অবাক হওয়ার বিষয়টা হাসান খুব এনজয় করে। আমাকে আরেকটা গল্প শোনায়।

অনেক দিন ধরে হলের এক ছাত্র অনুপস্থিত। সে সেকেন্ড ইয়ার ফাইনাল পরীক্ষাও দেয়নি। হলে সিটের সংকট। রুমের ছাত্ররা এই ছাত্রের সিট খালি করে নতুন ছাত্র আনতে চাইছে। হাউস টিউটর হুমায়ূন আহমেদ কোনোভাবেই তা করছেন না। এক দিন সেই ছাত্র যথারীতি হলে ফেরত এল। এবং এসে দেখল যে তার সিটে অন্য একজনের গেস্ট শুয়ে আছে।

তার সিট বেদখল হয়ে যাচ্ছে দেখে সরাসরি সে দেখা করল হাউস টিউটরের সঙ্গে। হাউস টিউটর বলেন, 'তুমি এত দিন আসোনি কেন?' ছাত্রটি মিনমিন করে বলে, 'স্যার, আমি বাড়ি গিয়েছিলাম, সবাই ধরে আমাকে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে।'

হাউস টিউটর বলেন, 'ঠিক আছে, তোমার রুমে যাও, আমি দেখছি।' ঘণ্টা খানেক পর হুমায়ূন আহমেদ সেই ছেলের কামরায় গিয়ে হাজির। তাঁর হাতে সদ্য প্রকাশিত দুটো বই। তিনি ছেলেটির হাতে বই দুটি তুলে দিয়ে বলেন, 'নতুন বউ রেখে তুমি হলে পড়ে আছ কেন? যাও, বাড়ি গিয়ে আরও কিছুদিন থেকে আসো। তোমার সিট আমি পাহারা দেব। আর এই বইগুলো তোমার বউকে দিয়ো, আমার উপহার।'

হাসান বলল, 'মানুষকে ইমপ্রেস করার এক অসাধারণ ক্ষমতা আছে এই লোকটার। তার এসব আচরণে ছাত্ররা মুগ্ধ।'

এক ছুটির দিনে আমি ভয়ে ভয়ে হুমায়ূন আহমেদের বাসায় হাজির হই। অবাক বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করি, তাঁর স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর। আমাদের প্রথম সাক্ষাতের কথা তাঁর মনে আছে।

প্রথমেই বলেন, 'তুমি আর্কিটেক্ট না?' আমি বলি, 'স্যার, আমি এখন মাত্র থার্ড ইয়ারে। আপনার সঙ্গে যখন পরিচয়, তখন ফার্স্ট ইয়ারের ক্লাসও শুরু হয় নাই।'

ইনিয়েবিনিয়ে তাঁর কাছে একটা লেখা চাই। তিনি সম্পাদককে চেনেন না, পত্রিকার নামও শোনেননি। প্রায় ধমকের সুরে, কিঞ্চিৎ বিরক্ত মুখে বলেন, 'কী লেখা?'

AMARBOI.COM

'স্যার, একটা রম্যরচনা। এক-দুই পৃষ্ঠার, আপনি যা ইচ্ছা লিখে দিন।'

'তুমি কি জানো আমি কত নিই?'

'না স্যার।'

'এ রকম একটা লেখার জন্য আমাকে ১ হাজার টাকা দিতে হবে।'

একটু চিন্তায় পড়ে গেলাম। এর আগে দু-একজন বড় লেখকের কাছ থেকে গল্প নিয়েছি, ৩০০-৪০০ টাকা দিয়েছি। লেখক খুশি, আমিও খুশি। হুমায়ূন আহমেদের জন্য আমি বাজেট পাস করিয়েছি ৫০০ টাকা। এখন যদি ১ হাজার টাকা বলি, খালাম্মা কী মনে করবেন? আমি খানিকক্ষণ চুপ করে থাকি।

হুমায়ূন আহমেদ বলেন, 'আমাকে যাতে অনেক কম লিখতে হয়, এ জন্য আমি ইচ্ছে করেই অনেক বেশি একটা রেট বলে দিই। আমি জানি, বাংলাদেশের কোনো লেখকই দু-তিন পৃষ্ঠার একটা রম্যগল্পের জন্য ১ হাজার টাকা চাইবেন না। কিন্তু আমি চাইব, যাতে আমার কাছে কম লোক আসে।'

আমি বললাম, 'স্যার, আপনার লেখাটা নিতে না পারলে আমার বোধ হয় চাকরিটা থাকবে না। আমি এই ৫০০ টাকা নিয়ে এসেছি, আপনি কি স্যার এটা রাখবেন?'

স্যার আমার কাছ থেকে খামটা নিলেন। বললেন, 'পরশু বিকেল পাঁচটায় এসে লেখা নিয়ে যেয়ো।'

সেদিন বিকেল পাঁচটায় তাঁর বাসায় হাজির হই, সঙ্গে দুই প্যাকেট ফাইভ ফিফটি ফাইভ সিগারেট। আমি জানি, স্যার এটা পছন্দ করেন। দামি সিগারেটে স্যারের আগ্রহ থাকবে। তাঁর *শঙ্খনীল কারাগার*-এ পড়েছি, রাবেয়া আপা তার (খোকা) কাছে একটা চিঠি লিখেছেন, 'শরীরের দিকে লক্ষ রাখিস। বাজে সিগারেট টানবি না। কম খাবি, কিন্তু দামি হতে হবে।' আমার মনে হলো, বাড়তি ঘুষ হিসেবে এই জঘন্য দুর্গন্ধযুক্ত শলাকাগুলো তাঁর জন্য অনেক আনন্দের হবে।

AMARBOI.COM

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ হলের হাউস টিউটরের বাসায় বেশ বড় একটা ড্রয়িংরুম। ফ্লোরের ওপর বসে কম্পিউটারে গেম খেলছিলেন হুমায়ূন আহমেদ। কোলে শিশুপুত্র নুহাশ। পত্রিকায় পড়েছি, একটা পুত্রসন্তানের জন্য তাঁর খুব প্রার্থনা ছিল, তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে শাহজালাল (র.)-এর মাজারে পর্যন্ত গিয়েছিলেন। অবশেষে তিনি পুত্রসন্তানের জনক হন। তিন কন্যার পর প্রথম পুত্রসন্তান পেয়ে হুমায়ূন আহমেদ খুব খুশি। নাম রেখেছেন নুহাশ হুমায়ূন। নুহাশ শব্দটি আমার কাছে নতুন।

নুহাশকে ভেতরে পাঠিয়ে আমাকে নিয়ে এলেন বারান্দায়। চায়ের সঙ্গে নতুন আনা ফাইভ ফিফটি ফাইভের প্যাকেটটা খুললেন। তাঁর মনটা খুব ফুরফুরা।

একটা গল্প বললেন তিনি, 'আমি আসলে মানুষের মুগ্ধতাকে খুব এনজয় করি। তোমাকে একটা ঘটনা বলি, এক ফকির এসেছে এক মধ্যবিত্ত লোকের বাড়িতে। সে কিছু সাহায্য চায়। লোকটির পাঞ্জাবির এক পকেটে ৫-১০ টাকার কয়েকটা নোট, অন্য পকেটে একটি ৫০০ টাকার নোট। লোকটি তার ছোট মেয়েটিকে ডেকে বলে, মা, আমার পকেটে একটা পাঁচ টাকার নোট আছে, ফকিরকে দিয়ে দাও। মেয়েটি ভুল করে ফকিরকে ৫০০ টাকার নোটটি দিয়ে দিল। এখন অবস্থাটা চিন্তা করো। ফকিরের অবস্থা দেখো আর লোকটির অবস্থা দেখো। সে না পারছে ৫০০ টাকা দিয়ে দিতে, না পারছে ওই ফকিরের চোখের মুগ্ধতাকে উপেক্ষা করতে। তুমি একবার কোনো ফকিরকে ৫০০ টাকা দিয়ে দেখতে পারো। ওর চোখেমুখে তুমি যে মুগ্ধতা দেখবে, তার কাছে ৫০০ টাকা কিছু না।'

এই গল্পের একটা রূপান্তর দেখেছিলাম প্রায় ২০ বছর পর তাঁর *দুই দুয়ারী* ছবিতে। নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলে মাহফুজ একটা বিদেশি বৃত্তি পাওয়ায় আনন্দে এক ফকিরকে ৫০০ টাকার নোট দিয়ে তার আনন্দটুকু উপভোগ করেছিল।

সেদিন আমি আরও কিছুক্ষণ তাঁর বারান্দায় বসি। মুগ্ধ হয়ে তাঁর কথাবার্তা শুনি। যেকোনো কথা শুনলেই আমার ফুর্তি লাগছে, আমিও হাসছি।

এই লেখাটি পাওয়ার পর হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে *অঙ্গনা* পত্রিকার একটা চমৎকার সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়। একদিন পত্রিকার সম্পাদক আমাকে বলেন, তিনি হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে পরিচিত হতে চান, এবং পত্রিকার উপদেষ্টা পরিষদে তাঁর নামও যুক্ত করতে চান।

হুমায়ূন আহমেদকে এই প্রস্তাব দিতে আমার সাহস হয় না। তিনি বলেন, তিনি নিজে গিয়ে তাঁকে এই প্রস্তাব দেবেন।

আমি ফোন করে হুমায়ূন আহমেদের কাছ থেকে সময় নিয়ে সম্পাদকসহ রওনা দিলাম। রাস্তায় নেমে গাড়ির বনেট ভর্তি করে ফলমূল কিনলেন সম্পাদক। বাসায় পৌঁছে দেখি, স্যার নেই। তাঁর স্ত্রী গুলতেকিন বললেন, 'ও এখন বাংলা একাডেমী গেছে, মিটিং আছে।'

আমি সম্পাদককে বাসায় বসিয়ে গাড়ি নিয়ে রওনা দিলাম বাংলা একাডেমীর দিকে। খুঁজে বের করলাম তাঁকে। দোতলার এক কামরায় দেখি চেয়ারের ওপর দুই পা তুলে বসে গল্প করছেন।

আমাকে দেখে কিঞ্চিৎ লজ্জিত। তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। বললেন, 'আপনি বাসায় যান, আমি আসছি।'

কিছুক্ষণ পর দেখি সাদা রঙের একটা টয়োটা গাড়ি করে তিনি বাসায়

AMARBOI.COM

ফিরলেন। বছর তিনেক আগে তাঁকে যখন দেখি, তখন থেকে তার এটুকু পরিবর্তন, আমার বেশ ভালো লাগে।

অঙ্গনা হুমায়ূন আহমেদের লেখা ছাপতে থাকে। *অঙ্গনার* ঈদসংখ্যার জন্য ৫ হাজার টাকায় তিনি একটা উপন্যাস (সায়েন্স ফিকশন) লিখে দেন। এই লেখা পাঠান আস্তে আস্তে। দু-তিন দিন পর পর ১০-১২ পৃষ্ঠা করে।

এমন মধুর সময় খুব বেশি কাটল না। ১৯৮৯ সালের মার্চ মাসের এক দিন আমি *অঙ্গনা* ছেড়ে এলাম। কিন্তু তত দিনে যা হওয়ার হয়ে গেছে। ক্লাস প্রজেক্টের একটা সাবসিডিয়ারি কোর্স 'ওয়ার্কিং ড্রয়িং'-এর পর পর তিনটা প্রজেক্ট লেট সাবমিশন ছিল। অনেক নম্বর মাইনাস করে আমার মোট নম্বরের গড় দাঁড়াল ৩৮ (পাস মার্ক ৪০)। নতুন করে প্রজেক্ট জমা দেওয়ার সুযোগ নেই। ফেল।

আরও এক বছর চলে গেল। এ বছরটা অবশ্য আমার খুব কাজে লেগেছিল। 'ডিজাইন'-এ গ্রেড ভালো থাকার কারণে 'এক্সেমপ্‌শন' পেয়ে গেলাম। আমি পুরো সপ্তাহে একটি বিষয়ের ক্লাস করি, শুধু 'ওয়ার্কিং ড্রয়িং'। এই এক বছরে দেশি-বিদেশি চারটা ফটোগ্রাফি প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেলাম। এদের প্রথমটি ইউনিসেফ আয়োজিত 'মেয়েশিশু' বিষয়ে। বাংলাদেশ ফটোগ্রাফিক সোসাইটির সদস্য হয়ে যাই। সারা দিন ক্যামেরা নিয়ে ছুটোছুটি করি। অনেক কিছুই করি, শুধু *অঙ্গনা* করি না।

আমার মনে পড়ে, *অঙ্গনার* জন্য লেখা আনতে গেছি স্যারের বাসায়, একদিন আমাকে একটা বাড়ির নকশা করে দিতে বলেছিলেন। শহীদুল্লাহ হলের টানা বারান্দায় বসিয়ে আমাকে একটা চমৎকার প্রস্তাব দেন তিনি, 'তুমি তো আর্কিটেক্ট, আমার জন্য একটা বাড়ির ডিজাইন করে দেবে?'

আমি বলি, 'স্যার, আমি থার্ড ইয়ারে পড়ছি মাত্র, তবে "রেসিডেন্স" প্রজেক্ট করেছি অনেক। ক্লাস প্রজেক্ট। সেকেন্ড ইয়ারে আমার প্রজেক্ট ছিল "একজন চিত্রকরের বাড়ি"—একজন লেখকের বাড়িও আমি ডিজাইন করতে পারব। আমাকে আপনার রিকোয়ারমেন্ট বলেন। আমি ব্যাগ থেকে কাগজ কলম বের করি।'

স্যার বলেন, 'লেখো, আমার বাড়ির পেছনে একটা বড় পুকুর থাকবে, সামনে বিশাল বাগান। বাগানে ১ হাজার প্রকারের গাছগাছালি। কিছু ফুলের গাছ, কিছু ফলের, কিছু শুধু সুন্দর সুন্দর পাতার...।'

আমি থেমে যাই, বলি, 'স্যার, আপনার লোকেশনটা কোথায়? সাইট মেজারমেন্ট তো লাগবে, স্যার—এরিয়া কতটুকু?'

AMARBOI.COM

স্যার আমার মুখের দিকে তাকান। একটু হাসেন। বলেন, 'আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামান্য একজন শিক্ষক, টুকটাক লেখালেখি করি, আমার জমি থাকবে কোথায়? তুমি আর্কিটেকচারের ছাত্র, তোমার কল্পনাশক্তি থাকবে আমার চেয়ে বেশি। তুমি তোমার পছন্দমতো একটা জায়গা ঠিক করে আমাকে ডিজাইনটা করে দাও। আমি যখন লিখব, আমার টেবিলের সামনে তোমার ডিজাইনের ছবিটা লাগিয়ে রাখব। ভাবব, ওই বাড়িতে বসেই আমি লিখছি।' একবার ভেবেছিলাম, একটা নকল ডিজাইন করে একটা মডেল বানিয়ে স্যারকে দিয়ে আসব। ওই পত্রিকাটা ছেড়ে দেওয়ার পর মনটা বিষিয়ে ছিল, কোনো কিছু করতে ইচ্ছা করেনি।

মোহন ভাই আর আমি *অঙ্গনা* ছাড়ার পরও মাহফুজ কিছুদিন থাকল; কারণ, ওর চাকরিটা দরকার ছিল। পরে মাহফুজ একটি সংখ্যা প্রকাশ করে। এরপর *অঙ্গনা* চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল। *অঙ্গনা*র প্রকাশনা বন্ধ হওয়ার পর মাহফুজের সঙ্গে আমার সম্পর্ক আরও গাঢ় হয়। একদিন দেখি, *পূর্ণিমা*য় মাহফুজ একটা প্রচ্ছদকাহিনি লিখেছে হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে। '৮৯-৯০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল খালি করে দেওয়া হলে মাহফুজ কয়েকবার আমার রুমে চলে এসেছিল। সে তখন তুখোড় সাংবাদিক। বড় বড় অ্যাসাইনমেন্ট করে *পূর্ণিমা*র জন্য। আমাকে জানায়, হুমায়ূন স্যারের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আছে। *পূর্ণিমা*তে একটা কভার স্টোরি করবে স্যারকে নিয়ে। আমার স্ক্র্যাপবুক থেকে *দিশা* পত্রিকায় হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে লেখা আমার ইন্টারভিউ কপিটা নিয়ে গেল। ফেরত পেলাম না।

১৯৮৯ সালে বিটিভির রজতজয়ন্তী নিয়ে *পূর্ণিমা*য় প্রচ্ছদকাহিনি করবে মাহফুজ, তার ক্যামেরাম্যান নেই। পত্রিকা অফিস বলেছে বাইরের কাউকে দিয়ে কাজটা করাতে।

মাহফুজ আমাকে নিয়ে রামপুরা-বেইলি রোড-শান্তিনগর-মগবাজার ঘুরে বেড়ায়। নায়ক-নায়িকার ছবি তুলি। এ সময় একদিন মাহফুজের একটা ছবি তুলি। আমি মাহফুজকে দেখি লেন্সের ভেতর দিয়ে। ফোকাস করতে করতে বলি, 'আরে, তোমার চেহারা তো নায়কদের মতো, তুমিও তো অভিনয় করতে পারো।'

ছবি দেখে মাহফুজ মুগ্ধ। এর বহু বছর পর মাহফুজ আমাকে বলেছে, ওই দিনের ওই ঘটনা থেকেই নাকি ওর মধ্যে অভিনেতা হওয়ার ইচ্ছা জন্মেছিল।

মাহফুজ প্রায়ই আমার রুমে এসে থাকে, আমি তার কাছ থেকে খবর

AMARBOI.COM

পাই। এর মধ্যে স্যারের সঙ্গে তার খুব ভালো যোগাযোগ তৈরি হয়েছে। দু-তিন বছরে সে *পূর্ণিমা*তে ২১টি স্টোরি করেছে হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে।

সে একটা বইও লিখেছে স্যারের ওপর, *হাজার প্রশ্ন : ঘরে বাইরে হুমায়ূন আহমেদ*।

দিনে দিনে মাহফুজ হুমায়ূন আহমেদের এত বড় ভক্তে পরিণত যে সে তার নামের শেষের 'রহমান'টুকু ছেঁটে 'আহমেদ' যুক্ত করে।

হুমায়ূন আহমেদের চোখ ছিল শিকারির, জহুরির। তিনি জিনিস চিনতেন। বেছে বেছে বহু প্রতিভা তিনি তুলে এনেছিলেন। তাঁর ছোঁয়ায় অনেক ঢেলাকে মার্বেলে পরিণত হতে দেখেছি।

হুমায়ূন আহমেদের সংস্পর্শে এসে মাহফুজ আহমেদের সাংবাদিক-জীবনের অবসান ঘটে। প্রথমে ছোট ছোট চরিত্রে অভিনয়, পরে বড় চরিত্রে যায়। দিনে দিনে সে তারকা হয়ে ওঠে।

২০০১ সালে হুমায়ূন আহমেদ *এই মেঘ, রৌদ্র ছায়া* নামে একটা উপন্যাস উৎসর্গ করেন মাহফুজকে। উৎসর্গপত্রে তিনি লেখেন,

> ছবিপাড়ায় আমার একটা ছোট্ট অফিস আছে। সেই অফিসে রোজ দুপুরবেলা অভিনেতা মাহফুজ আহমেদ উপস্থিত হয় এবং হাসি মুখে বলে, ভাত খেতে এসেছি। সে আসলে আসে কিছুক্ষণ গল্প করার জন্য। ইদানীং মাহফুজ খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। দুপুরবেলা তার হাসি মুখ দেখতে পাই না। মাহফুজ কি জানে, প্রতিদিন দুপুরে আমি মনে মনে তার অপেক্ষা করি।

AMARBOI.COM



বহুব্রীহি ও 'তুই রাজাকার'

১৯৮৮-৮৯ সালের কথা। আমাদের তিতুমীর হলের কমনরুমে এক সন্ধ্যায় মহা গ্যাঞ্জাম শুরু হয়। নাটক দেখার জন্য টিভিরুমে চেয়ার দখল করা নিয়ে এই হইচই-উত্তেজনা। কারণ, বিটিভিতে নতুন একটা ধারাবাহিক নাটকের প্রচার শুরু হয়েছে। নাম *বহুব্রীহি*। এ নাটকের প্রযোজক নওয়াজিশ আলী খান। তিনি অনেকটা জোর করে হুমায়ূন আহমেদকে দিয়ে একটি এক ঘণ্টার নাটক (*প্রথম প্রহর*) লিখিয়েছিলেন ১৯৮৩ সালে। এবার তিনি হুমায়ূন

আহমেদের লেখা ধারাবাহিক নাটক *বহুব্রীহি* প্রযোজনা করছেন। ১৪ দিন পর পর মঙ্গলবার রাত নয়টায় এটি প্রচারিত হয়। পুরা এক ঘণ্টার ধারাবাহিক। শুনলাম *এইসব দিনরাত্রির* চেয়ে এটা বেশ আলাদা। এটা শুধুই হাসির। দ্বিতীয় বা তৃতীয় পর্বের এক মঙ্গলবার তাড়াতাড়ি টিউশনি শেষ করে চলে আসি। বসার জায়গা নেই। এর আগের কোনো পর্বই আমি দেখিনি। নাটকের শুরুতে দেখি টাইটেল দেখানোর সময়ই ছেলেরা হো হো করে হাসতে শুরু করে দেয়। এত হাসির কারণ বুঝতে পারি না। আফজাল শরীফ নামে নতুন অভিনেতাকে দেখলাম। তাকে দেখে আরও বেশি হাসি।

নাটক শেষে কমনরুমের বাইরে আসতেই শুনি, ছেলেরা নাটকের সংলাপ আওড়াচ্ছে। একজন আরেকজনকে বলছে রহিমা খালার সংলাপ: 'আমারে একটা ছবি তুলে দিবেন? বিলিক ইন হুয়াইট।', 'মানুষের সাধ-আহ্লাদ বলে কি কিছু নাই? টেকা-পয়সাই কি জীবনের সব।'

আমি *বহুব্রীহির* নিয়মিত দর্শক হয়ে যাই। নাটকটি বড় বড় অভিনেতা-অভিনেত্রীতে ভরা। কাজের বুয়া আর কাজের ছেলে এই নাটকের বিনোদনের প্রাণ। বৃদ্ধা রহিমার মা, তার সহযোগী সৈয়দ বংশের কাজের ছেলে কাদের। কোনো 'সৈয়দ'কে নিয়ে কি হুমায়ূন আহমেদ খুব বিরক্ত? বারবার 'সৈয়দ' বংশের এই চরিত্র নিয়ে ঠাট্টা-মশকরা হচ্ছে। একবার তাকে চোর বানিয়ে বুকের ওপর 'আমি চোর' লেখা কাগজ ঝুলিয়ে কানে ধরে ওঠবস করিয়ে শায়েস্তা করা হয়। চোর হিসেবে অবশ্য তাকে বেশিক্ষণ রাখা হয় না। একসময় সে ভালো মানুষে রূপান্তরিত হয়।

AMARBOI.COM

আমাদের সবচেয়ে প্রিয় নায়ক আফজাল হোসেনও আছেন এখানে। লুৎফুন নাহার লতার সঙ্গে তাঁর জুটি। হাবাগোবা ডাক্তার, একসময় ঘরজামাই হয়ে আসেন এ বাড়িতে। বেশি দিন তাঁকে আর দেখা গেল না। একসময় তাঁকে বিদেশ পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এরপর আফজাল অবশ্য হুমায়ূন আহমেদের নাটকে অভিনয় করেননি। আফজাল হোসেন চলে যাওয়ার পর নাটকটির কাহিনি অন্য দিকে মোড় নেয়।

বহুব্রীহি শুট করা হয় প্রধানত একটি বাড়িতে। বিটিভির ফ্লোরে সেট পড়েছে। এখানে দু-তিনটা বেডরুম, একটা বড় ড্রয়িংরুম আর খাওয়ার ঘর, এখানেই সব দৃশ্যের আয়োজন। দু-চারটা আউটডোর সিন ছাড়া বাদবাকি সবই ইনডোর। দয়াবান, জনহিতৈষী, অবসরপ্রাপ্ত বিত্তবান সোবহান সাহেবের (আবুল হায়াত) সংসার তাঁর একমাত্র মেয়ে মিলিকে নিয়ে। সেই সংসারে অর্ধপ্রকৃতিস্থ এক মামা থাকেন (আলী যাকের)। তাঁদের জন্য দুজন কাজের লোক। এই বাড়িতে

ওপরতলায় আসাদুজ্জামান নূর তাঁর বাঁদর-প্রকৃতির দুই শিশুসন্তানকে নিয়ে ভাড়া থাকেন। গ্রাম থেকে ইমদাদ খোন্দকার চলে আসেন তাঁর বিবাহযোগ্য কিশোরী নাতনি পুতুলকে (হুমায়ূন আহমেদের বন্ধু ওবায়দুল ইসলামের কন্যা দীপা ইসলাম) নিয়ে। সুতরাং সব চরিত্রের সন্নিবেশ ঘটে একটি বাড়িতে এবং নানা রকম উদ্ভট ও অপ্রকৃতিস্থ ঘটনার জন্ম হতে থাকে একের পর এক। বাংলাদেশ টেলিভিশনে এর আগে কোনো নাটকে এতটা হাসির দৃশ্য কেউ দেখেনি। এ নাটকে দুটি বাচ্চা ছেলেমেয়ের বাঁদরামির দৃশ্য সবাই মজা করে দেখেছি। আমার মনে হয়েছে, এগুলো লেখকের পরিবারের সদস্যদের চরিত্র। এর আগে *এইসব দিনরাত্রি* নাটকের একান্নবর্তী পরিবারের মমতাময়ী ভাবির চরিত্র নিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রীর থেকে, এবার দুই কন্যার চরিত্র এসেছে *বহুব্রীহি*তে। তাঁর আত্মজৈবনিক রচনায় পড়েছি, সিলেটে থাকার সময় তাঁদের বাসায় এক মামা থাকতেন। তিনি কতটা প্রকৃতিস্থ ছিলেন জানি না, কিন্তু তাঁর চরিত্রকে যেভাবে দেখানো হয়েছিল, মনে হলো এই *বহুব্রীহি*র মামাই সেই চরিত্র। কিন্তু খুবই মিস্ট্রিয়াস। তাঁকে পাগল বলছে পরিবারের সবাই, অথচ নিজে পাগলের চিকিৎসক হিসেবে কনসালট্যান্সি করছেন। তাঁর সহকারী মিস এশা (লাকী ইনাম)।

এই অর্ধপ্রকৃতিস্থ মামার মুখ দিয়ে বেশ কিছু চমৎকার সংলাপ বের করে এনেছেন নাট্যকার। তার কয়েকটি হলের ছাত্রদের মুখে মুখে ফিরছে। যেমন,

'কথার মধ্যে কথা বলা আমি একদম পছন্দ করি না, দুলাভাই।'

'আপনি প্রতিভা চিনতে পারলেন না।'

'বেশি কথা বলা আমি পছন্দ করি না।'

'পাবলিকের মুখ তো আর বন্ধ করা যাবে না, দুলাভাই, পাবলিক সত্য কথা বলবেই।'

'খবরের কাগজ পড়া হচ্ছে অলস লোকের কাজ।'

কাজের ছেলে কাদেরের বিলেতপ্রীতি দেখে মামা একবার বিলেত নিয়ে বলেন, 'ফাজিলের দেশ, সব বর্বর...ওরা সভ্যতা শিখল আমাদের থেকে, এখন তারা দাবি করে বড় সভ্য দেশ।'

এ নাটকেই প্রথম বিশেষণ পদকে বিশেষ্য রূপে ব্যবহৃত হতে শুনলাম। সংলাপে 'সুন্দর' হয়ে যায় 'সৌন্দর্য'। যেমন, 'চশমাটা বড়ই সৌন্দর্য।'

কাদের কিছু মজার মজার সংলাপ বলে :

মামা : কাদের।

কাদের : জি স্যার।

মামা : কফি।

কাদের : কামিং স্যার।

'কামিং স্যার' মানে হচ্ছে 'কফি নিয়ে আসছি, স্যার'। হাসতে হাসতে খিল ধরে পেটে। 'কাদের' নামের নিচে চাপা পড়ে যায় 'আফজাল শরীফ'। রাস্তাঘাটে আফজাল শরীফকে দেখলেই লোকজন 'কাদের' 'কাদের' বলে চিৎকার দিয়ে ডাকে।

'হে মাছ' নিয়ে মৎস্য-সমস্যা সমাধানের কৌতুকময় সমাধানের ফিরিস্তি দিয়ে শুরু হয়েছিল এই ধারাবাহিক, দুই পর্ব পরে 'ক্ষুধা'সংক্রান্ত সমস্যা নিয়েও বেশ কিছু বাড়াবাড়ি রকমের কমেডি তৈরি করা হয়। কিন্তু হঠাৎ করে নাটকটি সিরিয়াস হয়ে উঠতে থাকে, যখন মুক্তিযুদ্ধ ও রাজাকারের বিষয়টি চলে আসে।

নাটকটির প্রায় শেষ দুই পর্বজুড়ে থাকে মুক্তিযুদ্ধের কথা। সোবহান সাহেবের বাসায় আশ্রিত বদ লোক ইমদাদ খোন্দকার মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের নিয়ে কটূক্তি করার পর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে পুরো পরিবার। মামা বুদ্ধি বের করেন। টেপ-রেকর্ডারে 'তুই রাজাকার' রেকর্ড করে শোনানো হবে তিনটি টিয়া পাখিকে। সাত দিনের মধ্যে তারা শিখেও ফেলেছে। দুটি পাখি মারা যায়, তৃতীয় টিয়া একসময় বলে ওঠে, 'তুই রাজাকার, তুই রাজাকার'।

১৯৮৮-৮৯ সালের এ সময়টাতে জেনারেল এরশাদ ক্ষমতায়। টেলিভিশনে 'পাকিস্তানি হানাদার' বলা নিষিদ্ধ, শুধু হানাদার বলতে হয়। মুক্তিযুদ্ধের বেশ কয়েকজন সক্রিয় বিরোধিতাকারী—যারা রাজাকার হিসেবেই চিহ্নিত—এরশাদের মন্ত্রিসভার সদস্য। ১৯৭৫-এর পর বাংলাদেশ টেলিভিশন বা রেডিওতে রাজাকার শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি। এই নাটকের মাধ্যমে 'তুই রাজাকার' শব্দদ্বয় বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রথম প্রচারিত হলো। মজার ব্যাপার, রাজাকার শব্দটি ব্যবহৃত হওয়ার পর আমরা আশা করেছিলাম যে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নামও শোনা যাবে। এ নাটকে সে সুযোগও ছিল। সোবহান সাহেবের আবেদনে সাড়া দিয়ে স্বেচ্ছাশ্রমী রেশমা (শান্তা ইসলাম) আসেন। তিনি তাঁর পরিবারের যুদ্ধস্মৃতির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, 'মিলিটারির হাতে ওকে ধরিয়ে দেওয়া হয়।' ওই মিলিটারি যে পাকিস্তানি, সে কথা কিন্তু আর বলা হলো না।

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে হুমায়ূন আহমেদকে অনেক জটিল পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে অতিক্রম করতে হয়েছে। একাত্তরে তাঁর বাবাকে পাকিস্তানিরা ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিল, আবার তাঁর নানা যুদ্ধের পর মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে নিহত হন। দুই পক্ষকেই তিনি দেখেছেন।

বহুব্রীহির শেষ পর্বে মামাকে দেখা যায় ভিন্ন চরিত্রে। তাঁর হাতে বেশ কিছু টাকা আসার ফলে তাঁর চরিত্র থেকে পাগলামি চলে যায়। তিনি সিরিয়াস

AMARBOI.COM

ফিল্মমেকার হয়ে যান। *ও আমার রসিয়া বন্ধু রে* ছবি বাদ দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ছবি বানাতে চান, ছবির নাম দেন *তুই রাজাকার*। এই *তুই রাজাকার* ছবির কয়েকটি দৃশ্যও চলে আসে নাটকের মধ্যে। একটা দৃশ্যে দেখা যায়, কাদের বসে আছে, তার হাত-পা বাঁধা। পাকিস্তানি মিলিটারি তাকে প্রশ্ন করছে—

'তোর নাম কী?'

'সৈয়দ আবদুল কাদের।'

'হুম, তুই মুক্তিবাহিনীর লোক?'

'হ, আমি মুক্তিযোদ্ধা।'

'তুই দেশের দুশমন।'

'হারামজাদায় কয় কী? হালা, তোর মুখে আমি ছেপ দেই। থু...থু...।'

কাদের থুতু ছিটাতে থাকে পাকিস্তানি মিলিটারির মুখের দিকে।

এর পরই হুমায়ূন আহমেদ লিখেছিলেন সিনেমার চিত্রনাট্য—*আগুনের পরশমণি*। সেটা ছিল হুমায়ূন আহমেদ নির্মিত প্রথম চলচ্চিত্র। সেই ছবিতেও বদিউল আলমের এক সহযোদ্ধাকে ঠিক এ রকম একটা দৃশ্যে দেখা গিয়েছিল।

'হে মাছ' দিয়ে শুরু হয়েছিল সোবহান সাহেবের সমাজসেবার চিন্তা। শেষ হয়েছিল অন্যভাবে। খারাপ লোক ইমদাদ খোন্দকার ভালো হয়ে যান। ১৯৮৯ সালের ষোলোই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবসের দিনে তাঁকে নিয়ে দুই বৃদ্ধ বেরিয়ে পড়েন গ্রামের দিকে। দুই হাজার গ্রামের শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা তৈরির কাজ শুরু দিয়ে শেষ হয় *বহুব্রীহি*।

AMARBOI.COM



বাংলাবাজার পত্রিকা ও বিস্মৃত হুমায়ূন

হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ না হলেও তাঁর খবর পাই। ১৯৯২ সালে আমি বুয়েটের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র এবং *বাংলাবাজার পত্রিকা*র স্টাফ রাইটার হিসেবে ফুলটাইম কাজ করি। আমার কাজ মূলত টেলেক্স থেকে সংবাদ বেছে নিয়ে অনুবাদ করে রিপোর্ট বানানো, চিফ রিপোর্টারের হাত হয়ে আসা রিপোর্টারদের নিউজে শিরোনাম বসানো, সম্পাদনা করা।

*বাংলাবাজার পত্রিকা*য় চাকরিটা পাকা হয়ে যাওয়ার পর বাড়ি গিয়ে ছাত্রী

পড়ানোর কাজটা ছেড়ে দিই। এ জীবনে আর কখনো আমার টিউশনি করতে হয়নি। এমনিতে আমার যাতায়াত খরচ নেই, নিজের সাইকেল নিজে চালাই, থাকার খরচ নেই, বুয়েটের হলে থাকি, খাবার খরচ কম—সাবসিডাইজ্‌ড্‌ ফুড, আমার বেশ চলে যায়।

এক বছর চাকরি করেছি *বাংলাবাজার পত্রিকায়*। এই পত্রিকায় কাজ করতে গিয়ে একবার হুমায়ূন আহমেদের নিউজ আসে আমার হাতে। *দরজার ওপাশে* নামের বইতে নাকি তিনি লিখেছেন, 'বাংলাদেশের বিচারকরা বোয়ালমাছের মতো হাঁ করে থাকেন।' সুতরাং আদালত অবমাননা হয়েছে এ লেখায়। *বাংলাবাজার পত্রিকায়* প্রকাশিত হুমায়ূনের একটি সাক্ষাৎকারে লেখাটি নিয়ে কথা হয়। সাক্ষাৎকার ছেপেছিলেন আফজাল রহমান। সুতরাং হুমায়ূন আহমেদ, মতিউর রহমান চৌধুরী এবং আফজাল রহমানকে আসামি করে মামলা হয়। পরে শুনেছি, মামলাটি কোনোভাবে ডিসমিস হয়ে যায়। হুমায়ূন আহমেদকে আদালত পর্যন্ত যেতে হয়নি।

বাংলাবাজার পত্রিকায় কাজ করেন আবুল খায়ের সাহেব। আমার পাশের ডেস্কে বসেন। প্রবীণদের জন্য একটা পাতা বেরোয় সপ্তাহে, তিনি সেই পাতার দায়িত্বে। তাঁর কাছ থেকেও শুনি হুমায়ূন আহমেদের গল্প। ধারাবাহিক *অয়োময়* নাটকে আমিন ডাক্তারের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন।

অয়োময়-এর শুটিংয়ের চেয়েও নাকি রিহার্সেল ছিল বেশি আনন্দের। একেক পর্বের রিহার্সেল হতো একেকজনের বাসায়। রিহার্সেল মানে স্ক্রিপ্ট পড়া আর ভূরিভোজ করা। হুমায়ূন আহমেদ খাদ্যরসিক মানুষ। খায়ের ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর খুব বন্ধুত্ব ছিল না। তবে ইউনিটের সবচেয়ে সিনিয়র এই অভিনেতা এই নাট্যকারের সংলাপ রচনার কৌশলের প্রতি সবচেয়ে বেশি মুগ্ধতা দেখান। একসময় তিনি বলেন, 'ওঁর নাটকে বড় অভিনেতার দরকার নেই, উনি যা লেখেন, ওইটুকু বলে দিতে পারলেই অর্ধেক অভিনয় হয়ে যায়।'

অয়োময়-এর শুটিংয়ের সময় ময়মনসিংহের দু-তিনটা বাড়িতে তাঁরা থাকতেন। রাতে শুটিং হতো না। আড্ডা হতো। এই নাটকের এলাচি-লবঙ্গ নামের নারীচরিত্র কী করে এল, মজা করে বলতেন খায়ের ভাই। বিপাশা হায়াত এ নাটকে শেষের দিকে তিনটা পর্বে উপস্থিত হন। জমিদারের ছোট বউয়ের চরিত্রে। বিপাশা তখন নতুন তারকা হচ্ছেন। তাঁর অভিনয় দর্শকদের নজর কাড়ে। হুমায়ূন আহমেদ তাঁর প্রথম ছবি *আগুনের পরশমণির* জন্য বিপাশাকে নির্বাচন করার পেছনে সম্ভবত *অয়োময়* নাটকে তাঁর ভালো অভিনয়ের বিষয়টি কাজ করেছিল।

AMARBOI.COM

খায়ের ভাই *বাংলাবাজার পত্রিকা* ছেড়ে দেন। ফাইনাল ইয়ারের থিসিস জমা দেওয়ার জন্য ১৯৯৩ সালের জুলাই মাস থেকে আমি তিন মাসের বিনা বেতনে ছুটি নিই। ১৯৯৩ সালের ২২ নভেম্বর, কাকতালীয়ভাবে, আমার জন্মদিনের দিনেই আমার থিসিসের জুরি হলো। কৃতিত্বের সঙ্গেই পাস করলাম। মায়ের কাছে চিঠি লিখলাম, মা, আমার জন্মদিনে তোমাকে একটা উপহার দিচ্ছি। আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা আজ আমাকে একজন স্থপতি হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। আজ বাবার কথা খুব মনে পড়ছে।

পাস করার সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা বড় ঘটনা ঘটল। আমার প্রিয় বন্ধু শওকত এক বছর আগে পাস করে একটা ফার্মে চাকরি করে। রাতের বেলা সে আমার রুমে আসে। বলে, 'চাকরি করা যাবে না, আমি একা পারব না বলে এক বছর তোর জন্য অপেক্ষা করেছি। চল, ফার্ম খুলি।'

আমি শওকতকে বলি, 'তৌকীরকে কী করব? তৌকীর আমার সঙ্গে ফেল করা একজন। তার আহসানউল্লাহ হল ছেড়ে সে আমার রুমেই থাকে।' শওকত বলল, 'সমস্যা নেই।'

AMARBOI.COM

যেহেতু আমরা তিনজন, নাম দিলাম 'ট্রায়াঙ্গেল কনসালট্যান্স'। আমাদের ঠিকানা শওকতের শ্বশুরবাড়ির ছাদ। তাঁর শ্বশুরের ল্যান্ড ফোনটিই আমাদের টেলিফোন। ওটা থাকে ওর শ্বশুরের ঘরে, তেতলায়।

বাংলাবাজার পত্রিকায় আমার আর যোগ দেওয়া হলো না। সাংবাদিক জীবনের ইতি ঘটল। ধানমন্ডি সুবাজারের এক ছাদের চিলেকোঠার ঘরে আমরা তিন আর্কিটেক্ট একজন ড্রাফটসম্যান নিয়ে কাজ শুরু করে দিই। কাজের পেছনে ছুটতে থাকি।

হুমায়ূন আহমেদের স্মৃতিও কিছুকালের জন্য আড়াল হয়ে যায়।



আগুনের পরশমণি : এক চলচ্চিত্রকারের আবির্ভাব

১৯৯২ সালে আমি বুয়েটের ফিফথ ইয়ারে পড়ি। কাগজে দেখলাম, *শঙ্খনীল কারাগার* নিয়ে ছবি বানানো হয়েছে। মুক্তি পেয়েছে বলাকার ছোট ভাই বিনাকা হলে। দেখতে গেলাম। এর আগে *শঙ্খনীল কারাগার* নিয়ে নাটক

দেখেছি আমাদের কলেজ অডিটরিয়ামে, সাদাকালো টিভিতে। ভালো লেগেছিল। কিন্তু এই সিনেমা দেখে আমি একেবারেই হতাশ।

বছর দশক আগে উপন্যাস পড়তে গিয়ে আমি যতটুকু আলোড়িত হয়েছিলাম, ছবিটা তার সিকি ভাগও স্পর্শ করল না আমাকে। কাহিনিতেও দেখি নানা গোঁজামিল। কখনো মনে হয় এটা ৬৮-৬৯ সালের গল্প, কখনো দেখি ১৯৮৯ সালের কাহিনি। সেট ও পোশাকের ক্ষেত্রেও একই রকম গরমিল। উপন্যাসে নেই এমন একটা চরিত্রের আমদানি হলো, যে চরিত্রে জাফর ইকবাল অভিনয় করেছেন। চম্পার চরিত্রটি বেড়ে গেছে অনেকটুকু। রাবেয়ার (ডলি জহুর) মূল সংকট উপন্যাসে ছিল একটা, এখানে দেখি অন্যটা। এই মেয়েটি কালো বলে তার বিয়ে হতো না, অথচ ডলি জহুরকে মোটেও কালো মেয়ে বলে মনে হচ্ছে না। আমার কাছে সবচেয়ে বেখাপ্পা লাগল আসাদুজ্জামান নূরকে বানানো হয়েছে ডলি জহুরের ছোট ভাই। দূর, ছবিটা দেখে মেজাজ খারাপ হয়ে যায়।

অনেক দিন পর শুনি, এ ছবিটার জন্য শ্রেষ্ঠ কাহিনিকার হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন হুমায়ূন আহমেদ। পাবলিক লাইব্রেরি মিলনায়তনে ছবিটার বিষয়ে কী একটা আলোচনা সভাও আছে। অনুষ্ঠানে গেলে হয়তো হুমায়ূন আহমেদকে দেখা যাবে। তাই অনুষ্ঠানে হাজির হই। মঞ্চের ওপর ছবিটির পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান ও একজন মন্ত্রী। হুমায়ূন আহমেদও আছেন।

বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের অর্থে ছবিটি তৈরি। ছবির সংলাপ লিখেছেন স্বয়ং হুমায়ূন আহমেদ। লোকজন ছবিটির ভূয়সী প্রশংসা করল। কাহিনি ও সংলাপ রচয়িতা হিসেবে মঞ্চে বক্তৃতা দিতে এসে হুমায়ূন আহমেদ তাঁর এ কাহিনি নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ করার জন্য সরকারকে খুবই ধন্যবাদ দিলেন। এক ফাঁকে তিনি বললেন, 'অনেকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করে, এ ছবিটির স্ক্রিপ্ট লিখে আমি কত টাকা পেয়েছি। আমি তাদের বিশেষ কিছু বলি না। তবে আজ জানিয়ে দিই যে, আমি এই স্ক্রিপ্টটি লিখে ১০ হাজার টাকা পেয়েছি।'

মন্ত্রী মহোদয় তাঁর বক্তৃতায় বলেন, তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে নির্মিতব্য পরবর্তী ছবিগুলোতে স্ক্রিপ্ট লেখকের সম্মানী দ্বিগুণ করার প্রস্তাব দেওয়া হবে। সামনের সারির একজন দর্শক দাঁড়িয়ে তখনই প্রস্তাব করেন, এই পরিবর্তিত সম্মানীটুকু যেন হুমায়ূন আহমেদের ওপরও প্রযোজ্য হয়।

হুমায়ূন আহমেদ সেদিনের বক্তৃতায় মুক্তিযুদ্ধের কাহিনি নিয়ে নিজেই একটি ছবি করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, চিত্রনাট্য তৈরি আছে, প্রযোজক পেলে নিজেই এ ছবিটি বানাবেন। এরপর পত্রিকায় খবর ছাপা

AMARBOI.COM

হয়—হুমায়ূন আহমেদ সরকারি অনুদান পেয়েছেন এবং তাঁর নিজের লেখা উপন্যাস অবলম্বনে ছবি করবেন *আগুনের পরশমণি*।

১৯৯৪ সাল হুমায়ূন আহমেদের জন্য একটি বিশেষ বছরও। এ বছর তিনি 'একুশে পদক'-এ ভূষিত হন। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কাছ থেকে তিনি পদক গ্রহণ করেন। তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা ছবি তৈরির জন্য ২৫ লাখ টাকার অনুদান মঞ্জুর করেন।

হুমায়ূন আহমেদ যেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি পেলেন, সেদিনই সিদ্ধান্ত নিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি আর করবেন না। তিনি ছবি বানাবেন। এ নিয়ে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গেও খটোমটো শুরু হয়। তাঁর লেখায় পড়েছি, স্ত্রী গুলতেকিন আহমেদ কখনোই চাননি তিনি ফিল্মমেকার হন।

> গুলতেকিন বললো, তুমি যখন পিএইচডি করেছিলে তখন আমি কি করেছি? নিজে পড়াশোনা বাদ দিয়ে তোমার পড়াশোনা যাতে ঠিকমতো হয় সেদিকে লক্ষ করেছি। তখন তুমি কথা দিয়েছিলে আমি যখন পড়াশোনা শুরু করব তখন তুমি আমার পড়াশোনায় সাহায্য করবে। আমি পড়াশোনা শুরু করেছি। আমার অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা। বাচ্চাদের নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকি। এর মধ্যে বাজার করতে হয়, মেহমানদারি করতে হয়, পরীক্ষার পড়া করতে হয়। কোথায় গেল তোমার প্রতিজ্ঞা? তুমি শুরু করলে তোমার ছবি। এই ছবি বানানোর কাজটা কি আর কিছুদিন পরে করলে হত না? অবশ্যই হত। তুমি করবে না। কারণ, তোমার কাছে আমি বা আমার সংসার কিছু না। তোমার জগৎ তোমার কাজকর্ম ঘিরে। এর বাইরে কোনদিন কিছু ছিল না, হবেও না। আজ তোমার ছবির মহরত। খুব আনন্দের কথা। তুমি তোমার একজীবনে যা করতে চেয়েছ করতে পেরেছ। আমি জানি ছবিটাও তুমি ভালো বানাবে। সেই ছবি অনেকগুলি জাতীয় পুরস্কার পাবে। তুমি জেনে রাখো সেই পুরস্কারের সঙ্গে আমার কোনো যোগ নাই। আজ তোমার মহরত অনুষ্ঠানে আমি যাব না। দয়া করে আমাকে সেটে নেবার চেষ্টা করবে না। (ছবি বানানো গল্প—হুমায়ূন আহমেদ)

কিন্তু এই খেয়ালি মানুষটিকে কে আটকাতে পারে! নিজে শুধু ছবি তৈরিতেই গেলেন না, তার কিশোরী কন্যা শীলা আহমেদও যোগ দিল তাঁর দলে। রাত্রির (বিপাশা) ছোট বোন অপলার চরিত্রে অভিনয়ও করল। ছবি বানানো শেষ, এবার মুক্তির পালা। ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বর মাসের কোনো এক দিন। ধানমন্ডির সাতমসজিদ রোডের গণগ্রন্থাগার লাইব্রেরিতে এ ছবির প্রেস শো হলো। ছবিটি দেখলাম।

AMARBOI.COM

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সাদাকালো যুগের কিছু ছবি দেখেছিলাম। এ ছবিটা অনেক ভিন্ন। এখানে আবেগের বিষয়টি অনেক বেশি। মুক্তিযুদ্ধ তো আছেই, আছে জ্যোৎস্না আর বৃষ্টির গল্পও। ভালোবাসার গল্প।

এ ছবিতে হুমায়ূনের *বহুব্রীহি* নাটক-দলের আবুল হায়াত, আসাদুজ্জামান নূর ছাড়া বাদবাকি সব শিল্পী নতুন। উল্লেখযোগ্য সংযোজন—হোসনে আরা পুতুল। দুর্দান্ত অভিনয় করলেন বিপাশা হায়াত।

ছবি প্রদর্শনের পর লেখক মাইক্রোফোন হাতে নিলেন। আমার সামনে এই প্রথম উপস্থিত হলেন চলচ্চিত্রকার হুমায়ূন আহমেদ। উপন্যাস পড়েছি, নাটক দেখেছি, এবার তাঁর বানানো সিনেমাটি দেখলাম। মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে প্রথমেই তিনি তাঁর স্ক্রিপ্ট নিয়ে ইতিপূর্বে বানানো *শঙ্খনীল কারাগার*-এর নির্মাণের বদনাম করলেন। বললেন অন্যভাবে, 'লোকে বলে বড় পর্দায় নাটক দেখলাম, সিনেমা কোথায়?' এ জন্য তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন নিজেই এবার সিনেমা বানাবেন। এই সিনেমার শেষে কতগুলো পাখি উড়ে যাওয়ার একটা দৃশ্য আছে। এটাই ছিল তার প্রথম নেওয়া শট। ছবির ফান্ড জোগাড় হওয়ার আগেই এফডিসি থেকে ক্যামেরা, ফিল্ম ও একজন ক্যামেরাম্যান নিয়ে ঢাকা চিড়িয়াখানার পাশের একটা জায়গায় এ দৃশ্যের শুটিং করেন এক ভোরে।

হুমায়ূন আহমেদের কথা বলার ভঙ্গিটা দারুণ। গলার স্বর মোটেও ভালো না, কথার মধ্যে ময়মনসিংহের আঞ্চলিক ভাষার টান আছে। তার পরও একধরনের মাদকতা মাখানো তাঁর শব্দচয়ন। মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না।

এ ছবির কোনো এক জায়গায় কয়েক সেকেন্ড ধরে একটা শট কাঁপছে। এ কাঁপাকাঁপি নিয়ে তাঁর অনেক দুঃখ, খেদ। বললেন, ইচ্ছা ছিল, পুরো দৃশ্যটি রি-শুট করার, অর্থাভাবে করতে পারেননি।

এ ছবির নাম এসেছে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে। গানও এসেছে রবীন্দ্রনাথের। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আমাদের সিলেটি সাধক হাসন রাজার গান। খুবই ভালো লাগল।

প্রশ্নোত্তরের পালা এল। আমার ইচ্ছা ছিল একটা প্রশ্ন করার। এ প্রশ্নটা করলেই তিনি আটকে যেতেন। প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে আক্ষরিক অর্থেই কাকভেজা হয়ে বদিউল আলম (আসাদুজ্জামান নূর) রাত্রিদের (বিপাশা) বাড়িতে এসে ওঠে। তার সমস্ত জামাকাপড়, শরীর ভিজে জবুথবু। এর মধ্যেই পকেট থেকে সিগারেটের আস্ত একটা শুকনো প্যাকেট কী করে বেরোয়?

কিন্তু আমার মন ভিজে আছে ছবিটির শেষ দৃশ্য দেখার পর। শেষ দৃশ্যটি বড় করুণ। দেশ প্রায় স্বাধীন হয়ে যাচ্ছে। অথচ বদি গুলি খেয়ে মারাত্মক আহত।

AMARBOI.COM

যেকোনো সময় মারা যেতে পারে। খুব ভোরবেলা তার ঘরে এসে ঢোকে রাত্রি। বদিকে ঘিরে রেখেছে রাত্রির বাবা-মা-বোনসহ পরিবারের লোকজন। বদির কাছে এসে রাত্রি বলে, 'আপনাকে চোখ বন্ধ করতে হবে না, আপনাকে ভোর দেখতে হবে।' কিন্তু বদি তখন অন্য ভুবনে। কোনোভাবেই সাড়া দিচ্ছে না রাত্রির আহ্বানে। রাত্রি বলে, 'এমন সুন্দর সকাল আপনি দেখবেন না? একদিন দেশ স্বাধীন হবে, আমি হারমোনিয়াম বাজাতে বাজাতে রাস্তায় নাচব। আপনি আমার সঙ্গে থাকবেন না? এত সুন্দর আলো, আপনি ছুঁয়ে দেখবেন না?'

বদির নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যায়। বদি ভোর দেখতে পারে না। পুবের জানালা দিয়ে স্বাধীন দেশের সূর্যের আলো আগুনের পরশমণির মতো এসে লাগে বদির কপালে। রাত্রি মৃত বদির হাত বাড়িয়ে দেয় দিনের নরম আলোর দিকে। গান বেজে ওঠে, 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে'।

এ দৃশ্য দেখার পর এ ছবির আর কোনো খুঁত নিয়ে আলাপ করতে ইচ্ছা করে না।

AMARBOI.COM

টইটুম্বুর ও হুমায়ূন-জননী

১৯৯৬ সালের অক্টোবর মাস। থাকি শ্যামলীর ভাড়াবাড়িতে, লালমাটিয়ায় আমাদের তিন বন্ধুর আর্কিটেকচারাল কনসালট্যান্সি অফিস। নানা রকমের কাজ করি। সাংবাদিকতা বাদ পড়েছে, ছবি তোলাও হয় না। এ বছর আমি একটা গাড়ি কিনে ফেলেছি ৩ লাখ ২০ হাজার টাকা দিয়ে। ২ লাখ নিজে দিয়েছি, বাকিটা ব্যাংক থেকে ধার নেওয়া। গাড়ির বুটে আমার ক্যামেরার ব্যাগ থাকে। হঠাৎ যদি মজার কিছু পেয়ে যাই, এই আশায়।

একদিন কবিতা ফোন করল, 'ভাইয়া, আমাদের সঙ্গে একটু যাবেন? আমরা হুমায়ূন আহমেদের আম্মার ছবি তুলব, আপনার হাতের তোলা ছবি চাই।'

কবিতা আমার অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধুর ছোট বোন, তার ওপর হুমায়ূন আহমেদ, আমার না করার সুযোগ থাকে না। *টইটুম্বুর* সম্পাদক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, মা দিবসের একটা বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হবে নভেম্বর মাসে। সেখানে কয়েকজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধার মায়ের সাক্ষাৎকার যাবে।

হুমায়ূন আহমেদের মা মুক্তিযুদ্ধে সন্তান হারাননি, হারিয়েছেন স্বামী। শুধু এ কারণেই তাঁর সাক্ষাৎকার নেওয়া যেত, কিন্তু এর সঙ্গে যোগ হয়েছিল আরেকটি বিষয়। কিছুদিন আগে রত্ন-প্রসবিনী এই মা 'রত্নগর্ভা' পদকে ভূষিত হয়েছেন। তিনি হুমায়ূন আহমেদ, মুহম্মদ জাফর ইকবাল ও আহসান হাবীবের মতো তিন গুণী ছেলের জন্ম দিয়েছেন। সুতরাং তাঁর একটা ইন্টারভিউ করবে *টইটুম্বুর*-এর নির্বাহী সম্পাদক কবিতা।

টইটুম্বুর-এর মাইক্রোবাস ভর্তি করে পত্রিকা-পরিবারের প্রায় সবাই এসে হাজির। হাজির হই আহসান হাবীবের বাসায়, মিরপুরের পল্লবীতে। আমার কাজ কিছু ছবি তোলা কিন্তু মূল উদ্দেশ্য হুমায়ূন আহমেদের মাকে আরেকবার দেখা। এর আগে, ১৯৮৬ সালে আজিমপুর গোরস্তানের উত্তর পাশের নিউ পল্টন লাইনের বাসায় যখন আমি হুমায়ূন আহমেদের সাক্ষাৎকার নিতে যাই, তখনই তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়। এর মধ্যে সময় পেরিয়েছে ১০ বছর। এই ১০ বছরে হুমায়ূন আহমেদ ও তাঁর মায়ের অনেক পরিবর্তনও হয়েছে। শুনেছি, হুমায়ূন আহমেদ বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি ছেড়ে দিলেন ছবি বানানোর অছিলায়। এর মধ্যে তাঁর টাকাপয়সা হয়েছে অনেক। ধানমন্ডির ১০-এর এ-তে পাঁচ কাঠার একটি প্লট কিনে ছয়তলা বাড়ি বানিয়েছেন। মা বেশির ভাগ সময় ছোট ছেলে আহসান হাবীবের এই বাসায় থাকেন। সুতরাং যদিও এখানে তাঁর মায়ের সঙ্গে আবার দেখা হলো, হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে দেখা না হওয়ার কষ্টটা থেকেই যায়।

AMARBOI.COM

আমি বসে পড়ি এক কোনায় টুল নিয়ে। হুমায়ূন আহমেদের মা আয়শা আক্তার খানমকে ঘিরে ধরেছে *টইটুম্বুর* পরিবারের সাংবাদিকদল। আমার কাজ শুধু ছবি তোলা। আমি বসে বসে তাঁদের কথাবার্তা শুনি।

'বিখ্যাত ব্যক্তির মা হওয়ার অনুভূতি কেমন?'

'এটা তো অবশ্যই আনন্দের ও ভাগ্যের কথা, যা আল্লাহ আমাকে দেখিয়েছেন। এটা বুঝিয়ে বলার মতো না।'

'আপনার প্রিয় লেখক কে?'

'হুমায়ূন আহমেদ ও মুহম্মদ জাফর ইকবাল।'

এরপর কথা শুরু হয় তাঁর আমেরিকা ভ্রমণ প্রসঙ্গে। তাঁর মেজো ছেলে ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল সপরিবারে আমেরিকায় থাকেন। তাঁর কাছে বেড়াতে গিয়েছিলেন, চার মাস থেকেও এসেছেন। এই চার মাসে তিনি একটা বিশাল বিষয়ে পারদর্শী হয়ে এসেছেন। তিনি এখন কম্পিউটারে বাংলা লেখা টাইপ করতে পারেন।

আমেরিকা সফর নিয়ে অনেক কথা হয় তাঁর সঙ্গে। তিনি বলেন, 'দেখেছি অনেক কিছু, বড় বড় দালান, বড় বড় রাস্তা। মানুষ কম। কিছুই আমার তেমন ভালো লাগেনি। আমাদের দেশই ভালো। এখানে নিজের মানুষ আছে।' তিনি বলেন, 'আমি আমেরিকা গিয়ে কিছু বাঙালি দেখেছি, যারা ওখানে থেকে এ দেশের নিন্দা করে। এটা আমার সবচেয়ে অপছন্দ ছিল।'

আবার বলেন, 'কে বলেছে আমেরিকা স্বর্গ? আমার ছেলেদের কাছে আমেরিকা যেমন ভালো লেগেছে, আমার কাছে তেমন লাগেনি। আমাদের দেশ থেকে যদি ভালো ছেলেরা বিদেশ পাড়ি দেয়, তাহলে দেশ ভালো হবে কীভাবে?'

বাহ্! শহীদজায়া আয়শা আক্তার খানমের ছেলেরাও কিন্তু আসলে আমেরিকাপ্রেমী ছিলেন না। তাঁদের দুজনই আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে দেশেই ফিরে এসেছেন। আমেরিকায় থেকে যাওয়ার সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা তাঁদের ছিল, কিন্তু তাঁরা থাকেননি।

আয়শা আক্তার যে কথাটা সেদিন বলেননি, তা ছিল, তিনি আমেরিকায় ছেলে জাফর ইকবালের কাছ থেকে কম্পিউটার কম্পোজ শেখার পর তাঁর আত্মজীবনী লেখা শুরু করেন। অনেক পরে সেটি পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়। তখন অবশ্য লেখকদের মতো তাঁর নামও কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হয়ে যায়। আয়শা আক্তার খানম তাঁর স্বামী শহীদ ফয়জুর রহমানের নামের প্রথম অংশ নিয়ে নাম রাখলেন আয়শা ফয়েজ।

আলাপের মাঝখানে আড্ডায় যোগ দেন আহসান হাবীব। তাঁর সঙ্গে সেই আজিমপুরের বাড়িতে আমার প্রথম দেখা, এরপর বেশ কবার আমাদের দেখা হয়েছে। একবার *সচিত্র বাংলাদেশ* পত্রিকায় 'তারুণ্য' বিভাগের জন্য তরুণ প্রতিভাবানদের সাক্ষাৎকার প্রয়োজন হয়েছিল। আহসান হাবীবের এক পৃষ্ঠা সাক্ষাৎকার ছাপিয়েছিলাম। তিনি সেটাও মনে রেখেছেন।

AMARBOI.COM

আহসান হাবীবের এই বাসায় দেখা হয় তাঁর প্রতিবন্ধী বোনটির সঙ্গেও। ১৯৮৬ সালে ওঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল হুমায়ূন আহমেদের বাসায়। ছবি আঁকতেন। ওঁর সঙ্গে দেখাই শুধু হয়, কথা হওয়ার সুযোগ ছিল না। এখনো নেই।

এখানে তাঁকে দেখে খুবই ভালো লাগল। ওঁর বিয়ে হয়েছে। স্বামীও বোবা। দুজনই কথা বলতে পারেন না, অথচ দুজন দুজনকে চমৎকার বোঝেন। তাঁরা আমাদের সামনেই নানা রকম সাংকেতিক ভাষায় ভাব বিনিময় করেন। ওঁর কোলে এক ফুটফুটে শিশু। বোবা বাবা-মায়ের সন্তান কিন্তু খুবই চটপটে। কী সুন্দর কথা বলে!

হুমায়ূন আহমেদ ছিলেন মা অন্তঃপ্রাণ। দ্বিতীয় দফায় চিকিৎসার আগে দেশে আসার জন্য তিনি চারটে কারণ দেখিয়েছিলেন। দ্বিতীয়টি ছিল, মায়ের সঙ্গে দেখা করা। যে ২০ দিন তিনি দখিন হাওয়া ও নুহাশ পল্লীতে ছিলেন, সব কদিনই মা ছিলেন তাঁর সঙ্গে। ছেলের সুস্থাবস্থায়ও দীর্ঘদিন তিনি ছেলের সঙ্গে থাকতেন দখিন হওয়ার বাড়িতে। যদিও তাঁর প্রায় স্থায়ী ঠিকানা ছিল আহসান হাবীবের বাসা। তাঁদের বোনেরাও ঢাকায় এলে আহসান হাবীবের বাড়িতেই উঠতেন। মুহম্মদ জাফর ইকবাল প্রায় স্থায়ীভাবে সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকার কারণে তাঁদের সঙ্গে থাকা হতো কম।

হুমায়ূন আহমেদের আত্মজৈবনিক লেখায় পড়েছি, স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে তাঁর বাবা শহীদ হওয়ার পর থাকার জায়গা নিয়ে তাঁদের অনেক কঠিন সময় কেটেছিল। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই ঢাকার পল্টনে আসবাবপত্রহীন এক ভাড়াবাড়িতে শুরু হয়েছিল তাঁদের রাজধানীর জীবন। নিজের বাড়িতে সেলাই মেশিন বসিয়ে মানুষের জামাকাপড় সেলাই করতেন মা আয়শা আক্তার। সে রোজগারের টাকায় তাঁদের সংসার চলত। এরপর ঢাকায় মোহাম্মদপুরের বাবর রোডে শহীদ পরিবারের জন্য একটা বাড়ি দেওয়া হয়েছিল তাঁদের। ১৯৭৩ সালে, হুমায়ূন আহমেদের প্রথম বিয়ের পরদিনই, ওই বাড়ি থেকে তাঁদের বের করে দেওয়া হয়। আজ তাঁর সন্তানদের আর্থসামাজিক পরিবর্তন হয়েছে অনেক। এ পরিবর্তনের কোনো কিছুই স্পর্শ করে না তাঁকে। তিনি যেমন ছিলেন তেমনিই আছেন কয়েকজন সন্তানের গর্বিত মা হিসেবে।

AMARBOI.COM



ভাটির পুরুষ ও কিছু মুগ্ধতার গল্প

২০০৩ সালের অক্টোবর মাস। সুনামগঞ্জের দিরাই থানার ধল গ্রামে শাহ আবদুল করিমকে নিয়ে *ভাটির পুরুষ* নামে একটা প্রামাণ্যচিত্রের দ্বিতীয় দফার শুটিং করে এসেছি। করিম সাহেব হুমায়ূন আহমেদের খুব প্রশংসা করলেন। কিন্তু তাঁর ছেলে শাহ নুর জালাল হুমায়ূন আহমেদের ওপর খুব নাখোশ। বললেন, বিদায়ের সময় 'ড্রাইভার'কে দিয়ে কিছু টাকা দিয়েছিলেন, তিনি

নিজে একবার বাবার সঙ্গে দেখাও করলেন না। তাঁর ছেলে আমাকে একটা লিটল ম্যাগাজিন দিয়েছেন, যেখানে তাঁর বাবা শাহ আবদুল করিমের একটা সাক্ষাৎকার ছিল। সেই সাক্ষাৎকারে শাহ আবদুল করিমের বরাত দিয়ে হুমায়ূন আহমেদের অনেক বদনাম লেখা।

আমি ঢাকায় এসে ঠিক করি, হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে যে করেই হোক দেখা করে বিষয়টা জেনে নিতে হবে।

গায়ক সেলিম চৌধুরীর কাছ থেকে নম্বর নিয়ে আমি ফোন করি একটা ল্যান্ডফোনে। সব শুনে তিনি আমাকে দেখা করার অনুমতি দেন। এক ঘণ্টার মধ্যে আমি তাঁর সামনে হাজির হই। ধানমন্ডির দখিন হাওয়ার ছয়তলার একটা ফ্ল্যাটের প্রায় সব কামরাই ফাঁকা। রান্নাঘরের সঙ্গে লাগানো গেস্টরুম থেকে এক তরুণ বেরিয়ে এলেন। তাঁর নাম স্বাধীন খসরু। এর আগে স্বাধীন খসরুর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল লন্ডনে, ২০০১ সালে।

ধানমন্ডি ৩/এ-তে দখিন হাওয়ার ছয়তলার ফ্ল্যাটের যে কামরায় হুমায়ূন আহমেদের সাক্ষাৎকার নিতে বসি, সেখানে সে অর্থে কোনো আসবাবই নেই। একটা তোশকের এক পাশে মহাজনি একটা ডেস্ক। বোঝার বাকি থাকে না, এটা লেখার ডেস্ক। তিনি লুঙ্গি পরে খালি গায়ে বসে বসে লেখেন এই ডেস্কে, লিখতে লিখতে ক্লান্ত হলে শরীর এলিয়ে দেওয়ার জন্য প্রমাণ সাইজের তোশক আছে পেছনে। তার পেছনে একটা অসমাপ্ত পেইন্টিং। লেখকের এই একান্ত নিজস্ব আঙিনা আমাকে মুগ্ধ করে।

আরেকটি ঘর দেখে মনে হয়, একটা লাইব্রেরি। ছাদ থেকে দেয়াল পর্যন্ত টানা বুকশেলফ। মাঝখানের জায়গায় কতগুলো ইজেল দাঁড় করানো। ইজেলে ছবি আঁকা হয়েছে। অয়েল পেইন্টিং। কয়েকটা শেষ পর্যায়ে, কয়েকটা অর্ধেক, কিছু ইজেল সাদা, পেনসিলের দাগ। এলোমেলো পড়ে আছে রং-তুলির প্লেট। আমার ক্যামেরা প্যান করে পুরো ঘর। এক জায়গায় এসে স্থির হয় হুমায়ূন আহমেদের ওপর এবং তিনি খালি গা ঢাকার জন্য একটা কুঁচকানো হাফ শার্ট গায়ে দিয়ে তৈরি হয়ে যান আমার প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য।

শুটিং শুরু করব। ক্যামেরা তাক করে আছি। হুমায়ূন আহমেদ বলেন, 'তোমার ক্যামেরাম্যান কোথায়?'

বলি, 'স্যার, আমিই ক্যামেরাম্যান।'

'ডিরেক্টর কে?'

'স্যার, আমিই।'

'ও, ড্রাইভার কাম কন্ডাকটর! বিদেশে এখন কিছু বাস আছে। এসব বাসে

AMARBOI.COM

যিনি গাড়ি চালান, তিনিই টিকিট চেক করেন। ড্রাইভার কাম কন্ডাকটর। তুমিও তা-ই দেখছি! ঠিক আছে, চলো শুরু করি। প্রথম প্রশ্ন কী তোমার?'

কী করে আবদুল করিমকে প্রথম জানলেন, এটাই ছিল আমার প্রথম প্রশ্ন। হুমায়ূন আহমেদ নড়েচড়ে বসেন। শুরু হয় ক্যামেরার সামনে আমাদের কথাবার্তা।

হুমায়ূন আহমেদ শাহ আবদুল করিমের নাম শুনেছিলেন ১৯৯৪ সালে। তিনি সুনামগঞ্জে গেছেন হাসন উৎসবে। তিন দিনের উৎসবের এক সন্ধ্যায় হুমায়ূন আহমেদ ছিলেন বিশেষ অতিথি। সেলিম চৌধুরী তাঁকে ঢাকা থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। হুমায়ূন আহমেদ উৎসবে হাসন রাজার গানের পাশাপাশি স্থানীয় কিছু বাউলের গানও শোনেন। একটা গান ছিল 'আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম'। সেলিম চৌধুরী গানটি গেয়ে শোনালেন। এ গান শুনেই হুমায়ূন আহমেদের মনে প্রশ্ন জাগে, যিনি এ গান লিখেছেন, তিনি কে, কোথায় থাকেন, বাড়ি কত দূর। সেলিম চৌধুরী জানান, এই লোকের নাম আবদুল করিম, বাড়ি সুনামগঞ্জের দিরাই থানার উজানধল গ্রামে এবং তিনি এখনো বেঁচে আছেন। বয়স প্রায় ৮০ বছর।

অনুষ্ঠানে একসময় আবদুল করিম উপস্থিত হলে সেলিম চৌধুরী পরিচয় করিয়ে দেন আবদুল করিমের সঙ্গে। হুমায়ূন আহমেদ দেখলেন, লোকটার যথেষ্ট বয়স হয়েছে। তাঁর ইচ্ছা হলো এই লোকটার কিছু কথা তিনি রেকর্ড করে রাখবেন। তাই শাহ আবদুল করিমকে ঢাকায় আনার ব্যবস্থা করেন তিনি।

১৯৯৭ সালের ২৭ এপ্রিল আয়োজন হলো শুটিংয়ের। নুহাশ চলচ্চিত্রের ম্যানেজার মিনহাজুর রহমান। কমলাপুরের আল-ফারুক হোটেল থেকে সকালবেলা তাঁকে নিয়ে আসা হয় হুমায়ূন আহমেদের ধানমন্ডির বাসায় (রোড ১০/এ)। বাড়ির লাইব্রেরি রুমেই তাঁকে বসানো হলো। সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য ডাকা হলো আরেক প্রবীণ অভিনেতা আবুল খায়েরকে। শাহ আবদুল করিমকে নিয়ে খানাপিনা-সংক্রান্ত অনেক মজার কথা বললেন হুমায়ূন আহমেদ। বললেন, 'এই গুণী মানুষটিকে আমার সাধ্যমতো সম্মান দেখানোর চেষ্টা করেছি আমি।'

সে সময় 'জলসা ঘর' নামে একটা সংগীতবিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচারিত হতো। যৌথভাবে উপস্থাপনা করতেন আসাদুজ্জামান নূর আর হুমায়ূনকন্যা শীলা আহমেদ। হাসন রাজার গান দিয়ে এর যাত্রা শুরু হয়। সে অনুষ্ঠানের জন্য হুমায়ূন আহমেদ শাহ আবদুল করিমের পাঁচটি গান রেকর্ড করেন। সুবীর নন্দী, দিলরুবা খান, সেলিম চৌধুরী, বেবী নাজনীন আর ফজলুর কবীর তুহীনকে দিয়ে মকসুদ জামিল মিন্টুর সংগীত পরিচালনায় গানগুলো রেকর্ড করা হয়।

AMARBOI.COM

এবার শুরু হবে চিত্রায়ণের পালা। গানগুলোর মিউজিক ভিডিও হবে।

মিনহাজুর রহমানের ওপর দায়িত্ব পড়ল শুটিংয়ের আয়োজন করার। পরিচালক হিসেবে কাজ করলেন মনির হোসেন জীবন। গাজীপুরের কাশিমবাড়ি ও অন্যান্য অঞ্চলে ঘুরে এ পাঁচটি গানের দৃশ্যায়ন হলো। একটি গানের দৃশ্যায়নে অংশ নিলেন হুমায়ূন আহমেদের কিশোরী কন্যা বিপাশা আহমেদ।

১৯৯৭ সালেই বাংলাদেশ টেলিভিশনের 'জলসা ঘর' অনুষ্ঠানে শাহ আবদুল করিমকেও দেখা গেল। শাহ আবদুল করিম একুশে পদক পেয়েছিলেন। 'এ সংবাদ শুনে কী মনে হয়েছিল আপনার?' প্রশ্ন করি হুমায়ূন আহমেদকে।

হুমায়ূন আহমেদ বলেছিলেন, '২০০১ সালে শাহ আবদুল করিম যখন এই পুরস্কার পান, তখন মনে হয়েছিল, একুশে পদকটি একটি যোগ্য লোকের কাছে গেল।' এই স্বশিক্ষিত গীতিকবির গান সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'এই লোকটি প্রাচীন এবং বর্তমান সময়ের মিশ্রণ। তাঁর গানের যে সুর তা খুবই বৈচিত্র্যময়।'

আমার *ভাটির পুরুষ* প্রামাণ্যচিত্রটিতে শাহ আবদুল করিমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেক লোকেরই সাক্ষাৎকার যাবে। এক-দুই মিনিটের বেশি কারও ক্লিপিং ব্যবহারের সুযোগ নেই। আমি আর বেশি কথা বলি না। ক্যামেরা বন্ধ করে দিই।

হুমায়ূন আহমেদের ড্রয়িংরুমে বেশ বড় আকারের একটা টেলিভিশন। তার সঙ্গে ডিভিডি প্লেয়ার লাগানো আছে। তিনি সামান্য খোঁজাখুঁজি করে একটা ডিভিডি হাতে নিয়ে প্লেয়ারে ঢুকিয়ে দেন। এটা দেখতে দেখতে আরেকটা মজার তথ্য পেয়ে যাই।

এ গানগুলো নিয়ে হুমায়ূন আহমেদ প্যাকেজ অনুষ্ঠান 'জলসা ঘর' বিটিভিতে জমা দিয়ে বেশ বিড়ম্বনায় পড়ে যান। যে গীতিকারের লেখা গানগুলো নিয়ে অনুষ্ঠান তৈরি, তিনি বিটিভির তালিকাভুক্ত গীতিকার নন। সুতরাং বিটিভি তাঁর গান প্রচার করতে পারবে না। এ সময় বিটিভির জেনারেল ম্যানেজার ছিলেন বরকত উল্লাহ। তাঁর পরামর্শে শাহ আবদুল করিমকে প্রথমে বিটিভির তালিকাভুক্ত গীতিকার করা হয়। তারপর অনুষ্ঠানটি প্রচারের অনুমতি পায়। সেটা ১৯৯৭ সাল।

আমার কাজ শেষ, তাই চলে আসার জন্য অনুমতি চাই। লক্ষ করি, স্যারের মনটা আজ খুব ফুরফুরে। তিনি আমাকে এঘর-ওঘর দেখান, আঁকা ছবিগুলো নিয়ে কথা বলেন। এতটা অবসরে তাঁকে পাব বুঝতে পারিনি। ১৯৮৮-৮৯-এর প্রায় ১৫-১৬ বছর পর তাঁর সঙ্গে আমার তৃতীয় দফায় নতুন করে দেখা। তাঁর আঁকা তৈলচিত্রগুলো দেখার সুযোগ হয়। রবীন্দ্রনাথ শেষ বয়সে ছবি আঁকা শুরু করেছেন। আমি মুগ্ধ হয়ে হুমায়ূন আহমেদের আঁকা ছবিগুলো দেখি।

AMARBOI.COM

একটা ড্রয়ার খুলে তিনি কতগুলো পাথর বের করেন। মার্বেলের মতোই পাথর, কিন্তু আকার ও আয়তনে বিশাল। আমি এত বিশাল মার্বেল কখনো দেখিনি। তিনি একটি একটি করে বের করেন। আমাকে হাতের মধ্যে ধরে রাখতে বলেন। কোনোটি আমি এক হাতে ধরি, কোনোটি ধরতে দুই হাত ব্যবহার করতে হয়। আমাকে জিজ্ঞেস করেন, 'বলো তো, এক-একটা পাথরের দাম কত?'

আমি বলতে পারি না। আমার কোনো ধারণাই নেই। তিনি আমাকে দাম শোনান। দাম শুনে আমি বিচলিত হয়ে পড়ি। পাঁচ-ছয় হাজার থেকে শুরু করে দশ-বারো হাজার ডলার খরচ করে এ রকম গোলক মানুষ কেন কিনবে আমি বুঝতে পারি না! আমি জিজ্ঞেস করি, 'স্যার, এত দাম দিয়ে এসব পাথর কেন কিনেছেন?'

তিনি অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর বলেন, 'আমি মানুষের মুগ্ধতা দেখে আনন্দ পাই। তুমি মুগ্ধ হওনি?'

'জি স্যার, হয়েছি।'

'তোমার মুগ্ধতার কাছে এর মূল্য অনেক কম। মানুষকে মুগ্ধ করা আমার আরেকটা কাজ। আসো, তোমাকে এবার আরেকটা জিনিস দেব, এটা তুমি নিয়ে যাবে।'

AMARBOI.COM

আমার হাতে একটা ভিএইচএস ক্যাসেট ধরিয়ে দিয়ে বলেন, 'নাও, এটা তোমার, নিয়ে যাও।'

আমি তাকিয়ে দেখি—ক্যাসেটের গায়ে আমারই হাতে লেখা একটা নাটকের নাম, *লন্ডনী কইন্যা*। এবার আমার সত্যি সত্যি মুগ্ধ হবার পালা।

তাৎক্ষণিকভাবে আমি হিসাবটা মিলিয়ে নিই। এটা নিশ্চয়ই গায়ক সেলিম চৌধুরী স্যারকে দিয়েছেন। ১৯৯৯ সালে এই *লন্ডনী কইন্যা* নাটকটি প্রচারের পর আমি বড় ধরনের ঝামেলায় পড়ে যাই। সিলেটের কিছু লোক সভা-সমিতি-মিছিল করে আমাকে সিলেটে 'অবাঞ্ছিত' ঘোষণা করে। আমাকে উদ্ধার করার জন্য নাট্যকার মামুনুর রশীদ দেশের ২১ জন বড় নাট্যকারের সইসহ এক যুক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রচারের ব্যবস্থা করেন। সে সময় এটা নিয়ে আমার হুমায়ূন আহমেদের কাছে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শুনি, তাঁর হার্ট অ্যাটাক হয়েছে, তিনি সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে। আমার যাওয়া হয়নি। সেলিম চৌধুরী একদিন বললেন, 'আপনি আমাকে *লন্ডনী কইন্যার* একটা ভালো প্রিন্ট ভিএইচএসে করে দেন। একজন বিশিষ্ট লোক আপনার নাটকটি দেখতে চেয়েছেন।'

আমি ইমপ্রেসে গিয়ে বেটা থেকে কপি করে আনি এবং ওপরে নিজ হাতে লিখে দিই নাটক, নাট্যকার ও পরিচালকের নাম। আজ সেই ক্যাসেটটি দেখে

আফসোস হলো। যদি সেদিন আমি নিজে এসে তাঁকে দিতে পারতাম, কত আগেই না তাঁর সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গ পর্বের যোগাযোগটা হয়ে যেত!

আমি প্রশ্ন করি, 'স্যার, এটা তো ১৯৯৯ সালের, মানে চার বছর আগের ক্যাসেট, আপনার হাতে এল কী করে?'

তিনি এ প্রশ্নের জবাব দেন না। আমাকে বলেন, 'তুমি মুগ্ধ হওনি?'

'জি স্যার, আমি মুগ্ধ।'

'আমি আনন্দ পেয়েছি তোমার মুগ্ধ হবার দৃশ্য দেখে। এই ক্যাসেটটি আমি অন্যভাবেও তোমার কাছে ফেরত দিতে পারতাম, তাতে আমি আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতাম। আজ তুমি যখন আসার জন্য ফোন করেছ তখনই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যাবার সময় তোমাকে আমি একটা সারপ্রাইজ দেব।'

'স্যার, আই অ্যাম সারপ্রাইজড।'

'আর শোনো, নাটকটি আমি দেখেছি। ইউ হ্যাভ রিটেন আ ওয়ান্ডারফুল ড্রামা। বাট ভেরি পুওর মেকিং। যাও এবার। ভালো থেকো।' আমি মুগ্ধতার স্মৃতি নিয়ে হুমায়ূন আহমেদের ঘর থেকে বেরিয়ে যাই। এরপর বেশ কয়েক বছর তাঁর সঙ্গে আর দেখা হয় না।

পুনশ্চ : আবদুল করিমের ছেলের অভিযোগ সত্য ছিল না। এ আয়োজনের সময় সার্বক্ষণিক দায়িত্বে থাকা মিনহাজুর রহমান জানিয়েছেন, 'হুমায়ূন আহমেদ আবদুল করিমকে যথেষ্ট খাতির করেছেন এবং আমি নিজে আবদুল করিমের হাতে ১০ হাজার টাকা তুলে দিয়েছি। স্যার নিজে কখনো টাকাপয়সা কাউকে দেন না, আমিই দিতাম। আর আমি তাঁর ম্যানেজার ছিলাম, ড্রাইভার না।'

AMARBOI.COM



২৪ ক্যারেটম্যান ও বৈরাতি যখন এক কাতারে

২০০৪ সালের ২৪ মার্চ। শেরাটন হোটেলের উইন্টার গার্ডেনে জমজমাট তারকা মেলা বসেছে। চ্যানেল আই ঈদ অনুষ্ঠানের পুরস্কার দেবে। ঝিলিক এর স্পনসর। অনুষ্ঠানের নাম 'ঝিলিক-চ্যানেল আই ঈদ অনুষ্ঠান পুরস্কার ২০০৪'।

আমার টেনশনের শেষ নেই। আমি জীবনের প্রথম নাট্য পরিচালনায় এসেছি। এর আগে লিখেছিলাম *নাইওরী*, বানিয়েছিল তৌকীর। দ্বিতীয়

টেলিফিল্ম *বৈরাতি*। রচনা-পরিচালনা-প্রযোজনা সবই আমার। *মানবজমিন* পত্রিকায় তালিকা দেখেছি, নাটক-টেলিফিল্ম দুই শাখাতেই সাতটি করে ক্যাটাগরি আছে। *বৈরাতি* সাতটি শাখায়ই নমিনেশন পেয়েছে। কটিতে পুরস্কার পাই বা আদৌ পাই কি না—এ নিয়ে টেনশন। অন্যদিকে আমার চোখ খুঁজছে আর একজনকে। তিনি হুমায়ূন আহমেদ।

কাগজে দেখেছি, *২৪ ক্যারেটম্যান* নাটকটির জন্য শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ও শ্রেষ্ঠ পরিচালক হিসেবে তাঁর, অভিনেত্রী হিসেবে শাওন এবং পার্শ্ব অভিনেতা মাসুম আজিজেরও নমিনেশন আছে। আমার চোখ তাঁকে খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু কোথাও তিনি নেই।

হুমায়ূন আহমেদের ইদানীংকার নাটকগুলোতে শাওন প্রায় অবশ্যম্ভাবী একটা চরিত্র। চার-পাঁচ বছর ধরে এমনটি দেখা যাচ্ছে। এ নিয়ে অনেক কানাঘুষাও আছে।

হুমায়ূন আহমেদের নাটকগুলো কেমন যেন বদলে গেছে। ১৯৯৪ সালে বেসরকারি উদ্যোগে প্যাকেজ নাটক প্রচারের আগে পর্যন্ত তাঁর নাটকগুলো, বিশেষ করে ধারাবাহিক ও এক ঘণ্টার কিছু নাটক দেখে যে রকম মুগ্ধ হয়েছিলাম, এখনকার নাটকগুলোতে সে রকম হতে পারছি না। তার পরও মনে হয়, *বহুব্রীহি* ও *আজ রবিবার* দুটিই মূলত সিরিও-কমেডি ধাঁচের ধারাবাহিক নাটক ছিল। *আজ রবিবার*-এর আগে পর্যন্তও বেশ কিছু চমৎকার এক ঘণ্টার নাটক দেখেছি। কিন্তু ২০০৪ সালে এসে নাটকগুলো খুব বেশি কমেডি-প্রধান হয়ে গেছে। মনে হয়, পাবলিক হাসানোই তাঁর নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য। তাঁর *হাবলঙের বাজারে* নামক এক নাটকের সূচনা টাইটেলে হুমায়ূন আহমেদ আত্মবিশ্বাস নিয়ে লেখেন, 'দুঃখিত, এই নাটকে শিক্ষণীয় কিছু নেই।'

কিছুদিন আগে হুমায়ূন আহমেদের একটা লেখা পড়েছি। সেখানে তাঁর এক জ্যেষ্ঠ লেখক বন্ধুর সঙ্গে আলাপের কথা লিখেছেন। সেই বন্ধু তাঁর নাটক করা নিয়ে ভর্ৎসনা করেছিলেন, 'দেখছি তো তুমি কিছু নাটক করছ, তো সাহিত্য কী লিখছ?'

আরেক জায়গায় হুমায়ূন আহমেদ এমনও লিখেছেন যে তাঁর এক সাহিত্যিক-অধ্যাপক বন্ধু তাঁকে বলেছেন, 'আপনার নাটকগুলো আমার বাসার কাজের লোকেরা খুব মন দিয়ে দেখে। তারা অনেক আনন্দ পায়।' এতে মোটেও কষ্ট পাননি তিনি। তিনি তাঁর মতো করে নাটক বানিয়ে যাচ্ছেন।

প্যাকেজ যুগে হুমায়ূন আহমেদ আকস্মাৎই নাটকের পরিচালক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। অনেকে বলে থাকেন, হুমায়ূন আহমেদ নাট্যকার

AMARBOI.COM

হিসেবেই বেশি ভালো, পরিচালনা অন্য কেউ করলে হয়। এখন তিনি শুধু পরিচালকই নন, প্রযোজকও। নুহাশ চলচ্চিত্র শুরু হয়েছিল সিনেমা বানানোর উদ্দেশ্যে। কিন্তু অসংখ্য নাটক বানানো হচ্ছে এই ব্যানার থেকে।

তারা চৌধুরী, সানোয়ার আহমেদ, মনির হোসেন জীবন—এঁরাই ছিলেন তাঁর প্রধান কারিগরি শক্তি, প্রধান সহকারী পরিচালক। ম্যানেজার হিসেবে সবকিছু সামলাতেন মিনহাজুর রহমান। ১৯৯৮ সালে মিনহাজুর রহমানকে ছেড়ে যেতে হলো নুহাশ চলচ্চিত্র। বিভিন্ন কারণে একে একে তাঁর প্রধান সহকারীদেরও ইউনিট থেকে চলে যেতে হয়। এঁদের পর ইউনিটে আসেন অপেক্ষাকৃত নবীন এবং অনভিজ্ঞ সহকারী। এ নতুন নিয়োগের প্রভাব দেখা যায় পর্দায়ও। ব্যতিক্রম হিসেবে আসাদুজ্জামান নূর ছাড়া পুরোনো বড় অভিনেতা-অভিনেত্রীদের তাঁর নাটকে দেখা যায় না। বিকল্প হিসেবে আমদানি ঘটে বেশ কিছু মুখের, যাদের অধিকাংশই তাঁর বন্ধুবান্ধব, ইউনিটের সহকারী পরিচালক, মেক-আপম্যান, অফিস-বাসার কর্মচারী, নুহাশ পল্লীর দারোয়ান-মালি-ম্যানেজার এবং তিন-চারজন তাজা নায়ক। যেমন, রিয়াজ-ফেরদৌস-মাহফুজ এবং কিছু মাঝারি মানের অভিনেতা-অভিনেত্রী। তরুণ অন্য অভিনেত্রীদের খুব বেশি অভিনয় করার সুযোগ নেই, প্রায় সব নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করছেন মেহের আফরোজ শাওন। নতুন কুঁড়িতে পুরস্কার পাওয়া শাওনের নাটকে অভিষেক হয়েছিল ১৯৯১ সালে, হুমায়ূন আহমেদের লেখা এবং নওয়াজিশ আলী খানের প্রযোজনায় বিটিভির একটি ফরমায়েশি নাটক *জননী* দিয়ে। তখন তার বয়স বারো-তেরোর মতো। এক গ্রাম্য কিশোরীর চরিত্র ছিল সেটি, যে ছাগল চরায়।

একসময় এমন দাঁড়াল যে হুমায়ূন আহমেদের নাটকের সব অভিনেতা-অভিনেত্রী প্রতিটি নাটকে একইভাবে কথা বলে, একইভাবে হাসে এবং একইভাবে চোখ নাচায়। হয়তো সে কারণেই সাম্প্রতিক কালে তাঁর নাটক থেকে 'সুধী সমাজ' কিঞ্চিৎ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেই বলা যায়। কারণ, যে রকম তীব্র মানবিক বোধ নিয়ে তাঁর নাটক *একদিন হঠাৎ, অদেখা ভুবন, উজান উট, নিমফুল, অচিন বৃক্ষ, খাদক, কুসুম,* নান্দাইলের ইউনুস খ্যাত *মাটির পিঞ্জিরার মাঝে বন্দি হইয়া রে* কিংবা মিসির আলীবিষয়ক রহস্য নাটক দেখেছিলাম, এসব নাটক এখন নেই। তাঁর বেশ কিছু নাটকে কাজের বুয়া আর ড্রাইভার-বাবুর্চি প্রধান চরিত্র হতে থাকে। প্রায় নাটকেই দেখি, শুধু শুধু চড়-থাপ্পড় মারা, পানিতে চুবানো, না হলে একটা চরিত্রকে পাগল বানিয়ে তাকে নিয়ে নানা রকম ঠাট্টা-মশকরা। এগুলোই হয়তো দর্শকের পছন্দ। কিন্তু তত দিনে আমার বয়স হয়ে গেছে। আমার আর ভালো লাগে না।

হুমায়ূন আহমেদ চলচ্চিত্র পরিচালক হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার

AMARBOI.COM

পেয়েছিলেন ১০ বছর আগে, কিন্তু নাটকের পরিচালক হিসেবে খুব সুবিধা করতে পারেননি। এর প্রমাণ পাওয়া গেল আজকের এই অনুষ্ঠানে। সাতটার মধ্যে চারটা শাখায় মনোনয়ন থাকলেও পুরস্কার জোটে একটিমাত্র, শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসেবে (*২৪ ক্যারেটম্যান*)। নাটকের পরিচালকদের মধ্যে তাঁর সঙ্গে মনোনয়ন ছিল মোস্তফা সরয়ার ফারুকী আর রেজানুর রহমানের। পুরস্কার পেলেন রেজানুর রহমান (*আম পাতা জোড়া জোড়া*)।

টেলিফিল্ম শাখায় সাতটি ক্যাটাগরির মধ্যে পাঁচটিতে পুরস্কার জিতল *বৈরাতি*। সম্পূর্ণ সিলেটের আঞ্চলিক ভাষায় উপস্থাপিত এই টেলিফিল্মে সেরা অভিনেতা-অভিনেত্রীর পুরস্কার পেল মাহফুজ আর শ্রাবন্তী। চিত্রগ্রহণের জন্য রফিকুল বারী চৌধুরী পুরস্কার নিতে এসে উইন্টার গার্ডেনের হাজার খানেক দর্শকের সামনে প্রায় তাঁরই বয়সী পুরস্কারদাতা সংগীতশিল্পী কলিম শরাফীকে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করলেন। বললেন, 'আমি ছিলাম ফিল্মের ক্যামেরাম্যান। ১৯৬৪ সালে এই কলিম শরাফীই আমাকে টেলিভিশনের ক্যামেরাম্যান বানিয়েছেন।' পরের দিন সকালে মনটা উৎফুল্ল হয়ে উঠল। *প্রথম আলো* আর *ডেইলি স্টার*-এ প্রায় একই রকমের শিরোনাম করেছে। 'ঝিলিক-চ্যানেল আই পুরস্কার ২০০৪, শ্রেষ্ঠ নাটক *২৪ ক্যারেটম্যান*, শ্রেষ্ঠ টেলিফিল্ম *বৈরাতি*।

সংবাদটি নিশ্চয়ই হুমায়ূন আহমেদ পড়বেন। তখন কি তিনি আমাকে চিনতে পারবেন, ১৯৮৬ সালে যে মুগ্ধ পাঠক তাঁকে দেখার জন্য সাংবাদিকের ছলে তাঁর সঙ্গে কথা বলে এসেছিল, সেই ছেলে আজ তাঁর সঙ্গে এক সারিতে!

সেই মুগ্ধকরের সঙ্গে আমার দেখা হয় না। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ খুঁজতে থাকি।

AMARBOI.COM



প্রিয় মরণগীতি

২০০৫ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর। ঢাকা থেকে সিলেট যাচ্ছি। সিলেটের জন্য নতুন হাইওয়ে হয়েছে। সুন্দর সুন্দর বাস যায়। বাসে নাটক দেখায়। দুটি নাটক দেখতে দেখতে সিলেট পৌছানো যায়। গাড়ি ছুটছে দ্রুত বেগে। গাড়িতে নাটক দেখানো হচ্ছে। এই নাটকের নাট্যকার কে, তা বলার

প্রয়োজন থাকে না। এরই মধ্যে কতগুলো মুখ হুমায়ূন আহমেদের জন্য ব্র্যান্ডেড হয়ে গেছেন। ডা. ইজাজ, ফারুক আহমেদ, মামনুন মিজান, স্বাধীন খসরু, চ্যালেঞ্জার, মুনিরা মিঠু, কমল—এদের দেখলেই সবাই চিনে ফেলে নাটকের নাট্যকার কে। আর এ নাটকও তারকায় ভরপুর। ঠিক এই মুহূর্তে আমার মোবাইলে ফোন করে রনি।

আনোয়ার হোসেন রনি সিলেটের নাট্যকর্মী। কথাকলি থিয়েটারে নাটক করে। একসময় সিলেট বেতারে আমার লেখা কিছু নাটক প্রচারিত হয়েছিল। কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছে রনি। তার বাবা গিয়াসউদ্দিন আহমদের *শেষ বিয়ার সানাই* বইয়ের প্রকাশনা ও স্মরণসভা হবে সিলেট অডিটরিয়ামে, সেখানে ঢাকা থেকে সুবীর নন্দী, আকরামুল ইসলামসহ কয়েকজন শিল্পীও আসবেন। প্রধান অতিথি হিসেবে হুমায়ূন আহমেদেরও আসার কথা। রনি আমাকে অনুরোধ করে, আমি যেন আসি, তার বাবা এবং তাঁর সেই গানটি সম্পর্কে কিছু বলি।

আমি একবাক্যে রাজি হই। স্মরণসভা উপলক্ষে যে স্যুভেনিরটি ছাপা হবে, বাঁধাই হওয়ার আগেই তার একটা কপি এবং গিয়াসউদ্দিন সাহেবের *মরিলে কান্দিস না আমার দায়* নামের গানের বইটি পাঠিয়ে দেয়। আমি ভয়ে ভয়ে প্রস্তুতি নিয়ে যাচ্ছি সেই অনুষ্ঠানে। রনি ফোনে জানায়, সুবিদবাজারে রেইনবো নামের একটা গেস্টহাউসে আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। ঢাকার গেস্টরাও এসে গেছেন। অনুষ্ঠান বিকেল চারটায়। হুমায়ূন আহমেদও এসেছেন।

সিলেট অঞ্চলের বাউল, যেমন—সৈয়দ শাহনুর, রাধারমন, হাসন রাজা, শাহ আবদুল করিমের লেখা গান তাঁর বহু নাটক-সিনেমায় এসেছে, কিন্তু গিয়াসউদ্দিন সাহেবের এই গান তাঁর কী করে মনে ধরল, আমি তখনো জানি না।

চলতি বাসে আলাপ হলো আলমগীর রহমানের সঙ্গে। তিনিও যাচ্ছেন ওই অনুষ্ঠানে। তাঁকে আমি আগে থেকেই চিনি। আলাপ আজই প্রথম। আলমগীর রহমান *বিচিত্রার* সাংবাদিক ছিলেন, এরশাদের আমলে কোনো একটা রিপোর্ট তাঁর হাত দিয়ে ছাপা হওয়ার কারণে *বিচিত্রা* থেকে তাঁর চাকরি চলে যায়। এরপর পারিবারিক মুদ্রণ ব্যবসায় মনোযোগ দেন। বর্তমানে 'অবসর' ও 'প্রতীক' নামে তাঁর দুটি প্রকাশনী আছে। ১৯৮৫ সালে তিনি হুমায়ূন আহমেদের মিসির আলী-সংক্রান্ত প্রথম বই *দেবী* পেপারব্যাকে প্রকাশ করার মাধ্যমে হুমায়ূন আহমেদের প্রকাশক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। এখন তিনি তাঁর অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ২০০৪ সালে হুমায়ূন আহমেদের দ্বিতীয় বিয়ের পর বহু পুরোনো বন্ধু তাঁকে পিঠ দেখিয়েছেন। তাঁদের নিয়ে হুমায়ূনের কোনো

AMARBOI.COM

মাথাব্যথা নেই। পুরোনোদের মধ্যে হাতেগোনা কয়েকজন নিয়েই তাঁর চলাচল। তাঁরাই মূলত হুমায়ূন আহমেদের সফরসঙ্গী।

বাসে নাটক চলছে। পরের নাটকটিও হুমায়ূন আহমেদের, নাম *এসো*। নাটকটি দেখতে দেখতে একটা জায়গায় হঠাৎ আমার চোখ আটকে যায়। যে বাড়িতে শুটিং হয়েছে তার দেয়ালে দুটি সাদাকালো ছবি টাঙানো। আরে! এ তো আমার তোলা ছবি। এখানে এল কী করে?

ভাবনায় পড়ে যাই। এই দুটি ছবি আমার কাছ থেকে নিয়েছিলেন মিলন ভাই—ইমদাদুল হক মিলন।

মিলন ভাই তখন একটা শুটিং ফ্লোর দিয়েছেন ৫০ পুরানা পল্টনে। সেখানে একটা বাসাবাড়ি সাজিয়ে রাখা শুটিংয়ের জন্য। ওই বাসায় কি তবে এ দুটি ছবি টাঙিয়ে রেখেছিলেন মিলন ভাই?

হুমায়ূন আহমেদের অত্যন্ত প্রিয়ভাজনদের একজন মিলন ভাই। তাঁর এই শুটিং ফ্লোরেই নিশ্চয় হুমায়ূন আহমেদ *এসো* নাটকটির শুটিং করেছেন এবং একবার ক্লোজ শটে ছবি দুটিও তাঁর ক্যামেরাম্যান ধারণ করেছিল।

বাসে বসে হুমায়ূন আহমেদের নাটকের ভেতরে ছবি দুটি দেখা নিতান্তই কাকতালীয়।

সিলেটের বাসস্ট্যান্ডে নেমে আমি ও আলমগীর রহমান আলাদাভাবে গেস্টহাউসে গিয়ে পৌঁছাই। আমি আমার কামরায় চলে যাই। ঢাকা থেকে আসা কোনো অতিথিকে আমি দেখতে পাই না। তাঁরা সম্ভবত একসঙ্গে লাঞ্চ করছেন। আয়োজকেরা তাঁদের নিয়ে খুবই ব্যস্ত। আমাকে বলা হলো, আমার খাবার রুমে দেওয়া হবে। আমি মন খারাপ করে রুমে বসে বসে টিভি দেখি।

বিকেল চারটায় অনুষ্ঠান, আমি সাড়ে তিনটার দিকে নিজের দায়িত্বে চলে যাই। গিয়ে দেখি, গানের রিহার্সেল হচ্ছে। আমি ভয়ে ভয়ে ভেতরে ঢুকে এক কোনায় বসে পড়ি। বছর ছয়েক আগে সিলেটের লোকজন আমাকে 'অবাঞ্ছিত' ঘোষণা করেছিল *লন্ডনী কইন্যা* নাটক লেখার কারণে। সিলেটের বুদ্ধিজীবী মহলের এক অংশের সায় ছিল এই ঘটনায়। কিছু সংস্কৃতিকর্মী আমার পক্ষ নিয়ে বিবৃতি দিয়েছিল। সে ঘটনার পর আজই প্রথম তাঁদের মুখোমুখি হওয়া। আমাকে বক্তৃতাও দিতে হবে গিয়াসউদ্দিন আহমদের ওপর। আজকের আয়োজনে বড় বড় বুদ্ধিজীবী-সংস্কৃতিকর্মীরা থাকবেন। তাঁরা না জানি কী বলে দুয়ো দেন আমাকে, সেই আশঙ্কায় চুপচাপ বসে থাকি।

এ সময় মন্ত্রী মহোদয়েরা গাড়ি থেকে নামলে যে রকম পরিস্থিতি হয়, তেমন একটা হুড়োহুড়ির মতো অবস্থা দেখি। বুঝতে পারি, তিনি এসে গেছেন। হুমায়ূন

AMARBOI.COM

আহমেদের সঙ্গে আরও এসেছেন তাঁর বন্ধু স্থপতি আবু করিম, প্রকাশক মাজহারুল ইসলাম, অভিনেতা স্বাধীন খসরু, চ্যালেঞ্জার, কমল এবং তাঁর কিশোরপুত্র নুহাশ। নুহাশকে দেখে মনে হয় গায়ে বাংলাদেশের পতাকা জড়ানো। তাঁর সবুজ রঙের টি-শার্টের মাঝখানে লাল রঙের এক বৃত্ত।

যথারীতি শুরু হয় অনুষ্ঠান। প্রধান অতিথির আসনে হুমায়ূন আহমেদ। বক্তৃতার পালা শুরু হয়। একসময় আমার নাম ডাকা হয়।

'মরিলে কান্দিস না আমার দায়' গানটি আমি প্রথম শুনি ১৯৯৫ সালের দিকে একটা রিহার্সেল রুমে। তখন তৌকীর আহমেদ আমার ব্যবসায়িক পার্টনার। সে তার দল নাট্যকেন্দ্র থেকে একটা মঞ্চনাটক নির্দেশনা দিচ্ছে, নাম *হয়বদন*। এ নাটকের একটা মৃত্যুদৃশ্যে ইউসুফ হাসান অর্ক (বর্তমানে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যতত্ত্বের অধ্যাপক) এবং ফজলুল কবীর তুহিন এ গান গান। শুধু এই গান নয়, সিলেট অঞ্চলের আরও দু-একটি গান এই নাটকে ব্যবহার করা হয়। এই নাটকের জন্য গানগুলো মূলত তাঁরই আমদানি। রিহার্সেল শেষে তুহিন এই গান পুরো আমাদের গেয়ে শোনান। কানে লেগে যায়।

কিন্তু হুমায়ূন আহমেদের কানে এই গান লাগে আরও আগে। ১৯৯৪ সালে সুনামগঞ্জের পৌরসভা চেয়ারম্যান মইনুল মইজুদ্দিনের আয়োজনে তিন দিনের জন্য হাসন উৎসবে গায়ক সেলিম চৌধুরী হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে যান। সেই দলে তুহিনও ছিলেন। এ আসরে সেলিম চৌধুরী বেশ কয়েকটি গান গেয়ে শোনান, শেষের গানটি ছিল গিয়াস উদ্দিন আহমদের লেখা এই গান।

দল নিয়ে ঢাকায় ফেরার পর সেলিম চৌধুরী ও তুহিনের ঘন ঘন ডাক পড়ে হুমায়ূন আহমেদের আসরে। সেলিম চৌধুরীকে দিয়ে হুমায়ূন আহমেদ হাসন রাজার গানের একটা অডিও সিডি বের করেন। তাঁর পরবর্তী ধারাবাহিক নাটক *আজ রবিবার*-এ হাসন রাজার গানগুলো ব্যবহৃত হতে থাকে।

১৯৯৫-৯৬ সালের দিকে হাসন রাজার গানের সিডি বের করা অনেক কঠিন কাজ ছিল। সিডি বের করতে হয়েছিল লন্ডন থেকে। হুমায়ূন আহমেদের এই উৎসাহকে অনুপ্রাণিত করার জন্য তাঁর দুই বন্ধু প্রকাশক আলমগীর রহমান ও স্থপতি আবু করিম ৫০ হাজার করে ১ লাখ টাকা লগ্নি করেন। জানি না, এ টাকা তাঁরা ফেরত পেয়েছিলেন কি না।

হুমায়ূন আহমেদ এরপর তাঁর *শ্রাবণ মেঘের দিন* উপন্যাসটির চিত্ররূপ দেন। সেই চিত্রনাট্যে তিনি 'মরিলে কান্দিস না আমার দায়' গানটিও অন্তর্ভুক্ত করেন। এই গানসহ অন্য কয়েকটি গান রেকর্ড করার জন্য স্টুডিও ভাড়া করা হয়। সেখানে বাঁশি বাজানোর জন্য ডাক পড়ে বারী সিদ্দিকীর। রেকর্ডিংয়ের

AMARBOI.COM



হুমায়ূন আহমেদ, ১৯৮৫। ছবি : নাসির আলী মামুন

AMARBOI.COM

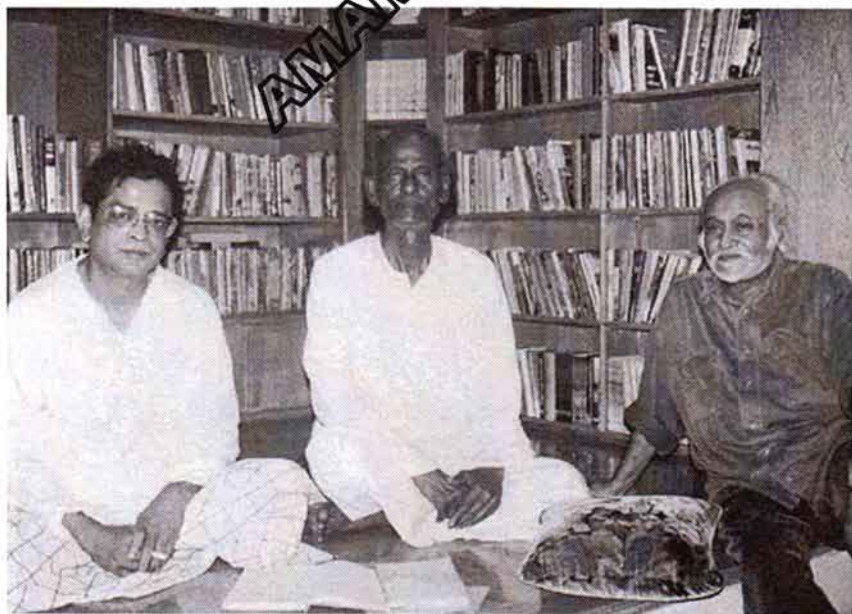


হুমায়ূন আহমেদের প্রথম সাক্ষাৎকার গ্রহণ করছেন লেখক, ১৯৮৬
ছবি : মুহিব্বুল আবরার



এক আড্ডায় হুমায়ুন আজাদ, হুমায়ূন আহমেদ, শামসুর রাহমান, ইমদাদুল হক মিলন ও সালেহ চৌধুরী, ১৯৮৬। ছবি : সংগৃহীত

AMARBOI.COM



'জলসাঘর' অনুষ্ঠানের রেকর্ডিংয়ের অবসরে শাহ আবদুল করিম ও আবুল খায়েরের সঙ্গে হুমায়ূন আহমেদ, ১৯৯৭। সৌজন্যে : মিনহাজুর রহমান



৫০তম জন্মদিনে পুত্রকন্যাসহ হুমায়ূন আহমেদ, ১৯৯৮। ছবি : সংগৃহীত

AMARBOI.COM

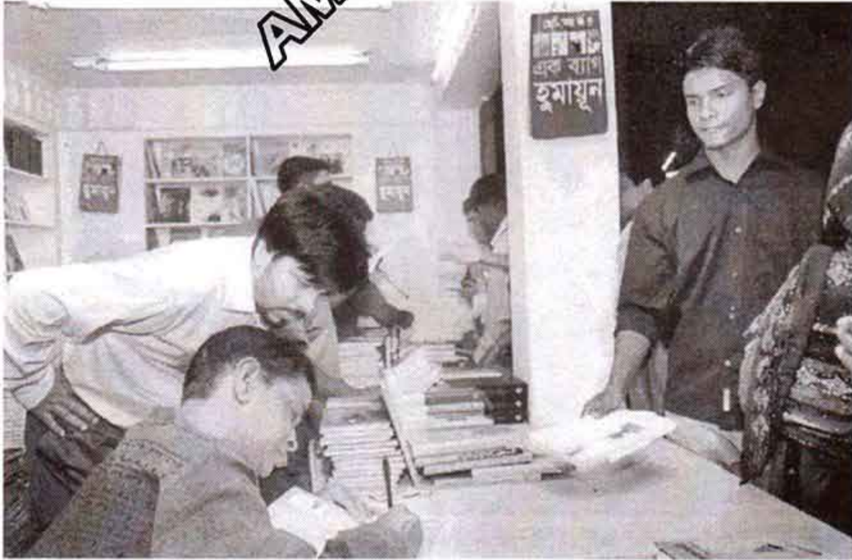


দখিন হাওয়ার ফ্ল্যাটে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে উপলক্ষ করে আয়োজিত আড্ডায় হুমায়ূন আহমেদ ও তাঁর বন্ধুরা, ২০০৭। ছবি : মাজহারুল ইসলাম



৬০তম জন্মদিনে একক বইমেলার উদ্বোধন করছেন হুমায়ূন আহমেদ সঙ্গে মা, স্ত্রী-পুত্র ও শুভানুধ্যায়ীরা, ২০০৮। ছবি : বিশ্বজিৎ সরকার

AMARBOI.COM

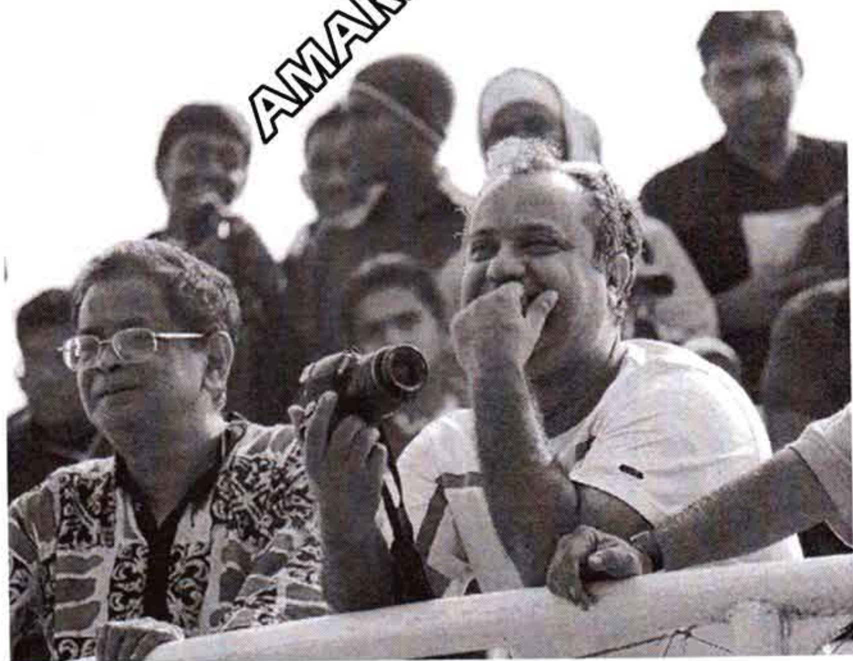


৬০তম জন্মদিনে একক বইমেলায় পাঠকদের অটোগ্রাফ দিচ্ছেন হুমায়ূন আহমেদ, ২০০৮। ছবি : বিশ্বজিৎ সরকার



স্ত্রী ও বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে সুন্দরবনের হিরন পয়েন্টে, ২[illegible]
ছবি : মাজহারুল ইসলাম

AMARBOI.COM

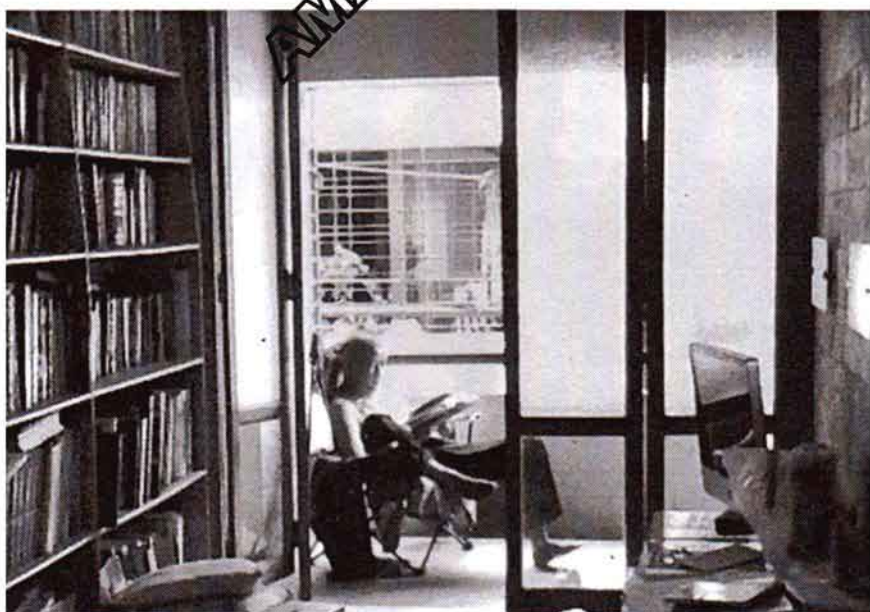


সুন্দরবনে হুমায়ূন আহমেদ সঙ্গে লেখক, ২০০৯। ছবি : মাসুদ আখন্দ



২০১০ সালে ঢাকা ক্লাবে এক অনুষ্ঠানে বাঁ থেকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, হুমায়ূন আহমেদ, মাসুম রহমান, গৌতম ঘোষ, মাজহারুল ইসলাম ও ফরিদুর রেজা সাগর
ছবি : শাকুর মজিদ

AMARBOI.COM



দখিন হাওয়ার ফ্ল্যাটে একান্তে হুমায়ূন আহমেদ, ২০১১। ছবি : শাকুর মজিদ

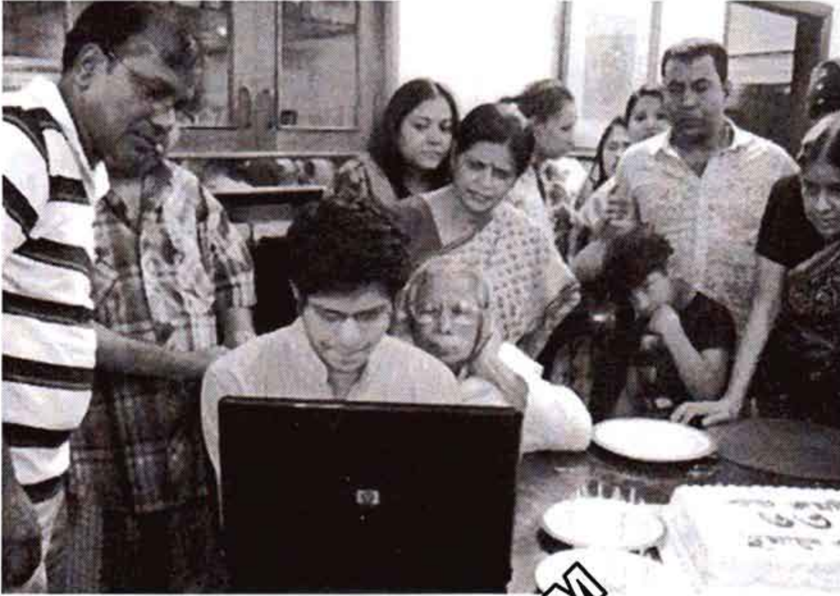


বাঁ থেকে ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল, মা বেগম আয়েশা ফয়েজ, হুমায়ূন আহমেদ ও আহসান হাবীব, ২০১১। ছবি : নাসির আলী মামুন

AMARBOI.COM

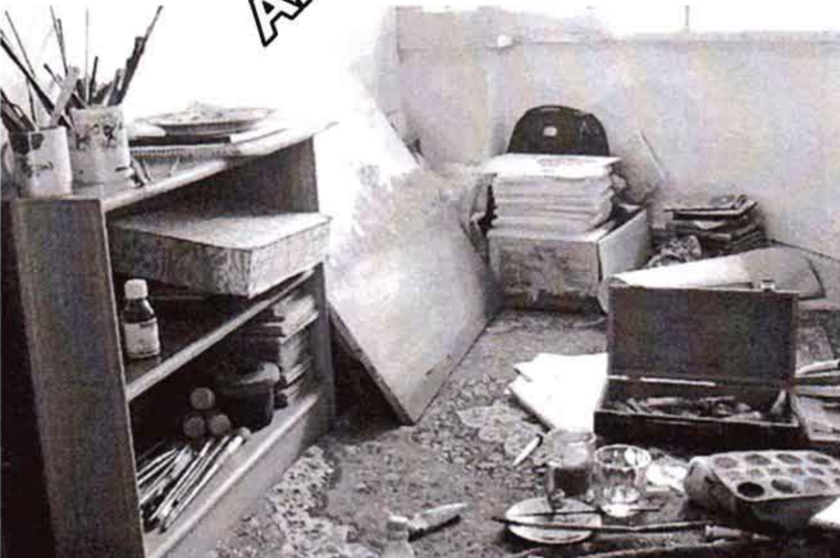


'ঘেটুপুত্র কমলা'র বিশেষ প্রদর্শনীতে নিজের ছবি সম্পর্কে বলছেন হুমায়ূন আহমেদ। এটি ছিল দর্শকের সামনে তাঁর শেষ উপস্থিতি, ২০১১। ছবি : সংগৃহীত



জীবদ্দশায় শেষ জন্মদিনে (১৩ নভেম্বর) হুমায়ূন আহমেদ ছিলেন আমেরিকায়। ঢাকা থেকে স্কাইপেতে কথা হয় পুত্র নুহাশ, মা আয়েশা ফয়েজ ও স্বজনদের সঙ্গে, ২০১১
ছবি : শাকুর মজিদ

AMARBOI.COM



দখিন হাওয়ার ফ্ল্যাটে হুমায়ূন আহমেদের ছবি আঁকার ঘর। ছবি : শাকুর মজিদ

অবসরে বংশীবাদক বারী সিদ্দিকী তাঁকে নেত্রকোনার ভাটি অঞ্চলের কিছু গানও শোনান। এর ফলাফল সবাই জানেন। *শ্রাবণ মেঘের দিন*-এর *মরিলে কান্দিস না* গানটির জায়গায় স্থান পেল 'শুয়াচান পাখী, আমি ডাকিতেছি তুমি ঘুমাইছো নাকি', আর বাংলাদেশ পেল বারী সিদ্দিকীর মতো এক সংগীতশিল্পী।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় হুমায়ূন আহমেদ মূলত কী করে এ গান পেলেন এবং কোথায় ব্যবহার করলেন, তারই বর্ণনা দিলেন। একসময় বললেন, তিনি তিনজন শিল্পীকে দিয়ে (সম্ভবত সেলিম চৌধুরী, বারী সিদ্দিকী ও সুবীর নন্দী) গানটি আলাদাভাবে রেকর্ড করিয়েছিলেন, প্রতিবারই তাঁর অনেক টাকা খরচ হয়েছে, কিন্তু শেষমেশ তিনি বেছে নিয়েছিলেন সুবীর নন্দীর গাওয়া গানটি। হুমায়ূন আহমেদ তাঁর ধারাবাহিক *নক্ষত্রের রাত* নাটকেও গানটি ব্যবহার করেন।

সুবীর নন্দীও ছিলেন অনুষ্ঠানে। তিনিও ঢাকা থেকে গিয়েছেন এ অনুষ্ঠানে শুধু ওই গানটি গাওয়ার জন্য। গাইলেনও তিনি খুব দরদ দিয়ে। গান গাইতে গিয়ে প্রথমেই তিনি এ গানের সুরকার এবং তাঁর ওস্তাদ বিদিতলাল দাশের (পটলবাবু) কথা বলছিলেন। বিদিতলাল দাশও তাঁর দলবল নিয়ে মঞ্চে উপস্থিত।

AMARBOI.COM

১৯৩৫ সালের ১৪ আগস্ট সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক থানার শিবনগর গ্রামে জন্ম নেন গিয়াসউদ্দিন আহমদ। তিনি ছিলেন সিলেটের সাপ্তাহিক *যুগভেরীর* ছাতক সংবাদদাতা, ছাতক প্রেসক্লাবের সভাপতি এবং ফুটবলার। এসব পরিচয়ই দেওয়া হয়েছে বক্তৃতায়। বৈরাগী, রসিক এবং সংগীতপ্রিয় মানুষটি অনেকগুলো জনপ্রিয় সিলেটি আঞ্চলিক গান লিখেছিলেন। তাঁর লেখা 'সিলেটে পরথম আজান ধ্বনি বাজিয়ে দিয়েছে' এবং 'বাবা শাহপরান আউলিয়া', 'প্রাণ কান্দে মন কান্দে, কান্দে আমার হিয়া'—এসব গান গাওয়া হলো। জারি-সারি কিছু গান ও নৌকাবাইচের গানও লিখেছিলেন তিনি। মঞ্চের মধ্যে নৌকাবাইচের চমৎকার কোরিওগ্রাফি করে দেখালেন সিলেটের শিল্পীরা।

এই অনুষ্ঠানে সংগীত পরিচালক এবং গানগুলোর সুরকার বিদিতলাল দাশ তাঁর বক্তৃতায় জানান, বহু আগে (১৯৭৪ সালের ৪ নভেম্বর) গিয়াসউদ্দিন সাহেব খুব অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে ছিলেন। এ সময় বিদিতলাল দাশ তাঁকে দেখতে গেলেন। তাঁকে দেখেই একটা কাগজ তাঁর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই গানটা আজ লিখলাম। আপনি সুর করেন।'

গানের প্রথম স্তবকটি এ রকম :

মরিলে কান্দিস না আমার দায় রে যাদুধন,
মরিলে কান্দিস না আমার দায় ॥

সুরে ইয়াসিন পাঠ করিও বসিয়া কাছায়
আমার প্রাণ যাওয়ার বেলায়
বিদায় কালে পড়ি না যেন শয়তানের ধোকায়
রে যাদুধন... ॥

মৃত্যুচিন্তা থেকেই এই মরণসংগীতটি লেখা। তখন কবির বয়স প্রায় চল্লিশ। আরও প্রায় ত্রিশ বছর বেঁচে ছিলেন তিনি। মারা যান ২০০৫ সালের এপ্রিল মাসে।

অনুষ্ঠান শেষ হয়। আমি হুমায়ূন আহমেদ ও তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের দেখি। একমাত্র স্থপতি আবু করিম আমার সঙ্গে কথা বলেন। সিলেট অডিটরিয়ামের পাশের একটা চায়ের দোকানে বসে আমরা চা খাই। সিলেট শহরে আমাদের দুজনেরই ডিজাইন করা কিছু বড় বড় প্রজেক্ট আছে, আমরা সেগুলো নিয়েই আলাপ করি।

আমার সঙ্গে হুমায়ূন আহমেদের দেখা বা কথা হয় না। আমি তাঁদের রাতের প্রোগ্রাম জেনে গেছি। রাতে তাঁরা হ্যারল্ড রশীদ সাহেবের বাসায় যাবেন। ওখানেও গানবাজনা হবে। পরদিন বেশ বেলা করে ঘুম থেকে উঠে জানা গেল, ঢাকার মেহমানরা সবাই সকালেই চলে গেছেন।

শুনেছি, তাঁর গানের আসরে নানা রকমের সংগীত পরিবেশনা হতো। 'মরিলে কান্দিস না আমার দায়' গানটি দিয়ে তাঁর সব আসরের সমাপ্তি ঘটত। হুমায়ূন আহমেদসহ তাঁর বন্ধুরা চোখ মুছতে মুছতে আসর ছাড়তেন। হুমায়ূন আহমেদও একসময় শাওনকে বলেছেন, তাঁর মৃত্যুর পর লাশের সামনে যেন শাওন এ গান গায়। এমন কথা খুব সুন্দর করে গুছিয়ে লেখা আছে হুমায়ূনের কোনো একটি বইয়ের উৎসর্গ পাতায়ও। অতি বেদনার কারণ হওয়ায় একসময় এ গান গাওয়া বাদ পড়ে যায়; তাঁর স্মৃতি থেকে প্রায় আড়াল হয়ে যায়।

AMARBOI.COM

হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতার শুরু ২০০৮ সালের এপ্রিল মাসে। এ সময় শুনি, তিনি নিজেই তাঁর মৃত্যুসংগীত রচনা করেছেন :

ও কারিগর দয়ার সাগর, ওগো দয়াময়
চান্নি পশর রাইতে যেনো আমার মরণ হয়।

গানটি সুর করেছেন এস আই টুটুল, আসরে বেশ কয়েকবার গাইতেনও তিনি। এস আই টুটুল পাবলিক কনসার্টে তাঁর গানের আসরও শেষ করতেন এই গান দিয়ে। মনে হলো, হুমায়ূন আহমেদ হয়তো তাঁর প্রিয় মৃত্যুসংগীতটি ভুলে গিয়েছিলেন।

আসলে কি ভুলে গিয়েছিলেন?

হুমায়ূন আহমেদের মৃত্যুর পর ইউটিউবে একটা ভিডিও দেখে আমি বিস্মিত। আমেরিকার মেরিল্যান্ডের এক বাড়িতে কয়েকজন বাংলাদেশি স্বজন এসেছেন আড্ডায়। খাওয়াদাওয়া হবে। এ অবসরে তিনি বললেন, 'আমরা রবীন্দ্রনাথের গান শুনলাম, নজরুলের গান শুনলাম, আমাদের দেশের সাধারণ মানুষও অসাধারণ কিছু গান লিখতে পারেন, এটা কিন্তু ফ্যাক্ট।...সিলেটের এক লোকের নাম গিয়াসউদ্দিন আহমদ...।'

এ সময় পাশ থেকে শাওন বলল, 'এটা খুব অপছন্দের গান, এটা করব না।'

হুমায়ূন আহমেদ বলেন, 'বাট দিস ইজ ট্রু ফর ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান অব আস।' এটুকু বলে শাওনকে অনুরোধ করেন গানটি গেয়ে শোনানোর জন্য।

শাওন গাইছে। অবিকল সেই সুর, সেই দরদ।

সিলেটের এক প্রত্যন্ত গ্রামের এক গীতিকবি কী অসাধারণ কথা বলে গেছেন। সেটাই কি ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয় মৃত্যুসংগীত? কে জানে!

AMARBOI.COM

এক দেশান্তরী যুবকের মুগ্ধতা

২০০৭ সালের সেপ্টেম্বর মাস। একদিন হঠাৎ অভিনেতা স্বাধীন খসরুর ফোন পাই, 'মামা, কাল সন্ধ্যায় একটু ঢাকা ক্লাবে আসেন। আমার মেয়ের প্রথম জন্মদিন। হুমায়ূন ভাইও থাকবেন। আপনি এলে খুব খুশি হব।'

স্বাধীন খসরুর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা ২০০১ সালে, লন্ডনে। দ্বিতীয় দেখা হুমায়ূন আহমেদের দখিন হাওয়ার ফ্ল্যাটে ২০০৩ সালের অক্টোবর মাসে। এরপর আরও এক-দুই বছর টেলিফোনে কথা হয়। আমার বড় খালার বাড়ি বড়লেখা থানার ইটাউরি গ্রামে। একবার ঈদের ছুটিতে খালার বাড়ি গিয়েছি। শুনি, হুমায়ূন আহমেদের নাটকের বিশিষ্ট অভিনেতা স্বাধীন খসরুর বাড়ি আমার খালার পাশের বাড়ি। খালাতো ভাই উৎস প্রকাশনের স্বত্বাধিকারী মোস্তফা সেলিম বলে, 'উনি আমাদের আত্মীয়, আমাদের চাচা।' এই পরিচয় জানাজানির পর আমরা দুজন দুজনকে মামু বলে ডাকি। দেখা হলে হাজার লোকের সামনে আমরা আমাদের প্রিয় সিলেটি ভাষায় কথা বলি।

আমি ঢাকা ক্লাবের ড্রেস কোডের কথা মনে রেখে 'ভদ্রলোকের' কাপড়চোপড় পরে সন্ধ্যা সাতটার দিকে হাজির হই। এর মধ্যে বেশ কিছু অতিথি চলে এসেছেন। দরজার কাছে বেশ একটা জটলা। ঢিলাঢালা টি-শার্ট পরে স্যান্ডেল পায়ে স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে একটু বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন শিল্পী ধ্রুব এষ। তাঁকে নিয়ে এ জটলা। গেস্টহাউসের দারোয়ান তাকে ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছে না। তিনি 'ভদ্রলোক' হবার দুটি শর্ত ভঙ্গ করেছেন। প্রথমটি, তিনি যে জামা পরেছেন, তার কলার নেই, দ্বিতীয়টি চপ্পল। সুতরাং নো এন্ট্রি।

দেখি, ধ্রুবদা খুব নরম গলায় বোঝাবার চেষ্টা করছেন যে এটা তো গেস্টহাউস। এটা মেম্বারদের জায়গা নয়। আমার মামু খুব ঝামেলার মধ্যে পড়ে গেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ধ্রুব এষের দলে আরও দুজন যুক্ত হয়েছেন। কবি টোকন ঠাকুর ও গায়ক মাকসুদ। দুজনেরই একই হাল। তাঁরা ঢাকা ক্লাবের গুষ্টি মেরে বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম করছেন। আমার মামু সিলেটি ভাষায় অপর একজনকে কিছু বলছেন। যার বাংলা অর্থ, 'এই, তুমি এক্ষুনি এলিফ্যান্ট রোডে যাও,...কিনে নিয়ে আসো।' বাহ্, নতুন শার্ট আসবে, জুতা আসবে, মোজা আসবে, মহামান্য অতিথিরা সেগুলো পরে অতঃপর নেমন্তন্ন খেতে এই গেস্টহাউসে ঢুকবেন। আমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে এসব দেখে সময় কাটাই।

একটু পর একবার ভেতরে যাই। পরিচিত কাউকে দেখি না। মিডিয়ার কিছু আধা চেনা লোকজন দেখি। টুকটাক হাই-হ্যালো করি, আবার বেরিয়ে আসি। আমি যাঁকে খুঁজি, তাঁকে দেখি না।

AMARBOI.COM

স্বাধীন খসরুর স্ত্রী তাঁর এক বছরের শিশুকন্যা নিয়ে ভেতরে বড় অসহায়। আমার মামু বাইরে তাঁর বন্ধুদের নিয়ে আড্ডায়। কিছুক্ষণ পরপরই ফোন করছেন। এখন গাজীপুর, এখন টঙ্গী, উত্তরা—আমি শুনতে থাকি।

২০০১ সালে স্বাধীন খসরুর সঙ্গে আমার দেখা হয় লন্ডনের বাঙালিপাড়ার এক চায়ের দোকানে। কয়েকজন আর্ট কালচার কর্মী *লন্ডনী কইন্যা* আর *নাইওরী*র লেখককে চায়ের দাওয়াত দিয়েছেন। পূর্ব লন্ডনের জেনেসিস সিনেমা হলে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসবে আমার *নাইওরী* টেলিফিল্মটি দেখানো হয়। ইংরেজি কাগজ *গার্ডিয়ান*-এ ছাপা হয় এই খবর। বাঙালিরা আমাকে বেশ খাতির করে। এ রকম আসরে বিলেতের অভিনয় স্কুল থেকে গ্র্যাজুয়েশন করা তরুণ স্বাধীন খসরুর সঙ্গে আমার পরিচয়।

পরের বছর ২০০২ সালের জুন মাসে আবার আমার লন্ডন যাওয়া হয়। শুনলাম, হুমায়ূন আহমেদও লন্ডনে আছেন, স্বাধীন খসরু সাহেব তাদের

হেফাজত করছেন। একদিন অত্যন্ত অযাচিতভাবে তাঁদের সঙ্গে আমার দেখাও হয়ে যায়; মানে, আমি তাঁদের দেখি।

ব্রিকলেনে কুদ্দুস ভাইয়ের ভিডিওর দোকান সঙ্গীতার কাউন্টারের ভেতরে বসে কফি খাচ্ছি। খেয়াল করি, দোকানের লোকজন বেরিয়ে রাস্তার দিকে হেঁটে যাওয়া কিছু মানুষকে দেখছে। আমিও বেরোলাম। ততক্ষণে তাঁরা দোকান পেরিয়েছেন—সবার আগে হাঁটছেন হুমায়ূন আহমেদ। মাথায় টুপি। পেছনে জিনসের প্যান্ট আর টি-শার্ট পরা এক তরুণী। উনি নিশ্চয়ই শাওন। তাঁদের সঙ্গে আরও তিন-চারজন।

তাঁরা নাকি আজই স্কটল্যান্ডের উদ্দেশে রওনা দেবেন। একবার ইচ্ছা হলো একটু জোরে হেঁটে হুমায়ূন আহমেদের সামনে গিয়ে বলি, 'স্যার, আমাকে চিনেছেন? আমি ...'। পরে ভাবি, থাক! এত বড় মানুষ! আমাদের আর দেখা হয় না। সম্পর্ক হয় স্বাধীন খসরুর সঙ্গে।

হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে স্বাধীন খসরুর পরিচয় করিয়ে দেন সিলেটের আরজু ভাই। ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, ঢাকার দখিন হাওয়ার ফ্ল্যাটে দেখা করে কথায় কথায় তিনি হুমায়ূন আহমেদকে জানান, যদি সুযোগ পান, বিলেতের অভিনয় স্কুলে শেখা অভিনয় জ্ঞানটুকু তিনি হুমায়ূন আহমেদের কাছে সমর্পণ করতে চান। এ জন্য যদি বিলেতভূমি ছেড়ে দিতে হয় দেবেন।

তারপর এই ব্রিটিশ নাগরিক অভিনেতা হওয়ার জন্য বিলেতের তল্পিতল্পা গুটিয়ে চলে আসেন বাংলাদেশে। প্রথমে *চন্দ্রকথা* ছবির অর্ধেক অর্থ বিনিয়োগ করেন তিনি। এই ছবিতে তিনি এক পঙ্গুর চরিত্রে অভিনয় করেন। ছবিটা আমি দেখেছি। শুয়ে শুয়ে বউ চম্পার সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করা ছাড়া অভিনয়ের তেমন সুযোগ ছিল না। কিন্তু হুমায়ূন আহমেদের সিনেমায় অভিনয়ের কারণে তাঁর গায়ে একটা হুমায়ূনীয় ছাপ পড়ে যায়। এরপর হুমায়ূন আহমেদের একের পর এক নাটকে দেখা যায় স্বাধীন খসরুকে। লন্ডন স্কুল অব অ্যাকটিংয়ের গ্র্যাজুয়েট হুমায়ূন আহমেদের নাটকে একের পর এক মডার্ন ভাঁড়ের চরিত্র (যেমন, স্যুট-টাই পরে পার্কে চা-বিক্রেতা) রূপায়ণ করতে থাকেন। পরমাণুবিজ্ঞানী চিকিৎসক এজাজুল ইসলাম, ঢাকা থিয়েটারের একসময়কার তুখোড় মঞ্চ অভিনেতা ফারুক আহমেদ ও স্বাধীন খসরু—এই ত্রিরত্ন নানা রকমের ক্যারিকেচার করে এক ঘণ্টা সময় পার করার মতো কতগুলো স্কিড করতে থাকেন। *তারা তিনজন, আবার তারা তিনজন, তারা তিনজন টি মাস্টার, তারা তিনজন হে পৃথিবী বিদায়, আমরা তিনজন*—এসব নাটক চলতে থাকে। স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোর কাছে নাটকগুলোর চাহিদাও ভালো। কোনো কোনো

AMARBOI.COM

টিভি চ্যানেল বা সাংবাদিক সংগঠনের পুরস্কার পায় কোনো কোনো নাটক। আমার মামুর রমরমা অবস্থা; স্বাধীন খসরু ক্রমে কমেডি স্টার হয়ে যান।

হুমায়ূন আহমেদের প্রতি স্বাধীন খসরুর ভালোবাসা একতরফা ছিল না। এটা ছিল দ্বিপক্ষীয়। দখিন হাওয়ার ফ্ল্যাটে হুমায়ূন আহমেদ যখন প্রায় নিঃসঙ্গ সময় কাটাচ্ছেন, স্বাধীন খসরু বেশ কয়েক মাস ছিলেন তাঁর সার্বক্ষণিক সঙ্গী। ২০০৩ সালে হুমায়ূন আহমেদ *সে আসে ধীরে* উপন্যাসটি স্বাধীন খসরুকে উৎসর্গ করেন। গভীর মমতা নিয়ে উৎসর্গ পত্রে লেখেন :

> মৃত্যুর কাছাকাছি যাবার মতো ঘটনা আমার জীবনে কয়েকটি ঘটেছে। একবারের কথা বলি। আমার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে—আমাকে নেওয়া হয়েছে হৃদরোগ ইন্সটিটিউটে। আমি চলে গিয়েছি প্রবল ঘোরের মধ্যে। চারপাশের পৃথিবী হয়েছে অস্পষ্ট। এর মধ্যে মনে হচ্ছে হলুদ পাঞ্জাবি পরা এক যুবক আমার পাশে বসে। কে সে? হিমু না-কি? আমি বললাম—কে? যুবক কাঁদো কাঁদো গলায় বলল—হুমায়ূন ভাই, আমি স্বাধীন। আবারো অচেতন হয়ে পড়লাম। এক সময় জ্ঞান ফিরল। হলুদ পাঞ্জাবি পরা যুবক তখনো পাশে বসা। আমি বললাম কে? যুবক কাঁপা কাঁপা গলায় বলল—আমি স্বাধীন।
>
> হিমুর এই বইটি স্বাধীনের জন্যে। যে মমতা সে আমার জন্য দেখিয়েছে সেই মমতা তার জীবনে বহুগুণে ফিরে আসুক—তার প্রতি এই আমার শুভ কামনা।

AMARBOI.COM

মামুর কথা থাক। তাঁর মেয়ের জন্মদিনের কাহিনি বলি। রাত ১০টা। প্রায় অর্ধেক অতিথি খাওয়াদাওয়া শেষে বিদায় নেওয়ার পরও জন্মদিনের কেক আর কাটা হয় না। কারণ হুমায়ূন তখনো আসেননি। রাত সাড়ে ১০টার দিকে একটা কালো রঙের মাইক্রোবাস থেকে হুমায়ূন আহমেদ সস্ত্রীক নামলেন। সঙ্গে সঙ্গে অবিরাম ক্যামেরার ঝিলিক। ধ্রুব এষ, টোকন ঠাকুর আর মাকসুদ সাহেব জুতা-মোজা পরে, ফুলহাতা শার্ট প্যান্টের ভেতর গুঁজে চমৎকারভাবে দাঁড়িয়ে তখনো খোশগল্প করছেন।

স্বাধীন খসরু বলেন, 'মামু, মেয়ের জন্মদিন আসলে ১৮ সেপ্টেম্বর ছিল। হুমায়ূন ভাইয়ের সুবিধামতো আজ ৮ সেপ্টেম্বরই জন্মদিনটা পালন করছি। হুমায়ূন ভাই বলেন, "ইউরোপ আমেরিকায় নিজের সুবিধামতো তারিখ বদল করে বার্থ ডে পালন করা হয় সব সময়। তুমি ব্রিটিশ, তুমি কেন করবা না। তা ছাড়া ১৮ তারিখ হলে রোজা এসে যাবে, লোকজন পাবা না। করে ফেলো।" হুমায়ূন ভাইয়ের জন্যই আজ ১০ দিন এগিয়ে মেয়ের জন্মদিন করছি।'

মামু তাঁর প্রধান অতিথিকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। আমি একা একা

খেয়েদেয়ে কেটে পড়ি। তাঁর সঙ্গে কথা হয় না।

এর বছর খানেক পর এক কাকতালীয় ঘটনা আমাকে হুমায়ূন আহমেদের অতি কাছের মানুষদের তালিকায় নিয়ে আসে। সেখানে প্রায়ই হুমায়ূন আহমেদের অতি ঘনিষ্ঠজনদের সঙ্গে পরিচয় হয়, বন্ধুত্ব হয়। কিন্তু স্বাধীন খসরুকে আমি সেখানে দেখি না। কী এক অজানা অভিমান তাঁকে সরিয়ে রাখে দখিন হাওয়ায় ফ্ল্যাটের আড্ডা বা নুহাশ পল্লীর শুটিং স্পট থেকে।

হুমায়ূন আহমেদ যেভাবে মানুষকে অতি সহজে বুকের ভেতর লুকিয়ে রাখতে পারেন, ততোধিক দ্রুততায় তাকে সরিয়ে নিতেও তাঁর সময় লাগে না। সেটা কি একান্তই তাঁর নিজের ইচ্ছায়, নাকি অন্য কোনো কারণে, সেটা তিনি স্পষ্ট বলেন না।

২০০৮-০৯ সালে দু-একবার স্বাধীন খসরু হুমায়ূন আহমেদের কাছে এসেছেন। কখনো কারও কোনো প্রস্তাব নিয়ে, কখনো বা কেউ স্যারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে তাঁকে নিয়ে। অতি সাধারণ পরিচিত দর্শনার্থীর মতোই ছিল তাদের আচরণ। স্বাধীন খসরুও একসময় স্বাধীনভাবে অন্য পরিচালকের নাটকে অভিনয় করা শুরু করেন, নিজের ব্যবসা-বাণিজ্যে মনোযোগী হন।

হুমায়ূন আহমেদের ভ্রমণকাহিনি *দেখা না দেখা* পড়তে গিয়ে হঠাৎ এক অধ্যায়ে আমার মামুকে নিয়ে স্যারের লেখা অংশগুলো আমাকে অনেক কৌতূহলী করে তোলে।

২০০৩ সালে সুইজারল্যান্ডে নাটক বানাতে গিয়েছিলেন হুমায়ূন আহমেদ। সে কাহিনি লিখেছিলেন তাঁর ভ্রমণগ্রন্থ *দেখা না দেখায়*। এখানে স্বাধীন খসরুর দুটো বিষয় নিয়ে লেখেন। প্রথম বিষয়টি ছিল সুইস রমণীর সঙ্গে তাঁর প্রেম। এর অংশবিশেষ এ রকম :

> সন্ধ্যাবেলায় দেখি স্বাধীন উসখুস করছে। জানা গেল এক মেয়ে তাকে ডিনারের নিমন্ত্রণ করেছে। রাতে যদি কাজ না করি তাহলে সে ডিনারে যাবে। আমি ডিনারে যাবার অনুমতি দিলাম।
>
> স্বাধীন আবেগমথিত গলায় বলল, আমাদের জন্যে একটু দোয়া করবেন হুমায়ূন ভাই।
>
> আমি বললাম, দোয়া লাগবে কেন?
>
> সে বলল, আমরা বিয়ের কথা চিন্তা করছি। সে শুধু একটা শর্ত দিয়েছে।
>
> কী শর্ত?
>
> পরে আপনাকে বলব।
>
> স্বাধীন ডেটিং-এ চলে গেল। তার চেহারা চোখ-মুখ উদভ্রান্ত।

AMARBOI.COM

প্রেমপর্ব শেষ হলে আসে লটারি প্রসঙ্গ। একটা স্ক্র্যাচ কার্ডে ২০ হাজার ইউরো পাওয়ার কাহিনি। এটার অতি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন হুমায়ূন আহমেদ। পড়ে আমি মুগ্ধ হই। ইচ্ছা আছে কখনো দেখা হলে বিষয়টি মামুর কাছ থেকে জেনে নেব। লটারি জেতার কাহিনিটি এ রকম :

সুইজারল্যান্ডে স্বাধীন খসরু এই কাণ্ড ঘটালেন। কার্ড ঘসার পর যে বস্তু বের হলো তার অর্থ, তিনি বিশ হাজার ইউরো পুরস্কার পেয়েছেন। তাৎক্ষণিকভাবে ইউরো পাওয়া যাচ্ছে না। সেদিন এবং তার পরের দিন ব্যাংক বন্ধ। অফিস টফিসও বন্ধ। আমাদের উত্তেজনার সীমা নেই।

হঠাৎ লাখপতি হয়ে যাওয়ায় স্বাধীন দলছুট হয়ে পড়ল। কেউ তার সঙ্গে ভালোমতো কথা বলে না। সেও আলাদা থাকে। আমাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করে না। নগদ ইউরো খরচ করে রেস্টুরেন্টে খেতে যায়। সঙ্গে থাকে নতুন পাওয়া বান্ধবী। এই বান্ধবী স্বাধীনকে বলেছে, সে যদি সুইজারল্যান্ডে থেকে যায় তাহলে স্বাধীনকে সে বিয়ে করতে রাজি আছে। সুইজারল্যান্ডে থেকে যাওয়া তার জন্যে তেমন কোনো সমস্যা না। কারণ স্বাধীন ব্রিটিশ নাগরিক, তার পিছুটানও নেই। স্বাধীনকে মনে হলো নিমরাজি।

আমি : হ্যালো স্বাধীন!

স্বাধীন : (চুপ)

আমি : কংগ্রেচুলেশনস! বিশ হাজার ইউরো পেয়ে গেলে।

স্বাধীন : থ্যাং-ক য়্যু।

আমি : তারপর কী ঠিক করলে, এই দেশেই সংসার পাতবে?

স্বাধীন : আমার কাছে সব দেশই সমান। বাংলাদেশে জন্ম হলেও জীবন কেটেছে ইংল্যান্ডে।

আমি : দু'দিনের পরিচয়ে একজনকে বিয়ে করে ফেললে পরে সমস্যা হবে না তো?

স্বাধীন : যখন এরেঞ্জ ম্যারেজ হয় তখন তো স্বামী-স্ত্রীর পূর্ব পরিচয় ছাড়াই বিয়ে হয়। তারা সুখী হতে পারলে আমরা কেন হতে পারব না?

আমি : (চুপ)

স্বাধীন : হুমায়ূন ভাই, আমার অনুরোধ—এই বিষয়ে আমাকে আর কিছু বলবেন না।

আমি : বিয়েটা হচ্ছে কবে?

স্বাধীন : একটু দেরি হবে। লাইসেন্স করাতে হবে। আপনারা শুটিং শেষ করে দেশে চলে যান, আমি পরে আসব।

আমি : আরও একটু চিন্তাভাবনা করলে হতো না?

স্বাধীন : চিন্তাভাবনা তো করছি। সারারাতই চিন্তা করি। আগামীকাল সকালে আপনি আমাকে একটু সময় দেবেন? আপনাকে নিয়ে মেয়ের মায়ের

AMARBOI.COM

বাসায় যাব। এখানে আপনি ছাড়া আমার মুরুব্বি কেউ নেই।

আমি : ঠিক আছে যাব।

মেয়ের মায়ের বাড়িতে যাবার আগে আমরা গেলাম স্ক্র্যাচ কার্ড দেখিয়ে বিশ হাজার ইউরো তুলতে। সঙ্গে আছে শাহীন। সে জার্মান ভাষা জানে। আমরা জানি না।

কোম্পানির তরুণী কার্ড উল্টেপাল্টে বলল, হ্যাঁ, তোমরা বিশ হাজার ইউরো পেয়েছ। আমরা তিনজন একসঙ্গে বললাম, থ্যাং ইউ।

তরুণী বলল, তোমরা টাকা পাবে না। কারণ তোমরা কার্ডটা অতিরিক্ত খোঁচাখুঁচি করে নষ্ট করে ফেলেছ। যেখানে স্ক্র্যাচ করার কথা না, সেখানেও করেছ।

শাহীন বলল, তুমি তো খুবই অন্যায় কথা বলছ।

তরুণী বলল, তুমি লইয়ারের কাছে যেতে পারো।

অবশ্যই লইয়ারের কাছে যাব।

আমরা লইয়ারের কাছে গেলাম। তিনি বললেন, মামলা করলে অবশ্যই আমরা জিতব। আমি বললাম, মামলা আমরা অবশ্যই করব।

লইয়ার বলল, আমি দশ হাজার ইউরো ফিস নেব। অর্ধেক এখন দিতে হবে।

মুখ চাওয়া-চাওয়ি করা ছাড়া আমাদের কিছুই করার রইল না। কে দেবে উকিলকে এত টাকা? আর টাকা দিলেই শেষ পর্যন্ত যে আমরা মামলায় জিতব তার গ্যারান্টি কী?

স্বাধীনের দিকে তাকিয়ে আমার খুবই মায়া লাগল। বেচারা এই টাকার আশায় নিজের যা ছিল সব শেষ করেছে। অন্যের কাছে ধারও করেছে।

সব খারাপ জিনিসের একটা ভালো দিক থাকে। লটারির টাকা না পাওয়ার ভালো দিকটা হলো স্বাধীন ঘোষণা করল—এই পচা দেশে থাকার প্রশ্নই ওঠে না। বিয়ে তো অনেক পরের ব্যাপার।

এর অনেক দিন পর স্বাধীন খসরুর সঙ্গে আমার দেখা। আমি বলি, 'মামু, সুইজারল্যান্ডের ওই প্রেমিকা এখন কোথায় আছে?'

মামু ঠা ঠা করে হাসতে থাকেন। বলেন, 'হুমায়ূন ভাইয়ের লেখা আপনি পড়ছেন? ওটা তো পুরাই চাপাবাজি। আমি একদিন ওই মেয়েটার সঙ্গে ব্রেকফাস্ট করেছি মাত্র, জাস্ট এক দিন, নাথিং মোর। এরপর ওই মেয়েটা আমাদের আলোচনায়ও কখনো ছিল না। এর সবই হুমায়ূন ভাইয়ের বানানো। বই ছাপা হওয়ার পর আমি ধরেছিলাম। বললাম, এসব কেন লিখলেন? হুমায়ূন ভাই বলেন, "বোঝো না, আমি তো লেখক মানুষ। ওসব না লিখলে আমার লেখা কেন পড়বে মানুষ? আমি যদি লিখি এক দিন তুমি তার সঙ্গে

AMARBOI.COM

ডিনার খেয়েছ, এটা ইন্টারেস্টিং কিছু হলো না। লেখকদের অনেক কিছু বানিয়ে লিখতে হয়।'"

এটুকু শোনার পর আমি আরও খেপে যাই। মামুকে ছাড়ি না। বলি, 'আপনার ২০ হাজার ইউরো জেতার বিষয়টা কী?'

'ওটা সত্য, মামা। ২০ হাজার ছিল না, ১০ হাজার ইউরো জিতেছিলাম। আমরা যে কাউন্টারে গেলাম, সেখানে মেয়েটা বলল, এত বড় অ্যামাউন্ট আমরা দিতে পারব না, একজন লইয়ার ধরে ক্লেইম করতে হবে, সপ্তা খানেক সময় লাগবে। আমরা সে সময় পাইনি। ইউনিটের সঙ্গে দেশে চলে আসি। ওই শাহীনের কাছে কার্ডটা রাখা ছিল, আমি নিশ্চিত, শাহীন ১০ হাজার ইউরো পরের সপ্তাহেই উঠিয়ে নিয়েছে। স্যারও এটা আমাকে বারবার বলেছেন।'

'কিন্তু, তাহলে যে ওই ঘটনাগুলো, সংলাপ, নানা নাটকীয় পরিস্থিতি?'

'এগুলো মামা, সব হুমায়ূন ভাইয়ের বানানো, হা হা হা। হুমায়ূন ভাই চাইতেন মানুষকে যতটা আনন্দ দেওয়া যায়। এ জন্য যদি আমাকে বলির পাঠাও করতে হয়, সমস্যা নেই। মামা, আমরা হুমায়ূন ভাইয়ের এই ব্যাপারটাকেই অনেক বেশি পছন্দ করতাম। এ জন্যই তো এ মানুষটার জন্য লন্ডন ছেড়ে চলে এলাম।'

AMARBOI.COM



অন্তরঙ্গ পর্বের সূচনা

২০০৮ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি। কমলের ছেলের জন্মদিনের অনুষ্ঠানে দাওয়াত না পেলে সম্ভবত ব্যক্তি হুমায়ূন আহমেদ আমার কাছে চিরদিনের জন্য অচেনাই থেকে যেতেন।

আমি *ক্লাস সেভেন ১৯৭৮* নামে একটা বই লিখেছি। আমার ছোটবেলার গল্প। সিলেটের এক গ্রাম থেকে কী করে দেশের সবচেয়ে নামকরা ক্যাডেট কলেজে সুযোগ পেলাম এবং ওখানকার সব ব্রিলিয়ান্ট আর স্মার্ট ছেলেদের সঙ্গে পরিচিত হতে হতে এক বছরে কী করে অভিযোজিত হলাম, তার গল্পই ছিল এই আত্মজৈবনিক বইয়ে। অন্যপ্রকাশ থেকে প্রকাশিত বইটির প্রকাশনা অনুষ্ঠান হয় ঢাকার এক বড় হোটেলে। আমি মনে মনে চাই, বইটা কোনোভাবে যেন হুমায়ূন আহমেদের হাতে পৌঁছায়।

মাজহারুল ইসলামের ব্যবসায়িক অংশীদারের সঙ্গেও আমার দু-একবার দেখা হয়েছে। তেমন আলাপ হয়নি। একজনের নাম শুনলাম কমল। হুমায়ূন আহমেদের অসংখ্য এক পর্বের কমেডি নাটকে তাঁকে দেখেছি। তখন জানতাম না তিনি অন্যপ্রকাশের একজন পার্টনার। একদিন তিনি ফোন করে আমাকে বলেন, ধানমন্ডির ডব্লিউভিএ মিলনায়তনে তাঁর ছেলের জন্মদিন, আমি যেন আসি। আমি বলি, জি কমলদা, অবশ্যই আসব।

আমি ভেবেছি, তিনি সম্ভবত হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক। আমার ভুলটা বুঝতে পেরে তিনি বলেন, 'আমার নাম কিন্তু সিরাজুল কবির চৌধুরী। আমি হিন্দু না।'

লজ্জা পেয়ে যাই। অনুষ্ঠানে হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে, এই আশায় রাত ১০টার দিকে আমি গিয়ে হাজির হই। দেখি, সত্যি সত্যি হুমায়ূন আহমেদ তাঁর শিশুপুত্র নিষাদকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে। পাশে মেহের আফরোজ শাওন।

শাওনকে আমি প্রথম দেখি এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটির নবীনবরণ অনুষ্ঠানে, ২০০৩ বা ২০০৪ সালে। আমি তখন ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস বাংলাদেশের কার্যকরী পরিষদের সংস্কৃতিবিষয়ক সদস্য। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের নবীনবরণ ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা ছিল। সেখানে গান গাইতে ডাকা হয় তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী মেহের আফরোজ শাওনকে। শাওন এসে মাইকের সামনে দাঁড়ালেন এবং খালি গলায় গাইলেন মৌসুমী ভৌমিকের বিখ্যাত সেই গান, 'আমি শুনেছি সেদিন তুমি/ সাগরের ঢেউয়ে চেপে নীল জল দিগন্ত ছুঁয়ে এসেছো...।' গান শেষে হলভর্তি লোকের হাততালি। শাওন ধীরে ধীরে স্টেজ থেকে নেমে একেবারেই হলরুমের বাইরে চলে গেলেন। ডানে-বাঁয়ে কোনো দিকে তাকালেন না। আমি টের পেলাম, অনেকগুলো কৌতূহলী চোখ শাওনকে প্যান করে দেখছে। এর আগে পত্রপত্রিকায় শাওনের সংবাদ পড়েছি। কিছু কিছু শুনেছি মানুষের মুখে। এসব রটনার শুরু *বহুব্রীহির* সময়ে। শুরুটা হয়েছিল দীপা ইসলামকে দিয়ে। তারপর হোসনে আরা পুতুল, দিহান—এসব শৌখিন কিশোরী অভিনেত্রীর নামেও রটনা চলে। এর মধ্যে অনেক প্রতিষ্ঠিত তরুণী অভিনেত্রীর নামও আসে। সত্য-মিথ্যা আমি জানি না। সব নাম একে একে বিলীন হতে থাকে। সেই সব প্রতিষ্ঠিত অভিনেত্রীকে হুমায়ূন আহমেদের নাটক-সিনেমায় আর অভিনয় করতে দেখা যায় না। একসময় শাওনের নামটি প্রায় স্থায়ীভাবেই যুক্ত হয়ে যায় হুমায়ূন আহমেদের নামের সঙ্গে। এ নিয়ে গৃহবিবাদের সংবাদ ছাপা হয়। একসময় অবসান হয় এসবের। ২০০৪ সালের

AMARBOI.COM

১০ জুন লালমাটিয়ার কাজি অফিসে তালাকনামায় স্বাক্ষর করে প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে ২৯ বছরের দাম্পত্য জীবনের ইতি টানেন হুমায়ূন আহমেদ। ১২ ডিসেম্বর বিয়ে করেন মেহের আফরোজ শাওনকে।

শাওন হুমায়ূনকন্যা শীলার বন্ধু। *আজ রবিবার* ধারাবাহিকটির সময় এ বন্ধুত্ব হয়। এ নাটকে তাঁরা দুই বোনের চরিত্রে অভিনয় করেন। ছোট বোন শীলা, বড় বোন শাওন। তাঁরা বন্ধু হলেও সতীর্থ ছিলেন না। শীলা পড়তেন হলিক্রসে, শাওন ভিকারুননিসা নূনে। শাওন শীলার দুই ক্লাস সিনিয়র। বয়সের তারতম্য থাকলেও নাটক করতে গিয়ে তাঁদের মধ্যে ভালো বন্ধুত্ব তৈরি হয়। অনেক সময় শীলাদের বাড়িতে শাওন থাকতেনও।

মনে পড়ে, হুমায়ূন আহমেদের বিয়ের ঘটনাটি সে সময়কার সংবাদমাধ্যমগুলো খুব ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। প্রথম স্ত্রীর পক্ষ নিয়ে নানা রকম সংবাদ ছাপা হতে থাকে। সাংবাদিকেরা তাঁদের সাক্ষাৎকার নিতে ব্যর্থ হন; তাঁর প্রাক্তন স্ত্রীও মুখ খুলছেন না। সাংবাদিকেরা হুমায়ূন আহমেদের মা ও ভাইবোনদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য তাঁদের বাড়িতে গিয়ে হাজিরা দিতে থাকেন। এ সময় দৈনিক পত্রিকার প্রথম পাতায় প্রকাশিত হয় হুমায়ূন আহমেদের একটি ছোট্ট বিবৃতি। বিবৃতিতে তিনি তাঁর পরিবারের লোকজনদের হয়রানি না করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে লিখেছিলেন, 'ভুল না হয় আমিই করেছি, আমার পরিবার তো নয়।'

বেশ কয়েক দিন নানা রকমের মুখরোচক সংবাদের শিরোনাম হতে থাকেন হুমায়ূন আহমেদ ও তাঁর পরিবার। একসময় ঠান্ডা হয় সবকিছু। হুমায়ূন আহমেদ শাওনকে নিয়ে দখিন হাওয়ায় সংসার পাতেন; তাঁর ছেলেমেয়েরা বসবাস করতে থাকেন মায়ের সঙ্গে, ধানমন্ডির ১০/এ-র বাড়িতে।

এরপর হুমায়ূন আহমেদ সংবাদকর্মীদের এড়িয়ে চলা শুরু করেন। থাকেন তাঁর একান্ত নিজস্ব পরিমণ্ডলে। নিজেকে 'গর্তজীবী' হিসেবে আখ্যা দিয়ে তাঁর একান্ত পছন্দের কিছু মানুষজনকে নিয়েই তাঁর ওঠাবসা। লেখা ছাপানো, বই ছাপানো, নাটক প্রচার ও বিক্রি করা। এসবের বাইরে সংবাদমাধ্যম বা অন্য কোনো পেশার মানুষজনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ থাকে না। দেশের বাইরে বেড়াতে গেলেও প্রায় নিশ্চিত থাকতে চান যে, দেশি-বিদেশি সাংবাদিকেরা যেন তাঁর কাছে না আসে। বাঙালিদের পাড়াও এড়িয়ে থাকতে চান। দেশের মধ্যে কোনো সভা-সমিতি-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, টেলিভিশনের টক শো—কোনো কিছুতেই তাঁকে কেউ পায় না। একান্ত নিজের মানুষদের কিছু অনুষ্ঠানে যান, সেটা কোনো বুটিক হাউসের ফিতা কাটার অনুষ্ঠান হলেও। সেরকম কাছের

AMARBOI.COM

লোক বলেই আজকের এই জন্মদিনের অনুষ্ঠানে এসেছেন। আমার কপাল, একই অনুষ্ঠানে আমিও আমন্ত্রিত। আমাদের যোগাযোগটা হয়ে যায়।

পরিচয়ের শুরুটা হলো একটা বড় ভুলের মাধ্যমে। আমাকে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে মাজহার বললেন, 'ইনি শাকুর মজিদ, নাট্যকার। আমরা এবার ওনার একটা বই করেছি।' সঙ্গে সঙ্গে হুমায়ূন আহমেদ বলে বসেন, 'আরে ওকে তো আমি চিনি, সে চমৎকার হাসির নাটক লিখতে পারে।' স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে সবাইকে নীরব করে দিয়ে তিনি আরও বলেন, 'ওর ভাই একজন বিশিষ্ট শিশুচিকিৎসক। আমার ছেলে নিষাদ তার কাছেই চিকিৎসা নেয়।'

অন্য লোকের সঙ্গে আমাকে তিনি গুলিয়ে ফেলেছেন। এখন এত লোকের মধ্যে তাঁর এই ভুল ধরিয়ে দিলে তিনি নিশ্চয়ই খুব বিব্রত হবেন। কী করব বুঝতে পারি না। একসময় আস্তে আস্তে তাঁর কানের কাছে গিয়ে বললাম, 'স্যার, আমার ভাইয়েরা তো বিলেতে থাকে এবং তাদের কেউ ডাক্তার নয়।' তিনি একটু থামলেন, কিন্তু আমার হাত ছাড়লেন না। বললেন, 'কিন্তু তুমি তো নাটক লেখো, আমি তোমার স্ক্রিপ্ট পড়েছি।'

বলতে পারতাম, 'স্যার, নাটক লিখেছি কয়েকটা, কিন্তু আমার স্ক্রিপ্ট তো আপনার কাছে পৌঁছানোর কথা নয়।' কিন্তু এর মধ্যে মাজহার সাহেব আমাকে প্রায় উদ্ধার করে বলেন, 'স্যার, উনি একটা চমৎকার বই লিখেছেন, এবার আমরা মেলায় এনেছি।'

'কিসের ওপর?' হুমায়ূন আহমেদ প্রশ্ন করেন মাজহারকে।

'ক্যাডেট কলেজের ছেলেদের প্রথম বছরের কাহিনি, স্যার।'

'ইন্টারেস্টিং। বইটা দিয়ো তো আমাকে, পড়ব।'

'স্যার, আজই আপনার বাসায় পৌঁছে দেব।'

আমি আর বেশি সময় নষ্ট না করে দ্রুত বিদায় হই। বাসায় যাওয়ার পথে ধানমন্ডি ৩-এর এ-তে দখিন হাওয়ার ফ্ল্যাটের দারোয়ানের কাছে এক কপি *ক্লাস সেভেন ১৯৭৮* রেখে বাসায় চলে যাই।

গল্প এখানেই শেষ হয়ে যেতে পারত। কিন্তু হলো না। নতুন গল্প শুরু হলো পরদিন একটা এসএমএস দেখে।

'হুমায়ূন আহমেদ আপনার বইটি পড়েছেন। তিনি কথা বলতে চান। প্লিজ (মোবাইল নাম্বার) নাম্বারে ফোন করুন—মাজহার'

বলে কী! বিষয়টা বুঝে উঠতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগে। তারপর ফোন করার পালা। আমি ফোন করি, ফোন বন্ধ; আমি ফোন করি, নো আনসার।

আমার ধৈর্য থাকে না। ব্যাপারটা মাজহার সাহেবকে জানাই। আধা ঘণ্টা

AMARBOI.COM

পর মাজহার সাহেবের নাম্বার থেকে ফোন আসে, মাজহার বলেন, 'এই নিন, স্যার কথা বলবেন।'

হুমায়ূন আহমেদ একতরফা অনেক কথা বলে যান। এ কী! আমার লেখার এত প্রশংসা! আমি অভিভূত আর মুগ্ধ। একসময় বলেই বসলেন, বাংলা ভাষায় হোস্টেল লাইফ নিয়ে এর আগে এত ভালো কোনো লেখা হয়েছে বলে তিনি মনে করেন না। দু-একটা ত্রুটির কথাও বললেন এবং শেষ কথা, 'ইউ হ্যাভ ডান আ গুড জব। তুমি ফিকশন লিখলে ভালো করবে বলে আমার ধারণা। কিপ ইট আপ।'

ফোনের আলাপ শেষ হয়। মনের ভেতর উসখুস করতে থাকে। স্যারের এ কথাগুলো যদি অন্য কাউকে শোনাতে পারতাম! আচ্ছা, স্যারকে কেন বললাম না যে, আপনি কি এ কথাগুলো একটু লিখে দেবেন? কোথাও রিভিউ হিসেবে ছাপা হতো!

আমি তো কথাগুলো মোবাইল ফোনে রেকর্ডও করে নিতে পারতাম! কেন যে মাথায় এল না!

কয়েক ঘণ্টা পর আমি মাজহার সাহেবকে ফোন করে ধন্যবাদ জানাই সবকিছুর জন্য।

মাজহার সাহেব আমাকে বলেন, 'স্যার কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর নতুন ছবি *আমার আছে জল*-এর শুটিংয়ের জন্য সিলেট যাবেন। ফিরে আসবেন সপ্তা দুই পর। এলে আপনার সঙ্গে আরেক দিন আলাপ করিয়ে দেব। দেখবেন, স্যার কত মজার মানুষ।'

কয়েক দিন পর মাজহারুল ইসলামের ফোন—'আমরা কাল সিলেট যাচ্ছি স্যারের শুটিংয়ে। স্যার বললেন আপনাকেও নিয়ে যেতে, যাবেন নাকি?'

মাজহার সাহেবকে বলি, 'ভাই, আমিও তো সিলেটে, পরশু ফিরব ঢাকায়, আপনারা কোথায় থাকবেন?'

'কুলাউড়ার কাছে সিআরপির একটা গেস্টহাউস আছে, পাহাড়ের ওপর। চিনতে সমস্যা হলে ফোন দিয়েন। আপনি এলে স্যার খুশি হবেন, আপনার কথা বলেছেন স্যার।'

অনেক সংগ্রাম করে, অনেক কিছু ম্যানেজ করে, ঢাকা যাওয়া এক দিন পিছিয়ে আমি এক বিকেলে ওই গেস্টহাউসে হাজির হই। গেস্টহাউসের ড্রয়িংরুমে বসে তাস পেটাচ্ছেন নায়ক ফেরদৌস, জাহিদ হাসান, প্রকাশক মাজহারুল ইসলাম, কমল আর হুমায়ূন আহমেদ। পাশে বসা ক্যামেরাম্যান মাহফুজুর রহমান।

AMARBOI.COM

আমি ভেতরে ঢুকলাম। সালাম বিনিময়ের পরই হুমায়ূন আহমেদের প্রথম প্রশ্ন, 'তুমি এটা জানো?'

'জি স্যার।'

'বসে পড়ো। এই, শাকুরকে তাস দাও।'

ব্যস, শুরু হয়ে যায় আরেকটি অধ্যায়।

সন্ধ্যা পর্যন্ত চলল এসব। সন্ধ্যার পর একটা গানের দৃশ্য চিত্রায়িত হবে। এ অংশটুকুর পরিচালক মেহের আফরোজ শাওন। *আমার আছে জল*-এর দুই নায়িকার বড় নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করা ছাড়াও এ ছবির কোরিওগ্রাফার তিনি। সেটেই আমার সঙ্গে দেখা। আমি আপনি আপনি করে কথা বলি। শাওন বলে, 'শাকুর ভাই, আমি আপনাকে চিনি। আপনি একজন সিনিয়র আর্কিটেক্ট। আমি আর্কিটেকচারে পড়ছি এখনো, প্লিজ আমাকে "আপনি" বলবেন না। আপনার বইটাও পড়েছি, আমার খুব ভালো লেগেছে।'

আমাকে যথেষ্ট খাতির করা হয় সেটে। হুমায়ূন আহমেদ তাঁর পাশের একটা চেয়ারে আমাকে বসতে দেন। অনেকক্ষণ ধরে আমরা একটা শট নেওয়া দেখি।

রাতে হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে আমরা খেতে বসেছি। হুমায়ূন আহমেদ, শাওন, মাজহার, কমল আর দুই নায়ক। একসময় কোনো এক শিশুশিল্পীর কস্টিউমের বিষয় নিয়ে ছবির পরিচালক হুমায়ূন আহমেদ আর কোরিওগ্রাফার শাওনের মধ্যে কথা-কাটাকাটি শুরু হয়ে গেল।

সময় যত যাচ্ছে, উভয় পক্ষের গলার স্বর উচ্চ হতে উচ্চতর হতে থাকে। একসময় দেখি, খাওয়া শেষ হয়ে যাচ্ছে সবার। প্লেটে কিছু খাবার রেখেই হুমায়ূন আহমেদ উঠে চলে যান।

খুবই অস্বস্তিকর অবস্থা। এখানে আমি ছাড়া বাদবাকি সবাই তাঁর পূর্বপরিচিত এবং অতিঘনিষ্ঠ। আমার সঙ্গে সে অর্থে কেউই তেমন পরিচিত নন। আমার কী করা উচিত বুঝতে পারি না।

আমার ড্রাইভারের খাওয়া হয়ে গেছে। আমি চাইলেই এখন ঢাকার পথে রওনা হতে পারি। কিন্তু বেরিয়ে যাওয়া কি শোভন হবে? স্যারের সঙ্গে কথা বলব, সে সুযোগও নেই। তিনি তাঁর ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন।

পরদিন বেশ বেলা করে ঘুম ভাঙল আমার। ঘুম থেকে উঠে দেখি, সব ঠিকঠাক। পরিচালক শুটিং স্পটে, কোরিওগ্রাফারও গেছেন, জাহিদ হাসান আর বিন্দুর কাজ হচ্ছে।

আমি গেস্টহাউসের সামনের একটা কংক্রিটের ছাতার নিচে গিয়ে বসে থাকি। কিছুক্ষণ পরই দেখি ইউনিটের প্রোডাকশন বয় আমার জন্য নাশতা

AMARBOI.COM

নিয়ে এসেছে। বেলা তখন বারোটা প্রায়। এ সময় একটা জিপ এসে থামল আমার কাছে। জিপ থেকে নেমেছেন হুমায়ূন আহমেদ। তাঁর মাথায় হ্যাট। নেমে এসে সরাসরি আমার মুখোমুখি চেয়ারে বসে পড়েন এবং আমাকে মুগ্ধ করে বলেন, 'তুমি কিছুক্ষণ পরই চলে যাবে শুনলাম। এ জন্য ক্যামেরাম্যানকে শট বুঝিয়ে দিয়ে চলে এসেছি। বলো, হাও ইজ লাইফ?'

'লাইফ ইজ বিউটিফুল, স্যার।'

তারপর একে একে চা আসে, কফি আসে। দুপুর বারোটায় বসেছিলাম, চারটে বাজে। দুপুরের খাবার খেতে ইউনিট আসে বাংলোয়, আমাদের আড্ডা ভেঙে যায়।

এই চার ঘণ্টার আড্ডায় উঠে আসে ব্ল্যাকহোল থিওরি, মিসির আলী, হিমু, কোরআন শরিফ, মোহাম্মদ (সা.), আমার দেশভ্রমণ ও ট্রাভেল ডকুমেন্টারি, সক্রেটিস, শেক্সপিয়ার, পাবলো নেরুদা, চিলিসহ নানা প্রসঙ্গ। একসময় আলোচনায় আসেন তাঁর প্রাক্তন ও বর্তমান স্ত্রীও। বেশ কিছু দুঃখবোধ, বেশ কিছু কষ্ট, অপমান ও নিগৃহীত হওয়ার একান্ত পারিবারিক বিষয়ের গল্প। হঠাৎ আমার মনে হলো, তিনি যেন অনেক দিন পর পুরোনো কোনো বন্ধুকে পেয়েছেন। মনের কত কথাই-না জমানো ছিল, একে একে সব নিংড়ে দিচ্ছেন। আমার কেন যেন একবারও মনে হলো না যে আমি এই মুগ্ধকরের কিঞ্চিৎ সান্নিধ্যলাভের আশায় কতই-না ব্যাকুল ছিলাম, সে আমি কেমন যেন হঠাৎ তাঁকে পেয়ে যাই একেবারেই আমার সমান মাত্রায়, আমার আর দশটা ঘনিষ্ঠ সিনিয়র বন্ধু যেমন, ঠিক তেমনি।

AMARBOI.COM

বিকেলের খাওয়া শেষ হতে হতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। আমার ঢাকায় ফেরার কথা। স্যার চাপাচাপি করছেন থেকে যেতে। আমি থাকতেও পারি, কিন্তু মাজহার ভাইদের আজ যেতেই হবে ঢাকায়। সুতরাং আমরা গাড়িতে উঠি।

মাজহার সাহেব হঠাৎ বললেন, 'কাল রাতে কমল সাহেবের তেমন ভালো ঘুম হয়নি। তিনি গাড়িতে আরাম করে ঘুমাতে পছন্দ করেন। ঘুমের সময় অনেক আরাম করে, অনেক উঁচু স্বরে নাকডাকেন তিনি।' সুতরাং তাঁকে আরাম করে নাকডাকার সুযোগ দিতে মাজহার সাহেব আমার গাড়িতে সওয়ার হলেন। আমরা ঢাকার পথে রওনা দিই।

মাজহারুল ইসলামের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না। ১৯৯৮ বা '৯৯ সালের দিকে বাজারে *অন্যদিন*-এর ঈদসংখ্যাটি দেখে আমি মুগ্ধ হই। তাতে পশ্চিম বাংলার লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদারের লেখা এবং

বাংলাদেশের সব নামকরা লেখকদের লেখা ছাপা হয়েছে। অনেক মোটা এবং সুন্দর। এরপর দেখি প্রচ্ছদে হুমায়ূন আহমেদের ছবি দিয়ে পাক্ষিক *অন্যদিন*-এর একটি সংখ্যাও বেরিয়েছে।

দেশের শিল্প-সাহিত্য নিয়ে এমন পত্রিকা খুব একটা চোখে পড়ে না। এর আগে আমরা *বিচিত্রা-রোববার-সন্ধানী*-নির্ভর ছিলাম। কিন্তু তিনটি পত্রিকাই আর আসল চেহারায় নেই।

অন্যদিন পত্রিকার একটা প্রকাশনা সংস্থাও হয়েছে। নাম অন্যপ্রকাশ। এরা হুমায়ূন আহমেদের বই ছাপে বেশি। বইমেলায় ওদের স্টল দেখে ভিরমি খাওয়ার মতো অবস্থা। ওদের স্টলে হুমায়ূন আহমেদ এসে বসেন, ক্রেতাদের লম্বা লাইন পড়ে বই কেনা আর অটোগ্রাফ নেওয়ার জন্য। ২০০৬ সালে একবার পত্রিকায় খবর পড়লাম, ভক্তদের ভিড় থেকে হুমায়ূন আহমেদকে রক্ষা করতে পুলিশ স্কট করে তাঁকে বইমেলা থেকে বের করে নিয়ে এসেছে।

২০০৭ সালে তাঁর *হিমু*-বিষয়ক একটা বই ছেপেছে অন্যপ্রকাশ, নাম *হলুদ হিমু, কালো র‍্যাব*। বইটার চরিত্রের সঙ্গে মিল রেখে কতগুলো তরুণ হলুদ পাঞ্জাবি পরে খালি পায়ে দল বেঁধে বইমেলায় হাঁটাহাঁটি শুরু করল। কালো পোশাক পরা র‍্যাবের সাজেও সাজানো হলো কয়েকজনকে। এটা নিশ্চয়ই কোনো বাণিজ্যিক স্ট্যান্টবাজি। সফলও হলো এই উদ্যোগ। *আজ হিমুর বিয়ে* যেদিন বেরোলও সেদিন দেখি বইয়ের চরিত্রগুলোর মডেল সশরীরে মেলার আয়োজনের মধ্যে ঢুকে গেছে। সারা বইমেলা প্রান্তরই হিমুময়, হুমায়ূনময়। এর পেছনে রয়েছে অন্যপ্রকাশ।

AMARBOI.COM

২০০৬ বা ২০০৭ সালের দিকে একবার দেখি বাংলা একাডেমীর পরিচালক মুহম্মদ নুরুল হুদা বর্তমান যে নজরুল মঞ্চ, সেখানে একাডেমীর কয়েকজন সহকর্মী নিয়ে এ বিষয়ে কথা বলছেন। হলুদ পাঞ্জাবি পরা তরুণদের মৌন মিছিলের কারণে মেলার মধ্যে অতি উৎসাহী লোকজনের চাঞ্চল্য বেড়ে গেছে। কবি নুরুল হুদা প্রায় চিৎকার করে বলছেন, 'ওরা এসব কী শুরু করেছে? যাও, বন্ধ করে দিয়ে আসো।'

এসব কারণে আমারও ইচ্ছে হলো, আমার বইটা যদি সম্ভব হয় অন্যপ্রকাশ থেকেই বের করার চেষ্টা করব।

ক্লাস সেভেন ১৯৭৮ বইটি আমি লিখতে শুরু করি ২০০৬ সালে। ২০০৮ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পাণ্ডুলিপির কম্পোজ শেষ হয়ে যায়। ছাপার জন্য আমি অস্থির হয়ে পড়ি। এক মাস পরই বইমেলা। বাংলাদেশের কোনো প্রকাশকের সঙ্গে আমার খাতির নেই। পরিচয় আছে

এক-দুজনের সঙ্গে। সবচেয়ে বড় প্রকাশক হিসেবে মাথায় এল অন্যপ্রকাশের কথা। কিন্তু ওদের কাউকেই তো চিনি না। জানি, অভিনেতা মাহফুজের সঙ্গে তাদের খুব ভাব। আমি মাহফুজকে একটা টেক্সট ম্যাসেজ পাঠাই. মাজহারুল ইসলাম সাহেবের নম্বরের জন্য।

মাহফুজ আমার ভালো বন্ধু। মাহফুজের কাছ থেকে মাজহার সাহেবের নাম্বার পেতে সময় লাগল না। আমি অন্যপ্রকাশের প্রধান নির্বাহী মহোদয়কে আমার উদ্দেশ্য জানিয়ে একটা টেক্সট ম্যাসেজ পাঠাই। জানাই, কাল আমি এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই। তাঁর ই-মেইলে আমি পুরো পাণ্ডুলিপিটি পাঠাই। ঠিক হয় পরদিন দুপুর একটায় তাঁর অফিসে আমাদের দেখা হবে।

পরদিন আমাদের দেখা হয়, কথা হয়। জানুয়ারি মাসেই বইটি বেরিয়ে যায়। আমার বন্ধু মোসলেহ প্রকাশনা উৎসবের জন্য অস্থির হয়ে পড়ে। ওল্ড ফৌজিয়ানস অ্যাসোসিয়েশনের ঢাকা চ্যাপ্টার উদ্যোগ নিয়ে শেরাটন হোটেলে এর আয়োজন করে ২০০৮ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার জন্য তারা অধ্যাপক আনিসুজ্জামানকে রাজি করায়। আমার চেনা অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ও ঔপন্যাসিক ইমদাদুল হক মিলনকে আমি দাওয়াত দিই। শহীদ মুনীর চৌধুরীর ছোট ভাই আমার ক্যাডেট কলেজের শিক্ষক আ. ত. ম. নাসির চৌধুরীসহ বেশ কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন। *প্রথম আলোর* সংস্কৃতি পাতায় তিন কলামে বেশ বড় একটা রিপোর্টও ছাপা হয়। আমি খুশিতে ভাসতে থাকি।

মাঝে মাঝে বইমেলায় যাই। অন্যপ্রকাশের স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে দেখি, অসংখ্য ক্রেতা। সবার হাতে হুমায়ূন আহমেদের বই *হিমু* বা *মিসির আলী*। নতুন লেখকদের বই এত বিক্রি হয় না। আমার বইটা প্রতিদিনই পাঁচ-ছয়টা যাচ্ছে। আমি এতেই মহা খুশি।

এর মধ্যে ১৮ ফেব্রুয়ারি কমলের ছেলের প্রথম জন্মদিনের অনুষ্ঠানে হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে দেখা হওয়ার ঘটনা আমাকে টেনে নিল তাঁর শুটিং স্পটে। সেই ছবির শুটিং লোকেশন থেকে আজ আমরা ফিরে আসছি। অন্যপ্রকাশের প্রধান নির্বাহী আজ আমার বেশ ঘনিষ্ঠ।

আমরা গাড়িতে অনেক কথা বলি। *অন্যদিন*, অন্যপ্রকাশ, হুমায়ূন আহমেদ—এসব নিয়েই আমাদের আলোচনা।

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কোচিং ও গাইড প্রকাশনা দিয়ে শুরু হয়েছিল তাঁদের যাত্রা। পজিট্রন কোচিং সেন্টার, পজিট্রন ভর্তি-গাইড। একসময় তাঁদের দুই বন্ধুর সঙ্গে সংযুক্ত হয় সিরাজুল কবির চৌধুরী কমল। এখনো সেই তিনজনই

AMARBOI.COM

ব্যবসাগুলো চালিয়ে যাচ্ছেন। কঠিন সত্য হলো হুমায়ূন আহমেদের বইকে কেন্দ্র করেই তাঁদের এই সৃজনশীল প্রকাশনা জগতের প্রধান সব কাজ।

মাজহারুল ইসলাম বলেন, ১৯৯৮ সালে তাঁরা যখন ঠিক করলেন বই প্রকাশনায় যাবেন, তখন সিদ্ধান্ত নিলেন, যে করেই হোক হুমায়ূন আহমেদের বই দিয়ে শুরু হবে তাঁদের যাত্রা।

হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ করিয়ে দেন বর্তমান চ্যানেল আই-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরিদুর রেজা সাগর। সেই সূত্র ধরে তাঁরা একবার হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে পাক্ষিক *অন্যদিন*-এ একটা প্রচ্ছদকাহিনি করেন। তাঁর ইন্টারভিউ নিতে *অন্যদিন*-এর সম্পাদক ও প্রধান সম্পাদক হাজির হন। অজানা কারণে পরিচয় গোপন করে ক্যামেরাম্যানের কাজ করেন সম্পাদক নিজেই। কারণ, সম্পাদক নিজেই সাক্ষাৎকারের জন্য ছবি তুলতে এসেছেন, এটা জানলে হুমায়ূন আহমেদ বেঁকে বসতে পারেন, এ আশঙ্কায় তাঁরা নাম-পরিচয় গোপন রাখেন।

কিছুদিন পর লেখক মঈনুল আহসান সাবেরের মাধ্যমে এই দুই সম্পাদক হুমায়ূন আহমেদের কাছে একটা উপন্যাস চান তাঁদের নতুন প্রকাশনা সংস্থার জন্য। সাবের জানান, নগদ ১০ লাখ টাকা দিলে হুমায়ূন উপন্যাস দেবেন। ১৯৯৮ সালে এত টাকা দিয়ে কোনো প্রকাশক উপন্যাস চাওয়ার কথা চিন্তা করেননি। কিন্তু লেখককে ঠিক তত্ত্বেও মুগ্ধ করেই তাঁরা এক দিন পর মঈনুল আহসান সাবেরকে সঙ্গে নিয়ে ১০ লাখ টাকার বস্তাসহ হাজির হন হুমায়ূন আহমেদের নুহাশ চলচ্চিত্রের অফিসে।

কড়কড়ে নতুন টাকার গন্ধ হুমায়ূন আহমেদের খুব পছন্দ, চেক গ্রহণে মজা পান না। তিনি বস্তাটি খুলে নগদ টাকা দেখে মুগ্ধ হন এবং বলেন, 'আমি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে তোমরা অনেক বুদ্ধিমান এবং তোমাদের দিয়ে এই ব্যবসা হবে।' এভাবে অন্যদিনের সঙ্গে যুক্ত হয় অন্যপ্রকাশ, যুক্ত হন হুমায়ূন আহমেদ। তারপর কত কথা, কত স্মৃতি, কত গান।

সিলেট-ঢাকা সড়কের পাশে কয়েকটা হাইওয়ে রেস্টুরেন্ট হয়েছে। তার একটিতে আমরা কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে আবার রওনা দিই ঢাকার পথে। পাঁচ-ছয় ঘণ্টার পথ। আমরা প্রাণ খুলে নিজেদের কথা বলি। একসময় লক্ষ করি, অন্যপ্রকাশের প্রধান দুই পার্টনার আমারই বয়সী। আমাদের মধ্যে আরও একটি বিষয়ের যোগসূত্র স্থাপিত হয়। টের পাই, আমার মধ্যে তাঁরা দুজন তাঁদের দুই স্বপ্নকে খুঁজে পান। মাজহারুল ইসলাম বলেন, 'আপনি যে বছর ক্যাডেট কলেজে ভর্তি পরীক্ষা দেন, সে বছর আমিও দিয়েছিলাম।

AMARBOI.COM

রিটেনে টিকেছি, ভাইভাতে আউট হয়ে যাই। আমাদের বাসা ছিল রাজশাহীর সারদা পুলিশ একাডেমির কাছে। বন্ধুদের সূত্রে বিভিন্ন সময় ওই কলেজ ক্যাম্পাসে প্যারেন্টস ডে-তে গিয়েছি, কালচারাল প্রোগ্রাম দেখেছি। একসময় আমারও লোভ হয়েছিল ওখানে ভর্তি হওয়ার। আলটিমেটলি আর হলো না।'

তার অপর পার্টনার মাসুম রহমানের ডিজাইনে হাত ছিল ভালো। আমাদের সঙ্গে আর্কিটেকচারে ভর্তি পরীক্ষাও দিয়েছিল প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে। ওয়েটিং লিস্টে ১৩ ছিল তার অবস্থান। ১২ জন সুযোগ পেয়েছিল, আর একজন পেলে সে হতো মাসুম রহমান।

এদের দুজনই এই দুই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আমার সহপাঠী হতে পারত। সেটা হয়নি, কিন্তু প্রকৃতি তার আপন নিয়মে মাঝে মাঝে তার উপাদানগুলোর মধ্যে একটা সংযোগ ঘটিয়ে দেয়। এই সত্য আবিষ্কার করার পর আমাদের পারস্পরিক সম্বোধনে পরিবর্তন আসতে থাকে। 'মাজহার ভাই' বা 'শাকুর ভাই' থেকে অকস্মাৎ বাড়তি অংশটুকু খসে পড়ে। আমরা বন্ধু হয়ে যাই।

AMARBOI.COM

ঢাকায় ফিরে অফিসের কাজে ব্যস্ত হয় যাই। এর মধ্যে এক সন্ধ্যায় মাজহারের ফোন। মাজহার টেলিফোনে রসিয়ে রসিয়ে কথা বলে। অনেক সময় নাটক করারও চেষ্টা করে। বলে, 'বাংলা সাহিত্যের কিংবদন্তি লেখক আগামীকাল সন্ধ্যায় আরেকজন বিশিষ্ট লেখককে সস্ত্রীক তাঁর দখিন হাওয়ার বাসায় নৈশভোজের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তিনি আশা করেন যে বিশিষ্ট লেখক এ দাওয়াত গ্রহণ করবেন এবং সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার মধ্যে এসে যাবেন।'

আমি ঠিক সময়ে তার ফ্ল্যাটে গিয়ে হাজিরা দিই।

দখিন হাওয়ার ছয়তলার ফ্ল্যাটে এসে দেখি অন্য রকমের পরিবেশ। সপ্তাহ খানেক আগে কুলাউড়ার সিআরপি গেস্টহাউসে যে দম্পতিকে যুদ্ধংদেহীরূপে দেখে এসেছি, আজ তাঁরা কপোত-কপোতীর মতো পাশাপাশি বসে। বসার আয়োজনটিও অন্য রকম। ফ্লোরের ওপর মাদুর বিছানো এবং নানা রকমের খাবার রাখা।

মাজহার, মাসুম, কমলও উপস্থিত। আছেন আলমগীর ভাইও। আমাকে দেখে স্যারের প্রথম প্রশ্ন, 'তোমার বউ আনোনি কেন?'

আমি একটু জিরিয়ে নিয়ে বললাম, 'স্যার, আমার ওয়াইফ আপনাকে পছন্দ করেন না।'

হুমায়ূন আহমেদ একটু কষ্ট করে হাসলেন। মুখে বললেন, 'ও।'

তারপর আড্ডায় মন দেন।

আড্ডার লোকজন সব চলে আসার পর মূলত শাওনই বলে, 'আসলে আমরা দুজনই খুব সরি। আপনার সামনেই সেদিন আমরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি করেছি। এটা ঠিক হয়নি। এটা বলার জন্যই মূলত আপনাকে দাওয়াত করা।'

আমি বলি, 'স্যার, স্বামী-স্ত্রীর সংসারে ঝগড়াঝাঁটি অতি স্বাভাবিক ঘটনা। এটা নিয়ে আমি মোটেও মাথা ঘামাইনি। কিন্তু আপনারা আমাকে ডেকে এ কথা বলাতে আমি সম্মানিত বোধ করছি। আমি খুবই মুগ্ধ ও কিঞ্চিৎ বিব্রত।' এরপর আমাদের আড্ডা জমে ওঠে। এ বিষয়টি নিয়ে আমরা আর কোনো কথা বলি না।

একসময় হুমায়ূন আহমেদ আমাকে নিয়ে তাঁর পরিচয়-বিভ্রাটের গল্প বললেন। কমলের ছেলের জন্মদিনে তিনি আমাকে অন্য শাকুর ভেবেছিলেন, যে তাঁর কাছে একবার একটা হাসির নাটক দেখাতে এসেছিল। ছেলেটির ভাই শিশুচিকিৎসক, সম্ভবত ডা. সেলিম শাকুর। সেখান থেকে মনে হয়েছিল শাকুর মজিদ এসেছে।

সেই তরুণের স্ক্রিপ্ট নিয়ে আসার উদ্দেশ্য হুমায়ূন আহমেদকে দিয়ে তাঁর নাটক পরিচালনা করানো। হুমায়ূন আহমেদ বললেন, 'আমি স্ক্রিপ্টটা পড়লাম। নাটকটি যথেষ্ট হাসির। তাঁকে বললাম, এটা আমি বানাতে পারব না। কারণ এক টিভি চ্যানেলের একজন আমাকে বলেছে, আমাদের দর্শকেরা চায় হুমায়ূন আহমেদের লেখা নাটক হুমায়ূন আহমেদই পরিচালনা করুক। অন্য কারও লেখা নাটক হুমায়ূন আহমেদ পরিচালনা করলে দর্শক নেবে না।'

ছেলেটা মন খারাপ করে চলে যায়। ছেলেটার চেহারা নাকি আমার মতো। শুধু মাথায় চুল একটু বেশি।

দেখা যাচ্ছে ওই ছেলেটা আমি নই। স্যারকে খুব চিন্তিত মনে হলো। বললেন, 'এমন ভুল তো আমার হওয়ার কথা নয়! তাহলে ওই ছেলেটা কে? যার ভাই একজন চাইল্ড স্পেশালিস্ট?'

রান্না হয়েছে স্পেশাল আইটেম। দেখে আমার অচেনা যেমন মনে হলো, তেমনি একটু চেনাও লাগছে। আমার এক বন্ধু ডালাসে এক মেক্সিকান রেস্টুরেন্টে এমন খাবার খাইয়েছিল। সেটার অভিজ্ঞতা থেকে বলে ফেললাম, 'এটা কি ম্যাক্সিকান ডিশ?'

হুমায়ূন আহমেদ জোরে হাততালি দেন। লেগে গেছে। শাওন তার রেসিপিটা শোনায়। মেশড পটেটোর সঙ্গে গলদা চিংড়ি দিয়ে নানা রকম কারুকাজ। এই একটাই আইটেম, সঙ্গে সালাদ। সঙ্গে এক কাপ ভাত।

খাওয়াদাওয়ার পর গানের আসর বসে। একজনই শিল্পী, মেহের আফরোজ শাওন। সূত্রধর হুমায়ূন আহমেদ, তিনি গানের আগে গানটির শানে নজুল বলেন। যেমন, ব্রিটিশদের আমলে নব্য জমিদার বিলেতি সাহেবদের

AMARBOI.COM

জন্য গানের আয়োজন করেছে। সাহেব যেহেতু বাংলা বুঝবেন না, তাই লাইনে লাইনে তার ইংরেজি তরজমা হতো, গান গাওয়া হতো একই সুরে।

রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের গাওয়া ঘরোয়া আসর মাতানো একটা টপ্পা গান। শাওনকে মিষ্টি করে বলা হয় গানটা গাওয়ার জন্য। শাওন ততোধিক রসাল করে গান ধরে—

তুমি কাদের কুলের বউ গো তুমি,
কাদের কুলের বউ
যমুনার জল আনতে যাচ্ছ
সঙ্গে নাই তো কেউ
Which family belongs you madam,
Which family belongs you
Going to bring Jamuna water
No one with you...
যাচ্ছ তুমি হেসে হেসে
কাঁদতে হবে অবশেষে
Going are you laughing laughing
You will return crying crying
ওগো কলসি তোমার যাবে ভেসে
লাগলে জলের ঢেউ, লাগলে প্রেমের ঢেউ
Down the pitcher will be going
Wave of love at you...

হাসিঠাট্টার মধ্যে গান শোনা হতে থাকে। একপর্যায়ে আমি বলে বসি, 'স্যার, আমার বইটা নিয়ে আপনি যা বলেছিলেন তা যদি লিখে দিতেন, আমি বুক রিভিউ হিসেবে কোথাও ছাপানোর ব্যবস্থা করতাম।'

স্যার বলেন, 'ঠিক আছে।'

এর কয়েক দিন পরই মাজহারের ফোন। 'তোমার জন্য একটা মহা সুসংবাদ আছে। স্যার আজ তোমার বইয়ের রিভিউ লিখেছেন। সন্ধ্যায় এটা পড়ে শোনানো হবে। চলে আসো।' সন্ধ্যায় একই রকমের আয়োজন দেখতে পাই। শাওন বলল, 'শাকুর ভাই, আপনি অনেক ভাগ্যবান একজন লেখক। আমার যতটুকু মনে পড়ে, এর আগে মাত্র একটি বইয়ের রিভিউ সে লিখেছে, এটা দ্বিতীয়।'

স্যার পড়েন, 'শাকুর এখন ক্লাস সেভেনে'—হুমায়ুন আহমেদ।

> ...শাকুরের বইয়ের পঞ্চম লাইনটি পড়ে আমি বুঝলাম, লেখাটা ভাল হবে। পঞ্চম লাইনে লেখা—'অফিসে ইত্তেফাক পত্রিকা এলেই আমি শফিক স্যারকে জিজ্ঞেস করতাম, স্যার আমার রিজাল্ট বারইছেনি?' 'বারইছেনি' খাঁটি সিলেটি শব্দ। সিলেটবাসীরা নিজেদের কথ্য ভাষা নিয়ে সামান্য

AMARBOI.COM

সংকুচিত থাকেন। শাকুর সরাসরি এই ভাষা ব্যবহার করছে। তারচেয়েও বড় কথা, মূল গদ্যে হঠাৎ হঠাৎ সিলেটি ভাষা ঢুকিয়ে তিনি গদ্য ধারায় ঢেউ এর মত তৈরী করেছেন। এই কাজ তিনি ইচ্ছাকৃত ভাবে করেছেন না-কি অজান্তে করেছেন তা আমি জানি না। যে ভাবেই করে থাকুন এতে তাঁর গদ্য স্বাদু হয়েছে।...বইটিতে শাকুর তার কথা আন্তরিক ভঙ্গিতে বলেছে। লিখতে গিয়ে ভান করেনি যে 'আমি অতি মহান একটি রচনা লিখছি। একদিন এই রচনা ক্যাডেট কলেজে পাঠ্য হবে।' সে সহজিয়া ভঙ্গিতে তার স্বপ্ন এবং স্বপ্নভঙ্গের কথা, আনন্দ এবং বেদনার কথা লিখে গেছে। আমি তার চোখে পাবলিক স্কুলের ছবি দেখতে পেয়েছি। খেলার মাঠ, দূরের পাহাড়। অন্যকে নিজের দেখা ছবি গল্পের মাধ্যমে দেখানো সহজ কর্ম না।

পাবলিক স্কুল নিয়ে বিদেশী কিছু পড়েছি। ছবি দেখেছি। বাংলা সাহিত্যে জরাসন্ধের একটা লেখা আছে—পাবলিক স্কুল ঠিক না, বরস্ট্যাল স্কুল। দুষ্টু এবং অপরাধী ছেলেদের জেলখানা টাইপ স্কুলের কাহিনী। শাকুর মজিদ সম্ভবত প্রথম ক্যাডেট কলেজের গল্প শুনাতে এসেছে। এবং ভাল শুনিয়েছে।

কেউ যদি আমাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করে, বইটির কোন দিকটা আমার সবচে ভাল লেগেছে—আমি বলব, লেখকের সাবলাইম হিউমার।

...কেউ যদি বলে সবচে অপছন্দ হয়েছে কি? আমি বলব...না থাক, বলব না। সাহিত্যের ঝাড়ুদার হবার শখ আমার নেই।

গদ্য লেখক হিসেবে আমি জানি, গদ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা কত কঠিন। এই কাজটি লেখক করতে পেরেছেন। গদ্যের কঠিন ভূমিতে তাঁকে জানাচ্ছি সুস্বাগতম।

পরম করুণাময়ের করুণা তার উপর বর্ষিত হোক এই তার প্রতি আমার শুভ কামনা।*

*পুনশ্চ।
একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। শাকুর মজিদ ক্যাডেট কলেজ থেকে অসাধারণ রেজাল্ট করে এসএসসি এবং এইসএসসি পাশ করেছিল। মূল বইতে এই সাফল্যের কথা সে একবারও উল্লেখ করেনি। এই সংযম সে দেখাতে পেরেছে এটাও অনেক বড় ব্যাপার।

পাঠ শেষে মাজহারকে দেওয়া হয় এটা কম্পোজ করে কোনো পত্রিকায় ছাপানোর ব্যবস্থা করতে। এক শুক্রবার মাজহার ফোন করে বলে, 'আজকের *ইত্তেফাক*টা দেখো।' আমি *ইত্তেফাক* খুলে প্রায় স্তম্ভিত। 'সাহিত্য সাময়িকী'র প্রথম পাতায় লেখাটি বক্স করে ছাপা হয়েছে।

দখিন হাওয়ার সঙ্গে আমার যোগাযোগ বেড়ে যায়। আড্ডার ধারাবাহিকতা অনুযায়ী আমরা ঘুরে ঘুরে দাওয়াত খেতে থাকি। একদিন

AMARBOI.COM

জাহিদ হাসান ফোন করে বলল, তার বাড়িতে সবার দাওয়াত। আমি যথাসময়ে গিয়ে হাজির হই।

জাহিদ হাসানের সঙ্গে আমার পরিচয় জাহিদের অভিনয় জীবনের সূচনাতেই। তৌকীররা থিয়েটার থেকে বেরিয়ে নতুন নাট্যদল করল নাট্যকেন্দ্র। সেখানে নতুন ছেলেমেয়ে নেওয়া হলো। এই নতুনদের মধ্যে প্রতিভাবান তরুণ জাহিদ হাসান। কমেডি চরিত্রে মারমার কাটকাট। নাট্যকেন্দ্রের প্রথম নাটক *বিচ্ছু*তে সে কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করল।

হুমায়ূন আহমেদের দ্বিতীয় চলচ্চিত্র *শ্রাবণ মেঘের দিন*-এ জাহিদ প্রধান পুরুষ চরিত্রে অভিনয় করে। এ চরিত্রে অভিনয় করে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে জাহিদ জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারও পায়। এরপর জাহিদ হাসান হুমায়ূন আহমেদের নাটকে অভিনয় করলেও বহুদিন ছবিতে তাকে দেখা যায়নি। অনেক দিন পর জাহিদ আবার তার *আমার আছে জল*-এ অভিনয় শেষ করল। সম্ভবত সে কারণেই এই পার্টি। আমার পৌঁছাতে একটু দেরি হয়। গিয়ে দেখি, জাহিদের বাসায় একটা ঘরের মধ্যে ফ্লোরের ওপর বসে সবাই আড্ডা দিচ্ছেন।

আজ রবীন্দ্র-নজরুল চলল না, আজ শুধু হুমায়ূন আহমেদের গান। *আমার আছে জল* ছবির কোন গানটা সুর করতে ফেরদৌস ওয়াহিদ আর হাবিব বাপ-বেটা মিলে কীভাবে কী কথা বললেন, মজা করে দেখালেন তিনি। এখানে একটি গান আছে, ছবিতে দুবার ব্যবহৃত হয়েছে। একবার হাবিবের সুর, আরেকবার টুটুলের। শেষমেশ দুটি গানই হলো।

একবার হুমায়ূন আহমেদ বললেন, 'একটা কাহিনি শোনো। নুহাশ পল্লীতে আমি একা পড়ে আছি। বৃষ্টি হচ্ছে। অথচ শাওন নেই। এটা আমি সহ্য করতে পারছি না। এদিকে শাওনের সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা একান-ওকান হয়ে তার বাবা-মার কাছে চলে গেছে। শাওনকে ঘরে আটকে রাখা হয়েছে। কোনো অবস্থায়ই তাকে আমার সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হবে না।

'এ সময় মুক্তিযোদ্ধার সাহস নিয়ে আমি একটা চিঠি লিখলাম শাওনের মার কাছে। চিঠিসহ ড্রাইভার চলে গেল তাদের বাসায়। বিকেলে দেখি, শাওন এসে হাজির। চিঠির মধ্যে যে কথাগুলো লেখা ছিল, তা নিয়ে গান হয়েছে, টুটুলের সুর। কুসুম, গানটি ধরো তো।' শাওন গাইছে:

যদি মন কাঁদে,
তুমি চলে এসো, এক বরষায়।
যদিও তখন আকাশ থাকবে বৈরী
কদমগুচ্ছ হাতে নিয়ে আমি তৈরি

AMARBOI.COM

উতলা আকাশ মেঘে মেঘে হবে কালো
ঝলকে ঝলকে নাচিবে বিজলি আলো
তুমি চলে এসো এক বরষায় ॥

স্যারের জ্যোৎস্না নিয়ে লেখা একটা গান আমারও খুব প্রিয়। স্যার বললেন, 'গানটি আসলে শাওনকে নিয়েই লেখা, বিয়ের আগে।' শাওন গায় :

আমি ঘর খুলিয়া বাহির হইয়া জোৎস্না ধরতে যাই
হাত ভরতি চাঁদের আলো ধরতে গেলে নাই
হাত ইশারায় ডাকে কিন্তু মুখে বলে না
আমার কাছে আইলে বন্ধু আমায় পাইবা না

শাওনের গলায় হুমায়ূন আহমেদের লেখা গানগুলো শুনতে শুনতে আমার মনে হয়, হুমায়ূন আহমেদ একজন মহা রোমান্টিক গীতিকবিও। বৃষ্টি, জ্যোৎস্না ও রমণী তাঁর গানের কথায় একাকার। আমরা মুগ্ধ হয়ে তাঁর লেখা গানগুলো শুনি। শাওন গায় :

যদি ডেকে বলি, এসো হাত ধরো
চলো ভিজি আজ বৃষ্টিতে
এসো গান করি মেঘমল্লারে
করুণাধারা দৃষ্টিতে

আসবে না তুমি, জানি আমি জানি
অকারণে তবু কেন কাছে ডাকি
এই এসো না চলো জলে ভিজি
শ্রাবণ রাতের বৃষ্টিতে

AMARBOI.COM

কিংবা

কন্যা আমার কথা শোনো
নদী প্রান্তরে বনে জঙ্গলে
ভালোবাসা নেই কোনো ॥

ভালোবাসা থাকে চোখের মাঝে
চোখে চোখে শুধু চাওয়া
তাই চোখের জলে তোমার আমার
ভালোবাসা খুঁজে পাওয়া ॥

শাওন যে তাঁকে বিয়ে করে নিজে কলঙ্কের কাজল পরেছে, তার রূপও আছে গানে—

সখি বল আমারে বল
কে পরাইল আমার চোখে কলঙ্ক কাজল?

আমি যার কাছে যাই
সে-ই আমারে কত মন্দ বলে,
আমার ইচ্ছা করে
ডুইব্যা মরি নিজের চোখের জলে

আমি ঘর ছাড়িলাম
বনে গেলাম, বনে মানুষ নাই
না-মানুষি বনে
যদি তোমার দেখা পাই।

এ কদিনে লক্ষ করলাম, হুমায়ূন আহমেদ শাওনকে ডাকছেন 'কুসুম' বলে। শাওন ডাকছে 'জে'। 'জে' সম্ভবত ইংরেজি হরফে 'জান'-এর লেখা আদি হরফ। কিন্তু 'কুসুম' এল কোত্থেকে? মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পুতুলনাচের ইতিকথায়* একটা রোমান্টিক চরিত্র আছে। কুসুম। শশী ডাক্তারের সঙ্গে তার প্রণয়। সেখান থেকে?

২০০১ সালে *শ্রাবণ মেঘের দিন* দেখেছি। সেই ছবির নায়িকার নামও ছিল কুসুম। ভাটি এলাকার এক গ্রাম্য কিশোরী, আধা পাগলা-কিসিমের চরিত্র। *শ্রাবণ মেঘের দিন* ছবির নামের মধ্যেও 'শাওন' আছে। তৎসম শব্দ 'শ্রাবণ' থেকেই তদ্ভব 'শাওন'-এর জন্ম। তাহলে কি শাওনকে চিন্তা করেই ছবির নাম *শ্রাবণ মেঘের দিন*? কে জানে!

এ ছবির চিত্রনাট্য লেখা হয়েছে ১৯৯৭-৯৮ সালের দিকে, *আজ রবিবার* নাটকের পর। তাহলে এই একটা সম্ভাবনা হয়তো থেকে যায়। শুনেছি হুমায়ূন আহমেদ সব সময় সেটে তাঁর অভিনেতা-অভিনেত্রীদের চরিত্রের নাম ধরেই ডাকতেন। সে ক্ষেত্রে *শ্রাবণ মেঘের দিন*-এর সময় শাওনকে নিশ্চয় 'কুসুম' নামে ডাকতেন। ছবির শুটিং শেষ হয়ে গেলেও শাওনের বেলায় তার এ সম্বোধন আর বদলায়নি।

দখিন হাওয়ায় রেগুলার আড্ডা চলতে থাকে। একসময় এই আড্ডায় আমি কিছু শব্দের বহুল ব্যবহার শুনতে পাই। যেমন 'গুষ্টি কিলাই', 'খেতাপুরি', 'রসগোল্লা'। 'রসগোল্লা' শব্দটা স্যারের আড্ডার, কথায় কথায় বলেন, 'এটা কী এমন রসগোল্লা' কিংবা 'তুমি কী এমন রসগোল্লা যে তোমার কথা আমার শুনতে হবে' ইত্যাদি।

একবার 'রসগোল্লা' তাঁর একটা লেখায় এসে গেল। মহাবিপদে পড়ে গেলেন হুমায়ূন আহমেদ। ভারতীয় সিনেমা বাংলাদেশে দেখানো উচিত কি

AMARBOI.COM

না—একটা দৈনিক পত্রিকায় এ বিষয়ে কলাম লিখলেন, 'বহুত দিন হোয়ে'। এর শিরোনামটি দ্ব্যর্থক। এই নামে সিলেটের রংমহল সিনেমায় মামার সঙ্গে ছয়-সাত বছর বয়সে একটা ছবি দেখেছিলেন। অনেক দিন হয়ে গেল, ভারতীয় সিনেমা এ দেশে চলছে না, এ নিয়েও তাঁর খেদ। এই লেখার এক জায়গায় নাকি বাংলাদেশের মেইনস্ট্রিমের সিনেমাকে 'রসগোল্লা' বলেছিলেন।

লেখাটি পত্রিকায় প্রকাশের পর এফডিসি-কেন্দ্রিক পরিচালকেরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তাঁরা প্রতিবাদ জানান, বৈঠক করেন এবং পরিচালক সমিতি থেকে তাঁকে বহিষ্কারের হুংকারও দেন। এমন হুংকারে ভীত হয়ে পড়েন হুমায়ূন আহমেদ। তিনি *ঘেটুপুত্র কমলা* নামে আরেকটি ছবি বানানোর পরিকল্পনা করেছেন। পরিচালক সমিতি তাঁকে এফডিসিতে ঢুকতে না দিলে কীভাবে ছবি বানাবেন!

একদিন আড্ডায় হুমায়ূন আহমেদ একটা চিঠি পড়ে শোনালেন। চিঠিটা তাঁর নিজ হাতে লেখা। ইনিয়েবিনিয়ে তিনি তাঁর লেখার পক্ষে মত প্রকাশ করে সবশেষে লিখেছেন, '"রসগোল্লা" শব্দটি ব্যবহারের কারণে কোনো পরিচালক যদি কষ্ট পেয়ে থাকেন, তাহলে আমিও দুঃখিত।' জানি না, চিঠিটা তিনি পরিচালক সমিতির কাছে পাঠিয়েছিলেন কি না। কিন্তু পরিচালক সমিতি তাঁর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা যে নেয়নি, সেটা আমরা জানতে পারি। তিনি নির্বিঘ্নে *ঘেটুপুত্র কমলা* বানালেন।

AMARBOI.COM



তাঁর সঙ্গে সুন্দরবনে

মাত্র ১০ দিন আগে আমাদের পঞ্চপর্যটকসহ একটি দলের সঙ্গে সুন্দরবন ঘুরে এসেছি। তবু পাঁচ দিনের জন্য আবার সুন্দরবনের জাহাজে উঠতে হলো। কারণ, মাজহারুল ইসলামের কঠিন আবদার, 'লেখক হুমায়ূন আহমেদের আদেশ—তাঁর প্রিয় যে মানুষগুলোকে নিয়ে তিনি সুন্দরবন দেখতে চান, তার মধ্যে তুমি আছ এবং তোমাকে যেতেই হবে।'

২০০৯ সালের ১১ জানুয়ারি। সদরঘাট থেকে ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজের ভাড়া করা তেতলা জাহাজটি ছাড়তে ছাড়তে প্রায় সন্ধ্যা। এই কলেজটি এর আগের ১২ বছর ধরেই এমন আয়োজন করে এসেছিল।

প্রতিবছরই ছাত্রছাত্রী-অভিভাবকসহ সুন্দরবন বেড়াতে যায়। এর অধ্যক্ষ মাহফুজুল হক এ বিষয়ে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাঁর আয়োজনও নিখুঁত। জাহাজের ডেকেই গরু-ছাগল বাঁধা, ডিপ ফ্রিজ ভর্তি মাছ-তরকারি। আয়োজনের কমতি নেই কোথাও। শ তিনেক ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক ঠাঁই নিয়েছেন নিচতলা ও দোতলায়। তেতলার কেবিনগুলো অধ্যক্ষ ও তাঁর স্ত্রী এবং হুমায়ূন আহমেদ ও তাঁর বন্ধুদের জন্য। হুমায়ূন আহমেদের বন্ধুতালিকায় আছেন তাঁর কলেজ-জীবনের বন্ধু স্থপতি আবু করিম, স্কুলজীবনের বন্ধু প্রকৌশলী আমিনুল হক, আছে মাসুদ আখন্দ, অন্যপ্রকাশ গ্রুপের মাজহার, কমল আর নাসের। বন্ধুতালিকায় নতুন সংযোগ কথাশিল্পী রশীদ হায়দারের। অতিথিদের বেশির ভাগই সস্ত্রীক, বাচ্চাকাচ্চাসহ। সিঙ্গেল মাত্র তিনজন—রশীদ হায়দার, আমি আর মাসুদ আখন্দ। আমাদের জন্য সিঙ্গেল বেডের কেবিন। ডাবলদের জন্য ডাবল কেবিন। তিন বছরের শিশু নিষাদকে নিয়ে হুমায়ূন আহমেদ আমার পাশের কেবিনে।

যাত্রা শুরু হলো। শীতের রাতে বাইরের ডেকে বেশিক্ষণ বসাও যায় না। অন্ধকারের মধ্যে নদী বা সমুদ্রযাত্রায় কোনো খোরাক নেই। আমরা কিছুক্ষণ ডেকে বসে অন্ধকার দেখে, কিছুক্ষণ কেবিনের মধ্যে আড্ডা দিয়ে যে যার কেবিনে ঘুমিয়ে পড়ি।

AMARBOI.COM

পরদিন সকালটা অন্য রকম হয়ে দেখা দিল। ঘুম ভাঙতেই কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে দেখি, হুমায়ূন আহমেদ একা পায়চারি করছেন সামনের করিডরে। পেছনে হাত দিয়ে হেঁটে এপার থেকে ওপার যাচ্ছেন। বলি, 'স্যার, আপনি কি সব সময় এমন হাঁটেন, নাকি এটা মর্নিং ওয়াকের বিকল্প?'

স্যার বলেন, 'হাঁটি প্রায়ই। বাসায়ও হাঁটি। হাঁটার সময় মনে মনে লেখা জমাই। শোনো, তখন নুহাশ অনেক ছোট। একদিন আমাকে বলে, "আমি কখনো লেখক হব না।" আমি বললাম, কেন? ও বলল, "লেখকদের ঘরের মধ্যে অনেক হাঁটাহাঁটি করতে হয়। আমি হাঁটাহাঁটি করতে পারব না।"' এটুকু বলে একটা মুচকি হাসি দিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করলেন।

কিছুক্ষণ পর নাশতা আসে আমাদের করিডরে। জাহাজের নিচতলায় ডাইনিং রুম। লম্বা টেবিল বিছানো আছে। বাকি সবাই ঠিক সময়মতো খেতে যায় ওখানে। তেতলার এই অতিথিদের জন্য অন্য নিয়ম। তাদের খাবার আসে ওপরে।

নিচের ডাইনিং টেবিলে খেতে বসে কাল রাতে মহা ঝামেলায় পড়ে যান ইমপিরিয়াল কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয়। সবার খাবার শেষে রাত বারোটায়

হুমায়ূন আহমেদ তাঁর দলবল নিয়ে খেতে গেলেন নিচে। খাবার মেন্যুতে ছিল পোলাও, মুরগির রোস্ট, গরুর ভুনা মাংস, সবজি। খেতে বসেই গন্ডগোল পাকান হুমায়ূন আহমেদ। প্রায় চিৎকার করে বলেন, 'কোন বাবুর্চি এই রোস্ট রেঁধেছে, তাকে ডেকে আনো।'

যথারীতি বাবুর্চিকে নিয়ে আসা হলো। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি রোস্টের মধ্যে চিনি দিয়েছেন কেন? বাবুর্চির কাঁপাকাঁপি অবস্থা। কোনো যুক্তিই স্যারের কাছে গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না। কোনো অবস্থায়ই এ খাবার খাবেন না। খাবার প্লেট প্রায় ছুড়ে ফেলেই তিনি হাত ধুলেন এবং টেবিল থেকে উঠে গেলেন। আমার কোনো সমস্যা হচ্ছে না। আমি ও অন্য কয়জন ভরপেট খেলাম। স্যার খাননি তাই শাওনও খেলো না, মাজহার-কমলও না। মিনিট বিশেকের মাথায় অধ্যক্ষ নিজের হাতে খাবার নিয়ে এসে হাজির। পেছনে হাত জোড় করে বাবুর্চি দাঁড়িয়ে। অনেক অনুনয়-বিনয় ও ক্ষমা প্রার্থনার পর নতুন করে রান্না করা মুরগির তরকারি সামনে নিয়ে তিনি খেতে বসলেন। খেলেনও। কিন্তু নতুন রান্না করা মুরগির রোস্ট ছুঁলেনও না। পোলাওর সঙ্গে গরুর ভুনা মাংস দিয়েই শেষ হলো তাঁর খাওয়া।

হুমায়ূন আহমেদের খাবারের অভ্যাসের কথা তাঁর স্বজনেরা জানেন। তিনি ফার্মের মুরগি, পাখির মাংস খান না। পর পর দুই বেলা একই তরকারি খাবেন না। দিনে মাছ খেলে রাতে মাংস চাই। খাবারের শেষে মিষ্টিজাতীয় কিছু খাবেনই। হয় রসগোল্লা, না হয় শণপাপড়ি। তাঁকে দাওয়াত খাইয়ে সব সময় যে সবাই পুলকিত হবেন, এমন ভাবার কারণ নেই। এক বাসায় দাওয়াত খাওয়ার পর বললেন, 'ভাবি, আপনার সব আইটেমের মধ্যে সেভেন আপটাই শুধু পারফেক্ট ছিল।' কোথাও কোথাও খাবার আইটেমে গ্রেডিং হতো। দশে দশ যেমন দিতেন, এক, দুই বা তিনও বসাতেন অবলীলায়।

বিয়েবাড়ির দাওয়াত খেতে গিয়ে তিনি বাবুর্চিকে ডেকে এনে কান ধরে ওঠবসও করিয়েছেন, এমন কথা তাঁর স্বজনেরা জানেন। সুতরাং তাঁর জন্য রান্নার পৃথক ব্যবস্থা না হলেও অত্যন্ত সতর্ক এই নৌবিহারের আয়োজকেরা।

সকালের আলোয় আমাদের চমৎকার দিন শুরু হয়। কে একজন স্যারকে একটা ইংরেজি পেপারব্যাক বই এনে দিল। তিনি পড়তে শুরু করলেন। দুই পৃষ্ঠা পড়ে বই ফেরত দিয়ে দিলেন। 'নাহ্, কনসেনট্রেট করতে পারছি না।' আবার বলেন, 'এমন কখনো হয় না, আমি বেড়াতে গেলে সব সময় কিছু বই আমার সঙ্গে থাকে। এবার কী ভুলটাই না করলাম!'

AMARBOI.COM

পাশে বসেছিলেন রশীদ হায়দার। গল্প শুরু হয়ে গেল। রশীদ হায়দার কিন্তু স্যারের অতিথি ছিলেন না। তিনি কলেজের অধ্যক্ষ মাহফুজুল হকের আপন খালাতো ভাই। এই সূত্রে আসা। হুমায়ূন আহমেদই একসময় রশীদ হায়দারের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের ঘটনা বললেন।

রশীদ হায়দার বাংলা একাডেমীর উপপরিচালক ছিলেন, বাংলা একাডেমীর সাহিত্যপত্র *উত্তরাধিকার* সম্পাদনা করতেন। একদিন হুমায়ূন আহমেদ একটা গল্প নিয়ে গেছেন *উত্তরাধিকার*-এর জন্য। রশীদ হায়দার গল্পটা না পড়ে ছাপার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। সম্পাদক ও লেখক দুজনেই জানতেন যে *উত্তরাধিকার*-এ 'ভারী ভারী' লেখা ছাপা হয়। সেখানে তাঁর লেখা ছাপা হবে কি না এ নিয়ে হুমায়ূন আহমেদের সংশয় ছিল। রশীদ হায়দার বললেন, 'হুমায়ূন তখন স্বনামে বিখ্যাত। সুতরাং তাঁর লেখা ভালো হলো কি মন্দ হলো, সেটা সে বুঝবে আর তাঁর পাঠক বুঝবে। লেখা খারাপ হলে পাঠক বাংলা একাডেমীকে গালি দেবে না, হুমায়ূনকে দেবে। সুতরাং আমার ঝুঁকি নেই। আমি গল্পটি ছেপেছি।'

আমি আমার ক্যামেরা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। আপাতত মাজহারের ছেলে অমিয় আমার প্রেজেন্টার। তাকে মাইক্রোফোন ধরিয়ে দিয়ে বললাম, তুমি যা ইচ্ছা করো, আমি রেকর্ড করি। সে প্রথমেই গেল হুমায়ূন আহমেদের কাছে।

অমিয় : 'আচ্ছা, এ মুহূর্তে আপনার কেমন লাগছে?'

হুমায়ূন : 'খুব ভালো লাগছে।'

অমিয় : 'আপনি জানেন, আমরা যে সুন্দরবন যাচ্ছি সেখানে অনেক কুমির আছে?'

হুমায়ূন : 'কুমির থাকবে পানিতে, আমরা থাকব জাহাজে, আমাদের চিন্তা নেই।'

অমিয় : 'আচ্ছা, যদি কুমিরের বাচ্চা পাওয়া যায়, আপনি কী করবেন?'

হুমায়ূন : 'বাচ্চা পেলে বাসায় নিয়ে আসব। কচ্ছপের বাচ্চা আছে বাসায়। কুমিরের বাচ্চা আর কচ্ছপের বাচ্চা গল্প করে সময় কাটাতে পারবে।'

দুপুরের ভাত খাওয়ার পর হুমায়ূন আহমেদ খানিক ঘুমান। এটা তাঁর দীর্ঘদিনের অভ্যাস। জাহাজেও তার ব্যতিক্রম হলো না। বিকেলের দিকে রোদের তেজ কমে এলে সবাই ছাদের ওপর উঠে আসেন। ছাদে বড় মাদুর বিছানো হয়েছে। দূরে এক পাশে বাংলাদেশের শেষ সীমানার জনপদের

AMARBOI.COM

সামান্য চিহ্ন, অন্য পাশে শুধুই সমুদ্র। জাহাজের গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কতগুলো গাঙচিল উড়ে উড়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের।

হুমায়ূন আহমেদ তাঁর নাইকন এন-নাইনটি ক্যামেরাটা নিয়ে পাখিগুলোর ছবি তোলার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

ছাদের ওপর গোটা তিরিশেক যাত্রী। আবালবৃদ্ধবনিতা। এদের অর্ধেকের বেশিই ক্যামেরাম্যান। সবার হাতেই ক্যামেরা, যার ক্যামেরা নেই, তার জন্য মোবাইল ফোন তো আছে!

শুরু হলো নানা রকম ফটো সেশন। বিদায়ী সূর্যটা এমন সহজভাবে এসে ধরা দেয় না। গাঁও-গেরামে গেলে বিস্তীর্ণ হাওরপাড়ে হয়তো খানিকটা পাওয়া যায়; বাংলাদেশের সমুদ্রতীরে পাওয়া যায় না। এখানে সমুদ্রের বুকে সূর্য ডোবে। আজ ডুবছে সমুদ্রের বিপরীত দিকে, গাছগাছালির আড়ালে। কিছুক্ষণের মধ্যে ছাদের ওপর ঘুড়ি ওড়ানোর আয়োজন শুরু হয়ে যায়।

এত প্রাণোচ্ছল ক্যামেরাম্যানদের দেখে হুমায়ূন আহমেদ এক ফটো প্রতিযোগিতার ঘোষণা দিয়ে বসেন। প্রতিযোগিতা সবার জন্য উন্মুক্ত। তিনি নিজেও থাকবেন একজন প্রতিযোগী হিসেবে। সুন্দরবন ট্যুরে তোলা প্রত্যেকের হাজার হাজার ছবি থেকে বাছাই করে সর্বোচ্চ ১০টি করে ছবি জমা নেওয়া হবে। যে কটা ছবি জমা পড়বে, তার মধ্য থেকে ১০টি ছবিকে পুরস্কৃত করা হবে। এ ছবিগুলো বাঁধাই করে রাখা হবে নুহাশ পল্লীর হলঘরে।

ঘোষণা শোনার কিছুক্ষণ পর একটা ঘুড়ি পানিতে পড়ে আধডোবা হয়ে যাওয়ার সময় আমি একটি ছবি তুলি। ক্যামেরার এলসিডি স্ক্রিনে ছবিটা তাঁকে দেখাই। তিনি একবার আমার দিকে তাকান, একবার ছবির দিকে। আর কারও কোনো ছবি না দেখেই ডিক্লেয়ার করে দেন, এটাই ফার্স্ট। এ ফলাফল মানতে চাইল না দুজন বড় প্রতিযোগী—মাজহার ও মাসুদ আখন্দ। তাদের দাবি, ঢাকা না ফেরা পর্যন্ত প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা করা যাবে না। কোমরে গামছা বেঁধে ছবি তুলতে শুরু করল তারা।

এ আয়োজনে সবচেয়ে সক্রিয় মাসুদ আখন্দ। সে বহু গুণে গুণান্বিত এক যুবক। সুইডেনে ফিল্ম ইনস্টিটিউটে পড়াশোনা করে এসেছে। মাথার মধ্যে কিলবিল করছে ছবির প্লট। সংকট শুধু প্রডিউসারের। অনেকের সঙ্গেই কথা বলেছে, সবাই খালি হুঁ-হাঁ করে। ঝাইড়া কেউ কাশে না। একজন জুতসই প্রডিউসার পেলে সে দেখিয়ে দিত ফিল্ম কাকে বলে। বাংলাদেশের ফিল্ম কেন অস্কারে যাবে না, এ নিয়ে তার খেদের শেষ নেই।

AMARBOI.COM

হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে মাসুদ আখন্দের পরিচয়ের ঘটনাটা এ রকম: একবার এক যুবক নুহাশ পল্লীর গেটে এসে ভেতরে ঢোকার জন্য ব্যাকুল। এই তরুণের একটাই চাওয়া, হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে কাজ করবে।

হুমায়ূন আহমেদের ভাষায়, 'আপদ দূর করার জন্য বললাম, ফিল্ম মেকিং এত সহজ কাজ নয়। তোমার কি এ বিষয়ে পড়াশোনা আছে? ছেলেটি মাথা নাড়ে। বলে, "স্যার, আপনি বললে আমি একটা কোর্স করে ফেলতে পারি।" আমি বিদায় করার জন্য বললাম, ঠিক আছে, কোর্স শেষ করে দেখা কোরো। গত মাসে সে চলে এসেছে, এর মধ্যে সুইডেনের একটা ফিল্ম ইনস্টিটিউট থেকে দুই বছরের একটা কোর্সও করেছে। দেখি, কী করে গাধাটা।'

স্যার তাঁর প্রিয়ভাজন অনেককেই 'গাধা' বলেন। মাসুদ আখন্দ দিনে-রাতে ১৮ ঘণ্টার মতো সময় কাটায় স্যারের সঙ্গে, স্যারের বাসায়, নুহাশ পল্লীতে বা শুটিং স্পটে। স্যারকে ডাকে 'গুরু', শাওনকে 'গুরুপত্নী'। আমি পরামর্শ দিই, দুজনকে একসঙ্গে ডাকলে তুমি জি-টু-পি ডাকতে পারো, জি+জিপি [গুরু+গুরুপত্নী], জি স্কোয়ার পি বা জিজিপি বা টুজিপি।

মাসুদ আমার ওপর খেপে যায়। তার গুরু আর গুরুপত্নীকে হালকাভাবে ডাকার কোনো সুযোগ নেই। এ কদিনে তার সঙ্গে আমার সবচেয়ে বেশি খাতির হয়ে গেছে। বয়সে সে আমার কিছু ছোট, দুজনই বিবাহিত কিন্তু এসেছি স্ত্রী-সন্তান ছাড়া। তার বউ-বাচ্চা থাকে সুইডেনে, আমার ঢাকায়। এর আগে, যখন তার সঙ্গে আমার দেখা হয়, আমাদেরই আড্ডা মহলের একজন ফিসফিস করে বলেছিল, ও হচ্ছে স্বাধীন খসরু টু। এর আগে স্বাধীন খসরু যেমন লন্ডন থেকে গাট্টি-বোঁচকা নিয়ে দেশে আসে হুমায়ূন আহমেদের সংস্পর্শে থেকে মিডিয়ায় কাজ করতে, মাসুদ আখন্দও তা-ই।

জানুয়ারির ঠান্ডা হাওয়া জাহাজের ছাদে আমাদের বেশিক্ষণ টিকতে দেয় না। আমরা নিচে নেমে এসে বসে পড়ি রাতের আড্ডায়। পানাহারের মধ্যে তখন একমাত্র শাওনের প্রাঞ্জল গানই আমাদের বিনোদন।

হুমায়ূন আহমেদই বারবার অনুরোধ করে গান গাওয়ান শাওনকে দিয়ে। এবং প্রায় প্রতিবারই তিনি তাঁর নিজের লেখা গানগুলোর শানে নজুল বলেন। বেশির ভাগ গানই শাওন ও তাঁর বিবাহপূর্ব সম্পর্কের বিভিন্ন ঘটনাক্রমে লেখা। তবে শুধু নিজের লেখা গানই না, রবীন্দ্রনাথের পূজাপর্বের কিছু গান শাওনের গলায় চমৎকার খেলে।

আমাদের নিখাদ আড্ডায় এ সংগীতায়োজন প্রায় অপরিহার্য। বন্ধুবান্ধব নিয়ে আড্ডায় বসলেই মিষ্টি করে ডাকবেন শাওনকে। বলবেন, 'কুসুম, সবাই

AMARBOI.COM

তোমার গান শুনতে চাইছে, তুমি কি ওনাদের একটু গেয়ে শোনাবে?'

এসব ক্ষেত্রে প্রথমে শাওন গররাজি থাকে। পরে আস্তে আস্তে রাজি হয়। বেশির ভাগই রবীন্দ্রসংগীত, কিছু গান তাঁর নিজের লেখা। একটিমাত্র নজরুলগীতি শাওনকে দিয়ে বারবার গাইয়েছেন। গানটি হলো 'পথহারা পাখি, খুঁজে ফিরে...' এবং প্রতিবারই হুমায়ূন গানটির প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেন। কাজী নজরুল ইসলাম কপর্দকহীন অবস্থায় কলকাতার এক মেসে থাকেন। এমন সময় খবর পেলেন তাঁর শিশুপুত্র খুব অসুস্থ, তাঁকে চিকিৎসা করানোর কোনো সম্বল তাঁর স্ত্রীর কাছে নেই। স্ত্রী পত্র পাঠিয়েছেন, কিছু টাকা পাঠানোর জন্য। তিনি দিশেহারার মতো ছুটছেন। এ সময় এক চায়ের দোকানের দোকানি বলল, 'কাজীদা, একটা গান ধরো তো!' কাজীদা বললেন, 'দাও, কাগজ-কলম দাও।' কলম পাওয়া গেলেও কাগজ নেই। অবশেষে সিগারেটের প্যাকেট কেটে তার উল্টো দিকে লিখে তখনই সুর করে গানটি গাইলেন। 'কুসুম, গানটা ধরো তো।'

শাওনের গাওয়া এ গান তাঁর এতই প্রিয় যে ২০০২ সালে বানানো তাঁর চলচ্চিত্র *চন্দ্রকথা*তে গানটি তিনবার বিভিন্নভাবে ব্যবহার করেছেন তিনি। কখনো খালি গলায়, কখনো যন্ত্রসংগীত সহযোগে। এই ছবিতে চাঁদ, বৃষ্টি, জ্যোৎস্না—এসবেরও অনেক বেশি ব্যবহার ছিল। *চন্দ্রকথা*র 'চন্দ্র' চরিত্রে অভিনয় করেছিল শাওন।

আমাদের সফরের তৃতীয় দিনে আমরা প্রকৃত সুন্দরবনে এসে পৌছাই। 'হিরন পয়েন্ট'-এ আমাদের বড় জাহাজ এসে সমুদ্রের ওপরই নোঙর ফেলে। দুটি ছোট ট্রলার আমাদের সুন্দরবনের আরও কাছাকাছি নিয়ে আসে। এগুলো ছাদ-খোলা বড় ইঞ্জিন নৌকা। আমাদের নৌকা ধীরে ধীরে ঢুকে পড়ে ছোট ছোট খালের ভেতর। আমরা নৌকায় বসে হরিণ দেখার চেষ্টা করি। মাঝি জানান, এখানে দু-একবার বাঘকে খাল পাড়ি দিতে দেখেছেন।

এই সফরের সময় আমি হুমায়ূন আহমেদের দুটি মাত্র পোর্ট্রেট তুলেছিলাম। হিরন পয়েন্টে এসে বড় জাহাজ থেকে ছোট ট্রলারে করে আমরা ভেতরে যাব, হঠাৎ দেখি, জেটির গায়ের লাল রং থেকে প্রতিফলিত একটা চমৎকার আলো এসে পড়েছে তাঁর মুখে। আমি চেয়ে দেখি, তাঁর হাত গালের কাছে, সুন্দরবনের চিকন চিরল পাতার দিকে তাঁর চোখ। আমার ক্যামেরা যে তাঁকে তাক করে আছে, খেয়াল নেই।

হিরন পয়েন্টের গেস্টহাউসে নামি আমরা। তিন দিনের মাথায় প্রথম মাটির ছোঁয়া। এখানে দুটি কামরা ভাড়া করা হয়েছে। সবাই চেয়েছিল, স্যার

AMARBOI.COM

যদি গোসলটোসল করতে চান, এটাই একমাত্র সুযোগ। কারণ ওই জাহাজে বাথরুম-সংকট ছাড়া আর কোনো অসুবিধা ছিল না। স্যার রুমে গেলেন না। বলেন, 'চলো, নৌকা নিয়ে আরেকটু ঘুরি।'

আমরা আবার সুন্দরবনের ভেতর ঢুকে পড়ি। নানা রকম কেওড়াগাছ, স্বচ্ছ নীল জল। কিন্তু স্যারকে খুব মুগ্ধ হতে দেখলাম না। সুন্দরবন সম্পর্কে তাঁর মনের মধ্যে একটা ধারণা ছিল, কিন্তু সত্যি সত্যি সুন্দরবন দেখে মনে হলো তিনি কিঞ্চিৎ হতাশ। শুধু স্থানীয় মাঝিকে ডেকে কখনো কখনো কোন গাছের কী নাম জানতে চেয়েছেন মাত্র। নৌকার মধ্যে যতক্ষণ বসে ছিলেন, প্রায় সারাক্ষণই তাঁর হাতে ধরা ছিল শিশুপুত্র নিষাদ।

একটা খালের মুখে এসে আমাদের নৌকা থামে। এখানে একটা মাচা বাঁধা। মাচা দিয়ে অনেক দূর হেঁটে চলার পথ। পথটি মাটি থেকে ফুট চার-পাঁচেক ওপরে, অনেকটা তক্তা দিয়ে গাঁও-গেরামে যেমন ব্রিজ বানানো হয়, সে রকম। এই পথ দিয়ে অনেকটুকু হেঁটে সুন্দরবনের ভেতরে যাওয়া যায়। আমরা প্রায় ৫০ মিটারের মতো পথ অতিক্রম করি। এমন সময় আমাদের গাইড হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে, 'থামুন সবাই, আর যাবেন না।'

সবাই দাঁড়িয়ে যান। গাইড বলে, 'বাঘের ঘ্রাণ পাচ্ছি, সামনেই বাঘ আছে।' আবার ফেরত যাই নৌকায়। হুমায়ূন আহমেদ ফিসফিস করে বলেন, 'এটা ওই ব্যাটার চালাকি। সে কোনো রিস্কের মধ্যে যেতে চায় না বলেই বাঘের ভয় দেখিয়ে সবাইকে নিয়ে ফেরত যাচ্ছে।'

তৃতীয় রাতে হঠাৎ অন্ধকারের ভেতর থেকে স্যার আমার নাম ধরে ডাক দিলেন, 'এই শাকুর, তাড়াতাড়ি তোমার ক্যামেরা নিয়ে আসো। দেখো ওটা কী?'

এসে দেখি, শীতের ঠান্ডা হাওয়ার মধ্যে ডেকের ওপর ভারী একটা জ্যাকেট পরে স্যার একা বসে আছেন, সিগারেট খাচ্ছেন।

আমি কাছে যেতেই বলেন, 'দেখো, ওটা দেখো। ছবি তুলতে পারবা?'

অভূতপূর্ব একটি দৃশ্য। সূর্য ওঠা ও সূর্য অস্ত যাওয়া, দুটোই আমার বহুবার বহুভাবে দেখা আছে। এর কিছু ছবি আমি তুলেছি। সূর্যাস্তের ছবি তুলে আমি কখনোই আনন্দ পাই না। দৃশ্যটা এমনিতেই এত সুন্দর যে ক্যামেরার ছোট ফ্রেমে তাকে কোনো ব্যঞ্জনাই দেওয়া যায় না। আমার মনে হয়েছে, সুন্দরী মেয়েদের ছবি তুলে যেমন তাদের তুষ্ট করা যায় না, প্রকৃতির সুন্দর ছবিও কখনো প্রকৃতির চেয়ে সুন্দর হয় না। এ জন্য আমি সূর্যাস্তের ছবি তুলতে আগ্রহ পাই না। কিন্তু এ যে চন্দ্রোদয়ের ছবি! রুপালি থালার

AMARBOI.COM

মতো এক খণ্ড চাঁদ ধীরে ধীরে ভেসে উঠল দূরের বঙ্গোপসাগরের তলা থেকে এবং ধীরে ধীরে ওপরে উঠে তার একটা প্রতিবিম্ব তৈরি করেছে সাগরজলের ওপর। শুধু এই প্রতিবিম্বই নয়, সমুদ্রের মৃদু ঢেউয়ের আঁচড়ে চাঁদের আলো যে প্যাটার্ন তৈরি করছে, তা বিস্ময়কর।

আমি নানাভাবে মুহূর্তটির ছবি তোলার চেষ্টা করি। একটা ছবি পছন্দ হলো স্যারের। বলেন, 'আমাকে এ ছবিটির একটি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট প্রিন্ট দিয়ো। নুহাশ পল্লীর ঘরে আমি রেখে দেব।'

চাঁদের ছবি তোলা শেষ হয়। তার পরও শীতের হিমেল হাওয়ার মধ্যে আমরা দুজন জাহাজের ডেকে অনেকক্ষণ বসে থাকি। কেউ কথা বলি না কিংবা কথা বলারই প্রয়োজন হয় না।

আমি জানি, এ সময় হুমায়ূন আহমেদের অনেক কথা হয়েছে এই সমুদ্রের জল, আকাশ আর পানিতে ডোবানো চন্দ্রের সঙ্গে। চন্দ্র নিয়ে যে লেখকের এত গান, এত কথা, সে কি আর এ সময় সত্যিই ভেতরে ভেতরে চুপ ছিল? কে জানে!

সুন্দরবন সফরের দিন ফুরোতে শুরু করেছে। তিন দিন পার হয়ে গেছে। মোবাইল ফোন বন্ধ, ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ। আমরা বার ও তারিখ ভুলে যাই। শুধু বুঝি, আজ রাতের দিকে ফেরতযাত্রা শুরু হবে ঢাকার দিকে। ঢাকা পৌঁছাতে ২৮ ঘণ্টার মতো লাগবে। এই যা।

AMARBOI.COM

শেষ দিনে আমাদের জাহাজ দাঁড়িয়ে থাকে দুবলার চর থেকে সিকি কিলোমিটার দূরে, সাগরের ওপর। এখান থেকে ছোট ছোট নৌকায় যেতে হবে দুবলার চরে। দুবলার চর আগেও দেখেছি। সেটা আরেক দিকে।

হুমায়ূন আহমেদকে বলি, 'স্যার, আপনি কি জানেন, এই চরের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?'

—'না।'

—'এটা নারীশূন্য দ্বীপ। এ চরে চার-পাঁচ শ জেলে থাকে, কিন্তু কোনো মহিলা নেই।'

—'বলো কী!'

—'জি স্যার। মামুনুর রশীদের লেখা একটা নাটক আছে এ দ্বীপ নিয়ে, নাম *আদিম*।'

আমরা জাহাজের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকি। মাইকের জোরালো ঘোষণায় আমরা খুব বিরক্ত হচ্ছিলাম। ইমপিরিয়াল কলেজের কয়েকজন ইয়াং টিচার মাইক পেয়েছেন। ছাত্রছাত্রী কখন যাবে এবং কীভাবে ফিরে

আসবে, এসব বারবার বলছেন। আমি হুমায়ূন আহমেদকে বলি, 'স্যার, বোরডমের সংজ্ঞা জানেন? আমরা কেন বোর হই তার সায়েন্সটা কী, আপনার জানা আছে?'

—'না।'

আমার মনে হলো, তিনি ঠিকই জানেন। আমি জানি কি জানি না, এটুকু বোঝার জন্য তিনি 'না' বললেন। এরপর এমনভাবে তাকালেন, যেন এখনই আমাকে জানাতে হবে তার ব্যাখ্যা।

আমি যতটুকু জানি, বললাম। স্যার, আমাদের মাথায় নিউরোন সেলগুলোতে যে তথ্য একবার জমা থাকে, পুনর্বার সে তথ্য মগজ নিতে চায় না। এ জন্য আমরা বোর হই। নিউরোন যে তথ্য গ্রহণ করে, তাতে মানুষ আনন্দ পায়, যেটা বর্জন করে সেটাতে মানুষ বিরক্ত হয়।

লক্ষ করি, খুব মনোযোগ দিয়ে তিনি আমার কথা শুনলেন। তিনি সাধারণত কথা শুনতে পছন্দ করেন না। তিনি বলেই আনন্দ দেন সবাইকে। তাঁর আসরে তিনিই বক্তা, বাকি সবাই মুগ্ধ শ্রোতা। কেবল আমিই মাঝে মাঝে বেয়াদবের মতো আগ বাড়িয়ে কথা বলতে যেতাম। আমার সঙ্গে তর্কও হতো। তর্কে তিনি হারতে রাজি হতেন না।

বিকেলের সূর্য ডুবে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যে। আমরা একটা ছোট নৌকা করে দুবলার চরে এসে নামি। সামনে, পশ্চিমের সাগরে সূর্য ডোবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তীরে বড় বড় কিছু নৌকা বাঁধা।

কিছুক্ষণ পরই অন্ধকার এসে জেঁকে ধরে পুরো দ্বীপচত্বর। কেরোসিনের দু-একটা কুপি ছাড়া আর কিছু জ্বলবে না এখানে। গভীর অন্ধকারকে খুব বেশিক্ষণ আমাদের উপভোগ করা হয় না। এখানে একটা ক্যাম্প ফায়ার হবে, এমন একটা আওয়াজ আমরা পাচ্ছিলাম আগে থেকেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখি শুরু হয়ে গেছে আয়োজন।

মাঝখানে এক জায়গায় লাকড়ির স্তূপ। তাঁকে ঘিরে একটা গোলাকার বেষ্টনী বানিয়ে রেখেছেন ছাত্র-শিক্ষক-অতিথি আর তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দুবলার চরের জেলেরা।

মাজহারের হাতে হ্যান্ডমাইক। এই আয়োজনের রানিং কমেন্ট্রি দিচ্ছে সে। আয়োজনটা যথেষ্ট নাটকীয় ছিল। শাওন আর হুমায়ূন আহমেদ প্রথমে একটা লাঠিতে আগুন ধরালেন। এই আগুনের শিখা স্পর্শ করল একে একে সবাই। আর এই ক্ষণটা ফিল্মিক করার জন্য ব্যাকগ্রাউন্ডে শুরু হলো গান, 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে'।

AMARBOI.COM

শাওনকে নিয়ে তিনি পুরো চত্বর ঘুরে এসে মূল কাষ্ঠস্তম্ভে এসে আগুন দেন। শুরু হয় ক্যাম্প ফায়ার। আগুন জ্বলছে, আগুনের মিষ্টি তাপে শীতের সন্ধ্যাটা একটা রোমাঞ্চকর উষ্ণতা নিয়ে আসে।

মাইক চলে এল হুমায়ূন আহমেদের হাতে। তাঁকে কিছু কথা বলতে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা। মাইক হাতে নিয়েই বললেন, 'আই অ্যাম ভ্যারি সারপ্রাইজড...আজকের এই অনুষ্ঠান যে এত সুন্দরভাবে শুরু হবে আমি চিন্তাও করিনি...শীতের এই সন্ধ্যাবেলায় একটু দূরে সমুদ্র, ধু ধু বালুকাবেলায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি...অসম্ভব সুন্দর একটি পরিবেশ...ভিতর থেকে যে সুন্দর একটা আলো এই সন্ধ্যায় বেরিয়ে আসছে...এই আলোকিত সন্ধ্যাটি মনে হচ্ছে শুধু আমাদের জন্য...'

হুমায়ূন আহমেদকে কথায় পেয়ে বসেছিল সে সন্ধ্যায়। তিনি একে একে তাঁর সঙ্গে আসা তাঁর বন্ধুদের ডেকে এনে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। সবার আগে ডাকেন ঢাকা কলেজে (১৯৬৫) পরিচয় হওয়া তাঁর বন্ধু স্থপতি আবু করিমকে। কলেজের ছাত্রছাত্রীর কাছে তাঁর বন্ধুদের বড় করে পরিচয় করিয়ে দিতেই তিনি ব্যাকুল। প্রত্যেকের নামের পাশে অসংখ্য বিশেষণ যোগ করলেন। সন্ধ্যার অন্ধকারে এখানে বেশিক্ষণ থাকার সুযোগ নেই, সুবিধাও নেই। কেরোসিনের কুপি নিয়ে শুঁটকি-জেলেরা যে যার ঘরে বসে আছে। আমরাও ফিরে আসি। জাহাজে এসে শুনি, হিসাবে একটা ছেলে কম এসেছে। এ নিয়ে হইচই হচ্ছে। মাইক পেয়েছেন এক তরুণ প্রভাষক। তিনি বারবার এই ঘোষণা দিয়ে যাচ্ছেন।

রাতের বেলা স্পেশাল ডিনারের আয়োজন আছে। বেশ কিছু ইভেন্টও এখানে হয়েছিল রাতে, ডিনারের আগে। রাতের খাবার আমাদের খেতে হবে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে।

আলোচনা অনুষ্ঠানের একপর্যায়ে আবার মাইক হাতে এল হুমায়ূন আহমেদের। তাঁর বক্তৃতার তিনটি অংশ আমাকে মুগ্ধ করল।

১. বক্তৃতার শুরুতে ইমপিরিয়াল কলেজের ভাষ্যকারদের কঠোর সমালোচনা করলেন। বললেন, 'কেন একই তথ্য বারবার দিয়ে শ্রোতাদের বিরক্ত করছেন?' মজার ব্যাপার হলো, তিনি এই বক্তৃতায় 'বিরক্তি' তৈরি হওয়ার বৈজ্ঞানিক কারণগুলো ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। অবলীলায় বললেন, 'বিষয়টি আমি জানতাম না, কিছুক্ষণ আগে শাকুর মজিদ আমাকে এটা বলেছে। বিষয়টা তোমরাও জেনে রাখো, তোমাদের কাজে লাগবে।' দেখে আমি মুগ্ধ।

AMARBOI.COM

২. দ্বিতীয় প্রসঙ্গ ছেলে হারানো। তিনি বললেন, 'আমি জাহাজে এসে যখনই শুনলাম, একটা ছেলেকে পাওয়া যাচ্ছে না, আমি শিহরণ বোধ করছিলাম। দেখি না কী হয়! ছেলেটাকে যদি পাওয়া না যায়, সে ক্ষেত্রে কী কী ঘটনা ঘটতে পারে, আমি একে একে সাজাচ্ছিলাম। আবার ছেলেটা কী কী কারণে মিসিং হতে পারে, সেগুলোও সাজালাম। আমার ধ্যান ভেঙে গেল যখন শুনলাম, ছেলেটিকে পাওয়া গেছে। তাকে খুঁজে পেতে আরেকটু দেরি হলে আমার আনন্দ আরেকটু বেড়ে যেত। মানুষের যেকোনো সংকটকালীন মুহূর্ত উপভোগ করার মধ্যেও একধরনের আনন্দ পাওয়া যায়। আমি এ বিষয়টি বেশ উপভোগ করি।' ছাত্র হারানোর পর সে যখন ফিরে এল তখন তার বন্ধুদের চোখেমুখে একধরনের মুগ্ধতার রেখা ফুটে উঠবে। রেখাটি লেখককে মুগ্ধ করবে।
৩. এখন তোমাদেরকে আমার একটি মুগ্ধতার গল্প শোনাই। আমি তখন লেকচারার হিসাবে যোগ দিয়েছি। কেমিস্ট্রির ভাইভাতে দেখি একটা মেয়ে অনুপস্থিত। এটুকু বলে তিনি সেই পুরনো গল্পটি আবার এই ছাত্রদের শোনালেন। দুই যুগ আগে বুয়েটের তিতুমীর হলের ছাত্রদেরকে যে ছাত্রীর কাহিনি শুনিয়েছিলেন, হুবহু সেই কাহিনি।

রাতের শেষ আয়োজনের জন্য প্রস্তুত কলেজ কর্তৃপক্ষ। এখন এক-এক করে তিনটি ফানুস উড়বে আকাশে। ফানুস ওড়ানোর কাজটি শুরু করবেন হুমায়ূন আহমেদ। আমরা যথারীতি জাহাজের বারান্দায় বসে পড়ি। আজ আমাদের শেষ আড্ডা। তাসের আড্ডার ডেকের ওপর ফানুসের আয়োজন হবে, কিন্তু হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না। বারবার বলছেন, 'এগুলো বাচ্চারা মজা পাবে, তাদের দিয়ে করাও, আমি নেই।' 'আমি নেই' বললেই তো আর নেই হওয়া যায় না। তাঁকে যেতে হলো দোতলার বড় ডেকে এবং সঙ্গে তার সাঙ্গোপাঙ্গও, মানে আমরা।

হুমায়ূন আহমেদ একটা ফানুসে অগ্নিসংযোগ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে এটা ফুলে যেতে শুরু করল এবং একসময় মনে হলো, যেন একটা আগুনের গোলা কচ্ছপ গতিতে আকাশের দিকে মিলিয়ে যাচ্ছে।

—'এর নাম তাহলে ফানুস, স্যার?'

হুমায়ূন আহমেদ এ প্রশ্নের জবাব দেন না, শুধু মুখের দিকে তাকান। একটু পর বলেন, 'কেন, আগে দেখোনি কখনো?'

—'না স্যার। এর আগে কখনো ফানুস দেখিনি। একবার এক কবিতায় পড়েছিলাম এক শ ফানুস ওড়ানোর আজন্ম সলজ্জ সাধ ছিল সেই তরুণের।

AMARBOI.COM

তখনই ফানুস শব্দটা আমার মাথায় আসে, আমারও দেখতে ইচ্ছে করে, ওখানে কী আছে, এক শ ফানুস ওড়ালে কী হবে?'

আমাকে অবাক করে দিয়ে হুমায়ূন আহমেদ বলেন, 'আমিও আজ প্রথম দেখলাম এবং ওড়ালাম।'

আমাদের তিনটা ফানুস একে একে আকাশের সঙ্গে মিলিয়ে গেল।



অকৃতী অধমের হাতে পাঁচটি নীলপদ্ম

বিয়ানীবাজার থেকে একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা বের হয়, নাম *বিয়ানীবাজার বার্তা*। সম্পাদক ছাদেক আহমদ আজাদ একাই পত্রিকার সব কাজ করে। প্রায়ই সে কিছু কিছু উদ্ভট কাজের প্রস্তাব নিয়ে আসে আমার কাছে।

২০০৯ সালের ১ অক্টোবর আমাদের পর্যটকের দল ইস্তাম্বুল ও মিসর সফরে যাবে, সেদিনই কম্পিউটার বন্ধ করার আগে একটা ই-মেইল পাই ছাদেক আজাদের। তার ইচ্ছা, এ বছর আমার ৪৫তম জন্মদিন উপলক্ষে সে ৪৫ জন লেখকের লেখা নিয়ে একটা স্যুভেনির বের করবে। আমার অনুমতি চায়। আমি ইংরেজি 'ওকে' হরফটি লিখে রিপ্লাই দিলাম এবং সেদিনই ভোররাতে ইস্তাম্বুলের পথে রওনা হয়ে গেলাম।

AMARBOI.COM

কয়েক দিন পর মেইল খুলে দেখি, ছাদেক আজাদ এর মধ্যে কয়েকটা লেখা জোগাড় করে ফেলেছে, সেগুলো আমাকে ফরোয়ার্ড করেছে। সে নতুন সমস্যায় জর্জরিত, ঢাকার আমার বন্ধুবান্ধব এবং নামীদামি লেখক, যাঁরা আমাকে চেনে, তাঁদের কারও সঙ্গেই তার কোনো যোগাযোগ নেই। এঁদের লেখা কী করে পাবে?

আমি ছাদেককে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছি, আমি কারও কাছে লেখা চাইব না।

তাতে তার খুব অসুবিধা হলো না, তাকে কিছু নাম, ফোন নম্বর, ই-মেইল ঠিকানা দেওয়া হলো, সে যোগাযোগ করে লেখা পেতে থাকল। বিপদে পড়ল একজনকে নিয়ে—হুমায়ূন আহমেদ। হুমায়ূন আহমেদের ই-মেইল নেই, তাঁকে ফোন করবে, সে রকম ব্যক্তিগত সম্পর্কও নেই। আমার কাছে কাকুতি-মিনতি করে, 'যে করেই হোক হুমায়ূন আহমেদের লেখা আপনি আমাকে জোগাড় করে দিন।'

পড়লাম বিপদে।

দখিন হাওয়ার আড্ডার এক ফাঁকে বিভিন্ন লেখকের কাছে লেখা চাওয়ার ই-মেইল টেক্সটের একটা কপি শাওনের হাতে দিলাম। সে পড়ে বলল, 'বাহ্, কনগ্র্যাচুলেশনস। আপনার জন্মদিনের স্মারকগ্রন্থ বেরোচ্ছে!'

আমি বললাম, 'নিচের দিকের অংশ পড়ো।'

শাওন পড়ল, মিষ্টি করে হাসল এবং চোখমুখের ইশারায় যা বোঝাল, তা হচ্ছে, আপনার ওপর লেখাটার কথা আমি তাকে বলব।

আমার জন্মদিনের বিষয়টির কথা তাঁকে আর বলা হয় না। নভেম্বর মাস এসে গেছে। প্রথম সপ্তাহ শেষ। দ্বিতীয় সপ্তাহে তাঁর নিজের জন্মদিন, তৃতীয় সপ্তাহ শেষ হলেই আমার জন্মদিন।

নভেম্বরের সাত তারিখ শাওন আমাকে ফোন করে বলে, 'আপনার জন্য একটা অতি সুসংবাদ আছে। লেখাটি এইমাত্র আমাকে পড়ে শুনিয়েছে, অসাধারণ লেখা। 'তাঁর হাতে নীল পদ্ম পাঁচটি' নামে। তাঁর একটা উপন্যাসও আছে—*হিমুর হাতে পাঁচটি নীল পদ্ম*। কাল সন্ধ্যায় আপনাকে আসতে বলা হয়েছে। এসে লেখা নিয়ে যান।'

পরদিন হুমায়ূন আহমেদের পছন্দের কিছু খাবার নিয়ে হাজির হয়ে যাই। দখিন হাওয়ায় ফ্ল্যাটের ড্রয়িংরুমে কার্পেট বিছানো হয়েছে, তার ওপর চাদর। গোল হয়ে বসে থাকি সবাই। হুমায়ূন আহমেদ, শাওন ছাড়াও আছেন আলমগীর ভাই, মাজহার, কমল। স্যারের পাশে ভাঁজ করা কাগজ। সবাই এসে গেলে শাওনকে স্যার বললেন লেখাটি পড়তে।

শাওন হাতে কাগজগুলো নিয়ে বলল, 'শাকুর ভাই, আপনি হচ্ছেন দ্বিতীয় ভাগ্যবান, যার জন্মদিনের স্মরণিকার জন্য হুমায়ূন আহমেদ লিখলেন। এর আগে শুধু ইমদাদুল হক মিলনের জন্মদিনে একটা লেখা লিখেছিল ও।' লেখাটি পড়া শুরু করে শাওন :

> তখন শহীদুল্লাহ হলে থাকি। আমার কাজ তিনটা।
>
> ছাত্র পড়ানো, লেখালেখি ও সাহিত্যপ্রেমীদের হাত থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা।
>
> এরকম দুজন সাহিত্যপ্রেমী যুবকের একজনের নাম শাকুর মজিদ। ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক। কোনো এক পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। সে দায়িত্ব নিয়েছে ঐ পত্রিকায় আমার লেখা উপন্যাস ছাপবে।
>
> আমি পাকাল মাছের মতো তার হাত থেকে বাঁচার চেষ্টায় জীবন কাটাচ্ছি। প্রতি সপ্তাহেই 'উপন্যাস' কেন দিচ্ছি না সেই বিষয়ে নতুন নতুন অজুহাত তৈরি করছি। হঠাৎ একদিন পরম করুণাময় আমার উপর করুণা করলেন। সাহিত্য পত্রিকাটির মৃত্যু হল। শাকুর মজিদ নামের অতি আগ্রহী তরুণও ডুব মারল।

AMARBOI.COM

> তারপর ঢাকা শহরের কলের ট্যাপ দিয়ে ওয়াসার অনেক পানি পড়ল। আমি প্রথম ভুললাম শাকুর মজিদের চেহারা। তারপর ভুললাম নাম। দেড় বছর আগে আবার সে উদয় হল। এক সঙ্গে অনেকগুলো পরিচয় নিয়ে।
>
> আর্কিটেক্ট, ভূ-পর্যটক (প্রায় রামনাথ), লেখক, পরিচালক ও ফটোগ্রাফার। যখন কেউ নানান দিকে প্রতিভার বিচ্ছুরণ ঘটায় তখন তার শারীরিক কিছু পরিবর্তন ঘটে। মাথায় চুল কমতে থাকে। শাকুরের ক্ষেত্রেও তাই হল। প্রায় চুলশূন্য মাথার শাকুর মজিদকে চিনতে পারলাম না। আবছাভাবে মনে পড়ল তাকে দেখেছি। কিন্তু কোথায় দেখেছি?
>
> সন্ধ্যা মেলাবার পর প্রায় দিনই আমার বাসায় আড্ডা বসে। আমার অতি ঘনিষ্ঠজন ছাড়া সেই আড্ডায় কেউ আসতে পারে না। শাকুর মজিদ অতি দ্রুত আড্ডায় স্থান করে নিল। এখন সে নিয়মিত আড্ডাধারীদের একজন। সে কোনো কারণে উপস্থিত না হলে জরুরি টেলিফোন করে আনানো হয়। আড্ডায় এসে সে প্রথম যে বাক্যটি উচ্চারণ করে তা বেশ মজার। সে শুকনা মুখ করে বলে, 'ঘরে কি কোনো খাবার আছে? আমি ক্ষুধার্ত।'
>
> শাকুর মজিদকে নিয়ে যে গ্রন্থটি তার জন্মদিন উপলক্ষে প্রকাশিত হবে সেখানে তার Creative নানান দিক নিয়ে অবশ্যই আলোচনা হবে। আমাকে তার যে গুণটি আকৃষ্ট করেছে তা হলো সত্য কথা বলার সাহস।
>
> উদাহরণ দেই। একদিন আমি তাকে বললাম,' তুমি সব সময় একা আসো কেন? তোমার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে আসো না। সে বলল, আমার স্ত্রী আপনাকে একেবারেই পছন্দ করে না। এই জন্য তাকে আনি না।
>
> অবশ্যই সত্য কথনে সাহস লাগে। শাকুর মজিদ সাহসী মানুষদের একজন। আমি মনে করি তার সমস্ত সৃষ্টিশীল কর্মকাণ্ডের চালিকা শক্তি এই 'সাহস'।
>
> শাকুর মজিদ, শুভ জন্মদিন। পরম করুণাময়ের করুণাধারা তোমার উপর বর্ষিত হোক। জন্মদিনে এই শুভ কামনা।

AMARBOI.COM

আমার স্ত্রী তাঁকে পছন্দ করে না বলে যে তথ্য তাকে প্রথম দিনই জানিয়েছিলাম, সে তথ্য তিনি যত্ন করে লালন করে আসছেন! আমি লেখাটি পড়ে কিঞ্চিৎ চিন্তিত হয়ে পড়ি। কিছুদিন পর, (২২ নভেম্বর) আমার জন্মদিনে এই বইটার প্রকাশনা অনুষ্ঠান হবে, সেখানে আমার স্ত্রীর সঙ্গে মুখোমুখি হলে হুমায়ূন আহমেদ কী আচরণ করেন, চিন্তায় পড়ে যাই।

এমনিতে আমাদের দখিন হাওয়ার আড্ডাবাজেরা ক্রমান্বয়ে প্রায় প্রত্যেকের বাড়িতে ঘুরে ঘুরে দাওয়াত খাইয়েছেন। আমার বাড়ির দরজা হুমায়ূন আহমেদের জন্য বন্ধ, সুতরাং আমি দাওয়াত দিতে পারি না। আমি আমার অফিসে তাঁদের সবাইকে ডাকি। আমার অফিসের ছাদটিতে ছাতা টাঙানো একটা জায়গা আছে, সেখানে বসে আড্ডা দিই, হোটেল থেকে খাবার

এনে খাওয়াই। কিন্তু এবার জন্মদিনের অনুষ্ঠানে হুমায়ূন পরিবার আমার পরিবারের মুখোমুখি হবে। কি-না-কি ঘটে যায়। আমি আশঙ্কায় থাকি।

২০০৯ সালের ২২ নভেম্বর। গুলশানের ক্যাডেট কলেজ ক্লাবের রেস্টুরেন্ট ফ্লোরে আয়োজন করা হয় আমার জন্মদিনের অনুষ্ঠান (আয়োজক *বিয়ানীবাজার বার্তা*, খরচপাতি আমার)। প্রধান অতিথি অধ্যাপক ড. সফিউদ্দিন আহমদ, জন্মদিনের স্মারকগ্রন্থ *আলোকধনু*র উদ্বোধক হুমায়ূন আহমেদ। আমার বন্ধুবান্ধব-স্বজনেরা উপস্থিত। প্রায় ১৫০ জনের উপস্থিতিতে মোড়ক উন্মোচনের জন্য ডাক পড়ল শুধু হুমায়ূন আহমেদের। আমি স্ত্রীর ভয়ে শাওনকে মঞ্চে ডাকতে সাহস পাইনি। এটা আমার ঠিক হয়নি, শাওনকেও ডাকা উচিত ছিল। ভরসা ছিল একটা যুক্তি, তা হলো হুমায়ূন আহমেদকেও দেখেছি, তিনি তাঁর স্ত্রীর ইচ্ছার বাইরে কোনো কিছু করতে বা কোথাও যেতে সাহস পাননি, আমি কোন ছার!

উপস্থাপক, আমাদের পঞ্চপর্যটকের টিমলিডার স্থপতি কাজী এম. আরিফ, সপরিবারে আমাকে ডাকলেন আর ডাকলেন শুধু হুমায়ূন আহমেদকে। হুমায়ূন আহমেদ সুযোগ পেয়ে গেলেন রসিকতা করার। যে বইটির মলাট তিনি খুললেন, তার ভেতর দেখা গেল অন্য বই। ভুল করে একই রঙের মলাট দেখে আরেকটি বই তাঁর হাতে দেওয়া হয়েছিল। মজা করার চমৎকার সুযোগ পেয়ে যান তিনি। আমি লক্ষ করি, হুমায়ূন আহমেদের প্রতিটি শব্দ উপস্থিত দর্শকেরা প্রাণভরে উপভোগ করছেন। অনেক রসিয়ে রসিয়ে অনেক ভালো ভালো কথা বললেন। আমার প্রশংসাসূচক কেউ কিছু বললে আমার বেশি মনে থাকে না, এ জন্য বক্তৃতার বিশদ বর্ণনাও দিতে পারছি না। শুধু একটি কথা মনে আছে, আমার উদ্দেশে তিনি বলেছিলেন, 'আজকের এই অনুষ্ঠানে এত লোকের কাছ থেকে এত এত প্রশংসা শুনে শাকুরের মধ্যে যাতে কোনো অহংকার না জন্মে, এটা আমি তার কাছ থেকে আশা করব।'

AMARBOI.COM

অনুষ্ঠান শেষে অতিথিরা চলে যান। আমার স্ত্রী রেস্টুরেন্ট ফ্লোরে তাঁদের তদারক করেন। আমি হুমায়ূন আহমেদ ও তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের নিয়ে ক্লাবের তেতলায় চলে যাই। রাতের খাবারের জন্য সেখান থেকে নিচে নামি রাত সাড়ে ১১টায়। আমরা দুই পরিবার আর হুমায়ূন-বন্ধুরা একসঙ্গে খেতে বসি।

টেবিলের মাথার আসনে বসেছেন হুমায়ূন আহমেদ। তাঁর ডান পাশের আসনে শাওন, বাঁ পাশের আসনে আমার স্ত্রীকে বসিয়ে আমি বসলাম পাশাপাশি। এবং লক্ষ করলাম, খাওয়ার টেবিলে বসে সবাই বেশ খোশ মেজাজে গল্প করছেন। আমার আনন্দ বেড়ে যায়।

খাওয়া শেষে আমার ছোট ছেলে ইবনকে নিয়ে গল্পে মেতে ওঠেন হুমায়ূন

আহমেদ। কারও কাছ থেকে একটা কয়েন সংগ্রহ করে এটা লুকানোর দু-তিনটা জাদু ইবনকে দেখিয়ে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে মুগ্ধ করে ফেলেন।

একপর্যায়ে ইবনকে প্রশ্নবাণে বিব্রত করা হয়। স্যারের প্রশ্ন, 'তুমি কাকে বেশি ভালোবাসো? বাবাকে না মাকে? একজনের নাম বলতে হবে। "দুজনই" বলা যাবে না।' ইবন প্রশ্নের কোনো জবাব দেয় না।

আমার স্ত্রী জলির সঙ্গে দেখি স্যারের বেশ ভাব। শাওনের সঙ্গেও সে হেসে হেসে কথা বলছে।

একপর্যায়ে স্যার জলিকে বললেন, 'ভাবি, আপনি যদি অনুমতি দেন, তবে আগামীকাল সন্ধ্যায় আমার বাসায় আমি আমার মতো করে শাকুরের জন্মদিনের একটা পার্টি দেব। আপনি কথা দেন যে আপনিও আপনার বাচ্চাদের নিয়ে আমার বাসায় আসবেন। আমার কিছু বন্ধুবান্ধবকেও দাওয়াত দেব, তাদের একজনের নাম জুয়েল আইচ।'

আমাকে অবাক করে দিয়ে জলি রাজি হয়ে গেল। ঠিক হলো, পরের দিন সন্ধ্যায় আমরা দখিন হাওয়ায় যাব।

পরদিন দুপুরবেলা শাওনের ফোন—'শাকুর ভাই, প্রোগ্রাম ঠিক তো!'

আমি বললাম, 'সব ঠিক। সাড়ে সাতটায় চলে আসব।'

যে দখিন হাওয়ার বাসায় যাওয়া নিয়ে এত দিন মুখ কালো করে রেখেছিল জলি, সে আমার সঙ্গে যেতে রাজি হয়েছে। হুমায়ূন আহমেদ অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে জলিকে গ্রহণ করেন। আলাপের একপর্যায়ে খুব সুন্দর করে বলেন, 'ভাবি, আমরা আগামী সপ্তায় নেপাল যাব। আমার ইচ্ছা, শাকুরও আমাদের সঙ্গে যাবে। কিন্তু সে বলছে, স্ত্রী ছাড়া সে যাবে না। ভাবি, আমার অনুরোধ, আপনিও আমাদের সঙ্গে চলুন।'

জলি বলে, 'আমার তো জিও (সরকারি আদেশ) লাগবে, তখন সে জগন্নাথ কলেজের সহকারী অধ্যাপক।' হুমায়ূন আহমেদ বলেন, 'এটা আমার দায়িত্ব। আমি কালকের মধ্যে করে দিব।'

তার পরও জলি স্পষ্ট করে বলে না, সে আদৌ যাবে কি না।

আলাপের প্রসঙ্গ পাল্টায়। কিন্তু নেপাল বারবার ঘুরে আসে। হুমায়ূন আহমেদ আর শাওন পাশাপাশি বসা। আছেন আলমগীর ভাই, আর্কিটেক্ট করিম ভাই, মাজহার, কমল। শাওনকে একটা গান গাইতে অনুরোধ করেন হুমায়ূন আহমেদ। রবীন্দ্রসংগীত। গান শেষ হলে হুমায়ূন আহমেদ বলেন, একবার তাঁরা নেপালে বেড়াতে গিয়েছিলেন (সম্ভবত ১৯৯৬-৯৭ সালে)। পাহাড়ের নিচে খুব সুন্দর একটা নদী। নদীতে নৌকার ওপর বসে শাওনের

AMARBOI.COM

কণ্ঠে তিনি এই গানটি শুনেছিলেন। সেদিনই তাঁর মনে হয়েছিল, যে মেয়ে এ রকম গান গাইতে পারে, তার হাত ধরে একটা জীবন কাটিয়ে দেওয়া যায়। এই ঘটনাতেই মূলত শাওনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের সূচনা।

জলি সব শোনে। কিছু বলে না। নেপালের ব্যাপারে আমাদের কোনো সিদ্ধান্ত হয় না। বলা হয়, আগামীকাল সে জানাবে। আমাদের আসর চলতে থাকে। খাওয়াদাওয়া হয়ে যায়। আবার গানের আসর। একপর্যায়ে হুমায়ূন আহমেদ বলেন, গতকালের অনুষ্ঠানে যাওয়ার আগে শাওন একটা গান প্র্যাকটিস করে গিয়েছিল। তার ইচ্ছা ছিল অনুষ্ঠানে গানটির চার লাইন সে খালি গলায় গেয়ে শোনাবে। কিন্তু কেউই তাঁকে ডাকেনি বলে গানটি সে শোনাতে পারেনি। গানটি এখন শাওন গাইবে। রজনীকান্তের গান। শাওন গান ধরল :

আমি অকৃতী অধম বলেও তো কিছু কম করে মোরে দাও নি
যা দিয়েছো তারই অযোগ্য ভাবিয়া কেড়েও তো কিছু নাও নি

আমার মনে হলো, আমি কী এমন 'রসগোল্লা' হয়ে গেছি যে আমাকে তুষ্ট করার জন্য হুমায়ূন আহমেদ এমন আয়োজন করবেন? কিন্তু আমি নিশ্চিত, এটা আসলে আমার জন্য নয়। হুমায়ূন আহমেদ আসলে চেয়েছিলেন আমার স্ত্রীর মুগ্ধতা। এত বড় একজন মানুষ তার স্বামীর জন্মদিন উপলক্ষে দ্বিতীয়বার শুধু তার জন্য এ আয়োজন করছে দেখে পতিপ্রাণা এই স্ত্রী কী রকম মুগ্ধতা প্রকাশ করেন, সেটা দেখার জন্যই ছিল তাঁর এই আয়োজন।

দখিন হাওয়ার বাড়ি থেকে বেরোনোর পর নিজের বাসায় যাওয়া এবং পরদিন সকাল পর্যন্ত আমার স্ত্রী কোনো কথাই বলেন না। নেপাল যাওয়ার বিষয়ে আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করারও সুযোগ পাইনি।

AMARBOI.COM



তাঁর শেষ ছবি

অনেক দিন দখিন হাওয়ায় যাওয়া হয় না। শুনি, স্যার নতুন ছবির স্ক্রিপ্ট লিখছেন, এটা নিয়ে ব্যস্ত। একদিন বললেন, 'এটাই আমার শেষ ছবি, নাম হবে *ঘেটুপুত্র কমলা*। সিনেমা বানানো শরীরে সয় না, এরপর আর কোনো ছবি বানাব না।'

২০১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একদিন হঠাৎ শাওন ফোন করে বলে, 'আপনাদের অঞ্চলে হাওরের পাশে কোনো জমিদারবাড়ির খোঁজ দিতে পারেন? আমরা যে লোকেশন ঠিক করেছিলাম, সেটা ওর (হুমায়ূন আহমেদ) পছন্দ হচ্ছে না।'

হঠাৎ আমার মাথায় আসে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর থানার একটি জমিদারবাড়ির কথা। সেটি গুনিয়াউক গ্রামের পাশের হরিপুর গ্রামের জমিদারের পরিত্যক্ত বাড়ি। ২০০০ সালে আমরা ১০ দিন ছিলাম এ গ্রামে। টেলিফিল্ম *নাইওরী* শুট করে ট্রলারে চেপে ফেরার পথে এই চমৎকার বাড়িটি দেখেছিলাম। হাওরের সঙ্গে ঘাটলা বাঁধানো। পানিতে টইটুম্বুর পুরো এলাকা। আমরা কিছু ছবিও তুলেছিলাম।

ফোনে আমি শাওনকে এই দৃশ্যেরই বর্ণনা দিই। লক্ষ করি, শাওন বেশ উত্তেজিত বোধ করছে। মনে হলো, এ রকম একটা লোকেশনই তারা খুঁজছে। এরপর আমি অনেক অসুবিধার কথা শোনালাম। বললাম, ওটা সম্ভবত একটা পোড়োবাড়ি, যেকোনো সময় ভেঙে পড়তে পারে। শাওন জানাল, জায়গা দেখার জন্য কাল ভোরেই সে লোক পাঠাবে।

আমি আরও কিছু তথ্য দিলাম: জমিদারবাড়িটি যে ইউনিয়নে, তার চেয়ারম্যানের নাম লাল মিয়া। তাঁর চেহারা অতি কৃষ্ণকায়, তিনি সারাক্ষণ পান চিবান। তাঁর সঙ্গে কথা বলে সেই সব জেনে নেয়। পরদিন সন্ধ্যায় আবার শাওনের ফোন: 'থ্যাংক ইউ শাকুর ভাই, আমরা বাড়ি ও লোকেশনের ভিডিও দেখেছি। লোকেশন ফাইনাল। লোক চলে যাচ্ছে বাড়ি রিনোভেট করতে। কিছু প্লাস্টার করা হবে, রং দেওয়া হবে। রং শুকালেই শুটিং। আর শোনেন, লাল মিয়া মারা গেছেন কয়েক বছর আগে। নতুন চেয়ারম্যান নিশ্চয়তা দিয়েছেন, আমাদের সব ধরনের সহযোগিতা করবেন। সুতরাং আমরা *ঘেটুপুত্র কমলা*টা এখানেই করছি।'

এক সন্ধ্যায় দখিন হাওয়ার আড্ডায় অতি উৎসাহী হয়ে মাসুদ আখন্দ কিছু স্টিল ছবি দেখাতে চাইল। বড় কম্পিউটার স্ক্রিনে স্টিলগুলো দেখে আমরা সবাই মুগ্ধ হলাম।

—'এত সুন্দর মেয়ে পাইলেন কোথায়, স্যার?'

—'আরে গাধা, ওটাই তো কমলা। ঘেটুপুত্র মেয়ে হতে যাবে কেন, ওকে মেয়ে বানানো হয়েছে।'

শাওন শোনাল, কী করে টোকাই থিয়েটারের এ ছেলেকে পাওয়া গেল। আমি চিনতে পারি না। বলা হলো, বাংলালিংকের বিজ্ঞাপনে এক জেলের

ছেলের চরিত্র করেছে। এবার চিনতে পারি। দুর্দান্ত অভিনেতা এই ছেলেটা। একটু বড় হয়ে গেছে এখন।

২০১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমি ও আমার পঞ্চপর্যটক দল তিন সপ্তাহের জন্য পূর্ব ইউরোপ সফরে বেরিয়ে পড়ি। অনেক দিন স্যারের সঙ্গে যোগাযোগ নেই। দেশে ফিরে এসে শুনলাম *ঘেটুপুত্র কমলার* শুটিং শুরু হয়ে গেছে।

অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে ইউনিট যখন নাসিরনগর থানার এই লোকেশনে গিয়ে পৌছায়, তখন ভরা বর্ষার ভাটা শুরু হয়ে গেছে। প্রায় প্রতিদিনই ছয়-সাত ইঞ্চি করে পানি কমতে থাকে। আমি প্রতিদিনের শুটিংয়ের খবর পাই।

এদিকে মাজহার মেরুদণ্ডজনিত সমস্যায় আক্রান্ত হয়ে ডাক্তারের পরামর্শে শয্যাশায়ী। তার লোকেশনে যাওয়া হচ্ছে না। একদিন আমাকে ফোন করে বলে, স্যার নাকি বলেছেন, 'তোমার না হয় পিঠ ভাঙা, শাকুরের তো কিছু হয় নাই, ও আসছে না কেন?' মাজহারের কথার ইঙ্গিতটা এমন, শুটিং শেষে স্যার যখন আড্ডায় বসেন, প্রতিদিনই নাকি আমাদের কথা বারবার বলেন।

এক শুক্রবারে আমি ঢাকা থেকে রওনা হলাম। ঢাকা-সিলেট হাইওয়ে ধরে মাধবপুর বাজার থেকে পশ্চিম দিকে তিন-চার কিলোমিটার পথ। রাস্তাঘাটের বেশ উন্নতি হয়েছে। ১০ বছর আগে এই অক্টোবর মাসের ভরা বর্ষায় আমরা ওই বাজার পর্যন্ত গিয়েছি ট্রলারে করে। কাদামাখা পথে রিকশা চলেছে বটে, কিন্তু গাড়ি নয়। আমাদের গাড়ি থাকত মাধবপুর থানার কম্পাউন্ডে পুলিশের হেফাজতে।

হরিপুর বাজারে পৌছাতে প্রায় শেষ বিকেল। হাওরের পানি নেমে এসেছে অনেক। চার-পাঁচ ফুট তো হবেই। গিয়ে দেখি, লোকেশনে কতগুলো গাড়ি ছাড়া কেউ নেই। দুটি বজরা নিয়ে সবাই গেছে শুটিংয়ে। আমি যে ওই দলে গিয়ে যোগ দেব, তার উপায় নেই। যে দু-একটি জেলে নৌকা পেলাম, অনেক টাকার প্রলোভন দিয়েও তাদের মন ভেজাতে পারলাম না।

সন্ধ্যার আগে আগে জমিদারবাড়ির ঘাটলায় বসে পশ্চিমের দিগন্তে ভাটা যাওয়া হাওর থেকে জেগে ওঠা খেতের আল এবং তার ওপর দিয়ে হেঁটে চলা জেলেদের দেখা ছাড়া আমার কাজ নেই। বিকেলের সূর্য হেলে পড়েছে। তার আবিরটুকু, তার রক্তিম আভা মেলে ধরেছে প্রকৃতিতে। আমি একটা জেলে নৌকায় উঠে পড়ি এবং তাদের সঙ্গে মাঝ হাওর পর্যন্ত চলে যাই। জেলে-মাঝিরা জানায়, মাঝরাতে তারা মাছধরা শুরু করবে। ভোররাত পর্যন্ত মাছ ধরে নিয়ে আসবে ওই ঘাটে। মাছ বিক্রি নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই। যিনি হাওরের ইজারা নিয়েছেন তিনিই বিক্রিবাট্টা করেন। এরা সবাই মাস শেষে বেতন পায়। আলাপের মাঝখানেই মাত্র দুটি বেনসন সিগারেট খাওয়ানোর

পর ওদের সঙ্গে আমার খাতির অনেক গুণ বেড়ে যায়। তারা রাজি হয়, সারা রাত আমাকে তাদের নৌকায় রাখবে, রাতে খাওয়াবে এবং ভোরবেলা যেখানে বলব, সেখানে পৌঁছে দেবে। আমার হাতের স্টিল ক্যামেরা আর ল্যাপটপ নিয়ে তাদের একটু চিন্তা। মাঝেমধ্যে ডাকাতিও হয় এখানে। তবে এখন তারা নিশ্চিত, পানি নেমে এসেছে। ডাকাতদের উপদ্রব এখন অনেক কম।

আমাদের নৌকা সিকি মাইলের মতো পথ পাড়ি দেওয়ার পর দেখি, শুটিং নৌকা ফিরে আসছে ঘাটে। এখন কী করি? ফোনে ফোনে যোগাযোগ হচ্ছে। শুনতে পাচ্ছি, সন্ধ্যার পর এখানে আর কোনো কাজ নেই। মাধবপুর থেকে সামান্য দূরে 'হাইওয়ে ইন'-এ চলে যাবে সবাই, আমাকে সেখানেই চলে যেতে বলা হলো।

হাওরে রাত্রিবাসের প্রোগ্রাম বাতিল। আমি আমার মাঝি ভাইদের নৌকার ইউটার্ন দিতে অনুরোধ করি। একটা বাজারের ঘাটে নৌকা ভেড়ে। জেলে-মাঝিরা কী কারণে জানি না, নৌকায় না উঠে আমার ক্যামেরা-ল্যাপটপ বয়ে নিয়ে এল গাড়ি পর্যন্ত। ওদের কিছু টাকা দিয়ে বিদায় নিই। আমার ড্রাইভার সেখানে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে।

ইউনিটের ক্রুরা সবাই আমার পরিচিত। ওরা এখানেই কোনো এক বাড়িতে থাকে। ওদের সঙ্গে আমার ড্রাইভারের থাকার ব্যবস্থা করে আমি স্টিয়ারিং ধরি। মিনিট বিশেকের মাথায় গিয়ে পৌঁছাই হাইওয়ে ইনে।

ঢাকা-সিলেট পথে বাসযাত্রীরা এর নিচতলা ও দোতলার অর্ধেকটায় যে রেস্টুরেন্ট, তাতে খাওয়াদাওয়া সারে। তার অপর পাশে ছয়টি মাত্র গেস্টরুম। প্রতি রুমে দুটি করে সিঙ্গেল বিছানা বসানোর পর জায়গা খুব একটা ফাঁকা থাকে না। এমন ব্যবস্থা নিয়ে এই হোটেলই এখানকার সেরা হোটেল। তার দুটি কামরা হুমায়ূন আহমেদ দম্পতি, তাঁদের দুই শিশুপুত্র ও তাদের সহকারীর জন্য। বাদবাকি চারটা কামরায় আটজনের থাকার বন্দোবস্ত।

শুটিংয়ের ক্লান্তি ঝরানোর জন্য হুমায়ূন আহমেদ বসেছেন আড্ডায়। এ আড্ডায় আমার কাছে দুজনমাত্র নতুন মুখ। তারিক আনাম খান আর কণ্ঠশিল্পী আগুন। আগুন এ ছবিতে চিত্রকরের ভূমিকায় অভিনয় করছেন। তারিক আনাম খান এর আগে হুমায়ূন আহমেদের কোনো ছবিতে অভিনয় করেছেন বলে মনে পড়ছে না। প্রথম দিকের অনেকগুলো উল্লেখযোগ্য নাটকে তিনি অভিনয় করেছিলেন। তবে একটা সূত্র থেকে জেনেছি, হুমায়ূন আহমেদের টেলিভিশন-ধারাবাহিক *কোথাও কেউ নেই*-এ বাকের ভাইয়ের চরিত্রের জন্য প্রযোজকের প্রথম পছন্দ ছিলেন তারিক আনাম খান। কিন্তু নাট্যকার চাইলেন

AMARBOI.COM

তাঁর প্রিয় অভিনেতা আসাদুজ্জামান নূরকে। হলোও তা-ই। তারিক আনাম খান এরপর হুমায়ূন আহমেদের আর কোনো নাটকে অভিনয় করেননি। অবশেষে তাঁর শেষ ছবিতে তিনি জলসুখা গ্রামের জমিদারের চরিত্রে অভিনয় করলেন। চরিত্রটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আড্ডার একপর্যায়ে মাসুদ আখন্দ এবং অভিনেতা ও সংগীতশিল্পী আগুনের ওপর খেপে যান হুমায়ূন। আগুন আজ প্রথম এসেছেন শুটিংয়ে। তিনি তাঁর চিফ অ্যাসিস্ট্যান্টের কাছে একটা সিঙ্গেল রুমের জন্য হালকা আবদার জানিয়েছিলেন। খবরটা পেয়েছিলেন দিনের বেলা, রাগ ঝাড়লেন আড্ডার শেষ সময়। অল্প কিছুক্ষণ পর সবকিছু ঠান্ডা হয়ে গেল। সিলেট থেকে সস্ত্রীক আরজু ভাই এসেছেন গাড়িভর্তি খাবার নিয়ে।

রাতে ঘুমাতে গিয়ে পরিচয় হলো আরেক বিলেতফেরত অভিনেতার সঙ্গে। তাঁর নাম শহীদ রানা, ইউনিটের লোকজন ডাকে রানা ইউকে। ইউনিটে আরেকজন রানা আছেন, আবদুল্লাহ রানা, যিনি মাওলানার চরিত্রে অভিনয় করছেন। ইতিপূর্বে স্যারের লেখা একটা নাটকে শহীদ রানা পরিচালনা করেছেন। জানালেন, স্যারের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেলে একেবারেই বিলেত থেকে চলে আসবেন।

AMARBOI.COM

তিনি স্যারকে নিয়ে একটা ডকুমেন্টারি বানানোর কাজ শুরু করেছেন। অনেক পরিকল্পনা স্যারকে নিয়ে। আমার মনে পড়ে, এই রানার পরিচয় দিতে গিয়ে কমল আমাকে ফিসফিস করে বলেছিল, 'ও হচ্ছে স্বাধীন খসরু-৩'। এরপর আমার আর কিছু জানতে বাকি থাকে না।

পরদিন সকালবেলা আমি একেবারে বেরিয়ে যাই হোটেল থেকে। আমার গন্তব্য শুটিং স্পট। গিয়ে দেখি, একটা দৃশ্য শুট করার সব আয়োজন শেষ। একটা চেয়ারের ওপর বসে আছেন জমিদারবেশী তারিক আনাম খান। এই গরমের মধ্যেও তাঁর গায়ে শেরওয়ানির মতো একটা পোশাক। মাথার ওপর ছাতা। একজন বাতাস করছে।

পাশে দুটি চেয়ারে স্যার আর শাওন বসা। স্যারের সঙ্গে স্ক্রিপ্ট। কয়েকজন বেদেনি পাশে দাঁড়িয়ে আছে। এদের মধ্যে চারজন আসল বেদেনি। তাদের আনা হয়েছে পাশের থানা থেকে। একজন মাত্র আসল অভিনেত্রী, তার নাম জিনাত হোসেন যূথী। একসময় লাক্স সুন্দরী প্রতিযোগিতায় সে পঞ্চম হয়েছিল। হুমায়ূন আহমেদের অসংখ্য নাটকে অভিনয় করেছে। আমি তাকে আগে থেকেই চিনি। চ্যানেল ওয়ানে সকালবেলার কোনো একটা অনুষ্ঠানে আমাকে তার সঙ্গে আধা ঘণ্টা আড্ডা দেওয়ার জন্য ডাকা হয়েছিল। অনুষ্ঠানটি

উপস্থাপনা করত সে। একটা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ায় এখন। সে-ও বেদেনির পোশাকে চারজন বেদেনির সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে। অন্য মেয়েগুলো কিছুক্ষণ পর পর ফিকফিক করে হাসছে। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। তাদের নিয়ে মহা বিপদে আছেন ক্যামেরাম্যান মাহফুজুর রহমান। স্যার এলেন স্ক্রিপ্ট হাতে নিয়ে। ক্যামেরা রোল করার আগে রিহার্সেল করলেন অন্তত তিনবার।

বেদেদের শট নেওয়ার আগে খুব ছোট একটা দৃশ্য একবারেই ওকে হয়ে গেল।

তারিক আনাম একজনকে বলছেন, হাওরের পানি মনে হয় কমতে শুরু করেছে।

নায়েব গোছের একজনের জবাব, 'জে। বেজায় টান দিছে। এ বছর অল্প দিনেই পানি নাইমা যাবে।'

এ সময় বেদেবহরের দিকে চোখ পড়ল জমিদারের। তিনি বলছেন, 'বেদের নৌকা আসছে নাকি?'

নায়েব : 'জি।'

জমিদার : 'বেদেসর্দাররে ডাক দিয়া আনো।'

নায়েব চলে গেল। জমিদার ঘাটে বসে আছেন। একজন এসে তাঁকে হুঁকা দিল, একজন বড় একটা হাতপাখা দিয়ে বাতাস করতে শুরু করল। শুরু হলো সংলাপ।

জমিদার : 'মিঠা দক্ষিণা বাতাস ছাড়ছে, তুমি আবার পাংখা নাড়ানাড়ি করছ কেন? অকারণে বিরক্ত করবে না।'

এ সময় বেদেসর্দার এসে উপস্থিত হয়। তারা কীভাবে জমিদারের পা ধরে সালাম করবে, নিজে দেখিয়ে দেন হুমায়ূন আহমেদ।

এরপর আরও কিছু দৃশ্য ও সংলাপ।

আমি একটু দূরে একটা গাছের তলায় বসে থাকি। ওখানে মামুন আছে। মামুন এ ছবির নায়ক বা নায়িকা দুটিই। কাহিনিটা আমার জানা। এ রকম একটা কিশোর চরিত্রে অভিনয় করার জন্য ভদ্রঘরের ছেলে পাওয়া কঠিন। কে কার ছেলেকে দেবে ভাটি এলাকার এক জমিদারের যৌন পীড়নের শিকার হওয়া কিশোরের চরিত্রে অভিনয় করতে?

বাড়ির কোনায় শুটিং জোনের বাইরে একটা হাফপ্যান্ট পরে বসে আছে মামুন। তার কাছে গিয়ে কথা বলি। জানি যে, ঢোকাই থিয়েটারে সে নাটক করত। একটা সিনেমায় অভিনয় করবে, এ কথা শুনে তারা একই বয়সের চার বন্ধু একদিন হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে দেখা করে। হুমায়ূন আহমেদকে সে

AMARBOI.COM

চেনে না, নামও শোনেনি। ছবিতে অভিনয় করতে পারবে, এটা শুনেই সে খুশি। তারপর স্যারের সঙ্গে কথা হয় চারজনেরই এবং একসময় নির্বাচন করা হয় মামুনকে।

মামুনকে বলি, 'তোমার চরিত্রটা নিয়ে কি তুমি খুশি?'

মামুন জবাব দেয় না। নিচের দিকে তাকিয়ে থাকে। আরও কিছু কথা বলতে গিয়েছিলাম, সুযোগ হলো না। মামুন চলে গেল। বিকেলবেলা ইউনিট যখন হোটেলে ফিরবে, আমি ফেরত আসি ঢাকায়।

দু-তিন দিন পর সব কাজ শেষ করে ইউনিট ফিরে আসে। দিন পনেরো পর আবার এক বেলার কাজ করতে ছোট একটা ইউনিট আসবে। পানি যখন একেবারেই নেমে যাবে, তখন।

ইউনিট ঢাকা ফেরত আসে না, সরাসরি স্যার চলে যান নুহাশ পল্লীতে। সেখানে এই সিনেমার শুটিং করার জন্য এফডিসির স্টুডিওর মতো একটা বড় গুদামঘর বানানো হয়েছে। তার ভেতরে জলসুখা গ্রামের জমিদারবাড়ির অন্দরমহল এবং কয়েকটি ঘর। দুই দিন গিয়েছিলাম শুটিংয়ের সময়। লক্ষ করলাম, নাটকগুলো বানানোর সময় তিনি নিজে যেভাবে ফাঁকি দেন, তার সব আলসেমির খেসারত উশুল করে ছাড়েন এই ফিল্মের শুটিংয়ে। এখানে তাঁর অবর্তমানে একটি শটও নেওয়ার সুযোগ নেই।

ইউনিটের কেউ কেউ এমনও বলেছেন যে, *ঘেটুপুত্র কমলার* মতো এত সিনসিয়ার তিনি এর আগের সিনেমাগুলোতে ছিলেন না। যেহেতু এ ছবিটার কাহিনি দেড় শ বছরের পুরোনো জমিদারদের নিয়ে, সুতরাং প্রপস নির্বাচনে তিনি অনেক সময় নিয়েছেন। নিজেও যখন যেখানে যা কিছু পেয়েছেন, যা এ সিনেমার জন্য দরকারি হবে, তা সংগ্রহ করে রেখেছেন।

দখিন হাওয়ায় আড্ডায় ছবির প্রসেসিং, এডিটিং, ডাবিং, মিউজিক নিয়ে প্রায়ই কথা শুনি। ২০১১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চিকিৎসার জন্য তাঁকে যেতে হয় আমেরিকায়। তত দিনে ছবির মূল কাজ শেষ।

২০১২ সালের ১১ মে তিন সপ্তাহের চিকিৎসা-বিরতিতে হুমায়ূন আহমেদ দেশে আসেন। এ সময় তাঁর প্রযোজক, ইমপ্রেস টেলিফিল্ম থেকে জানানো হলো যে ছবিটি সম্পূর্ণভাবে প্রদর্শনের জন্য তৈরি। কিন্তু যেহেতু ছবিটি তারা এখনই মুক্তি দেবে না, তাই এ মুহূর্তে ছবিটির প্রিমিয়ার করতে চায় না। তবে হুমায়ূন আহমেদ, তাঁর ইউনিট সদস্য এবং একান্ত বন্ধুবান্ধব নিয়ে যাতে এ ছবিটা একসঙ্গে হলে বসে দেখতে পারেন, তার একটা আয়োজন হলো ২০১২ সালের ২৮ মে, হুমায়ূন আহমেদ আমেরিকা ফিরে যাওয়ার দুদিন আগে।

AMARBOI.COM

বসুন্ধরা সিটির সিনেপ্লেক্সের একটা হল ভাড়া করা হয়। প্রচারমাধ্যমকে জানানো না হলেও অনেক সংবাদকর্মীর ভিড় হয়। সিনেমার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের প্রায় সবাই এবং কয়েকজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে স্যার ছবিটা দেখেন।

এর আগে হুমায়ূন আহমেদ ঠিক এই হলেই বসে দেখেছিলেন গৌতম ঘোষের ছবি *মনের মানুষ*-এর প্রেস শো। ছবি ভালো লাগেনি কিংবা ধৈর্যচ্যুতি হয়েছে—এর যেকোনো একটি কারণে ইন্টারভ্যালের সময় তিনি শাওনকে নিয়ে চলে যান।

হুমায়ূন আহমেদ হলে গিয়ে ছবি দেখেন না, ঘরে বসে দেখেন। তিনি দেখেন বেশির ভাগই বিদেশি ছবি। আমাকে তাঁর প্রিয় বেশ কটি ছবির ডিভিডি দিয়েছেন দেখার জন্য। তাঁর দখিন হাওয়ার বাসায় একসঙ্গে দেখেছি তাঁর পছন্দের ছবি *দ্য জাপানিজ ওয়াইফ*। কখনো কখনো আমার প্রিয় কোনো ছবিও তাঁকে দেখতে দিয়েছি। একবার পোলিশ ট্রিলজি *থ্রি কালার্স*-এর *রেড*, *হোয়াইট* আর *ব্লু* তিনটা ছবিই দিলাম দেখার জন্য। একদিন বললেন, 'তোমার ছবিগুলো এত বোরিং যে দেখা গেল না।'

মনের মানুষ-এর পুরোটা দেখে আমরা যোগ দিই দখিন হাওয়ার আড্ডায়। এমনিতে হুমায়ূন আহমেদ বাংলাদেশের সমসাময়িক কোনো চলচ্চিত্রের প্রশংসা করেন না। তাঁর নিজের ছবি সম্পর্কে কেউ খারাপ কিছু বললে সেটাও খুব সহজে নেন না। মুখ কালো করে থাকেন। তবে *মনের মানুষ*-এর ফটোগ্রাফির খুব প্রশংসা করেন তিনি। *মনের মানুষ* প্রসঙ্গে বলেন, 'আমাদের দেশের হাওরের পানি দেখলাম কী স্বচ্ছ, কী নীল! আমাদের ক্যামেরাম্যানরা এই হাওরের ছবি তুললে এ রং আনতে পারে না কেন?'

সিনেপ্লেক্সের এই হলে, অপারেশনের জন্য আমেরিকায় যাওয়ার দুদিন আগে শরীরে কঠিন অসুখ নিয়ে, ডাক্তারের বারণ অনেকটা অমান্য করে দু-তিন শ লোকের সামনে তিনি হাজির হয়েছিলেন। এটাই যে এত দর্শকের সামনে তাঁর শেষ আসা, তা কি জানতেন?

তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় এ ছবির মালিক ইমপ্রেস টেলিফিল্মের কাছে তিনি অনুরোধও করেন, ছবিটি যাতে টেলিভিশনে দেখানো না হয়; বড়রা কেউ যাতে শিশুদের নিয়ে ছবি দেখতে না আসেন। কারণ, জমিদারের ঘর থেকে কিশোরের (কমলা) চিৎকার শোনার পর শিশুরা যদি বাবা-মাকে প্রশ্ন করে বসে, বাবা ছেলেটা চিৎকার করল কেন? বাবা এর কী জবাব দেবেন?

ছবি দেখা শেষে দখিন হাওয়ার বাড়িতে খুব ফুরফুরে মেজাজের আড্ডা হচ্ছে আমাদের। সে আড্ডার অনেকটা জুড়ে ছিল *ঘেটুপুত্র কমলা*র প্রশংসা।

AMARBOI.COM

স্যারের বন্ধুবান্ধব-স্বজনেরা প্রশংসায় ভাসিয়ে দিচ্ছিলেন তাঁকে। আমি চুপ। আমার কাছে এসে তিনি আস্তে করে বলেন, 'ছবিটা কেমন লাগল?'

আমি বললাম, 'স্যার, আমার বিবেচনায় এটা আপনার বানানো সবচেয়ে ভালো ছবি। তবে আমার আশঙ্কা হচ্ছে, ছবিটা দেশে খুব বেশি বদনাম কুড়াবে, তবে আন্তর্জাতিক বাজারে একটা বড় স্বীকৃতি পাবে। ওয়েস্টার্ন দর্শকেরা এসব সাবজেক্ট খায় ভালো।' শেষের অংশ শুনে স্বভাবসুলভ উল্লাসের ভঙ্গিতে বললেন, 'চিয়ার্স।'

কথাটি বলে ফেলার পর আমার অনুশোচনা হয়। মনে মনে বলি, আমার মন্তব্যের প্রথম অংশটি যেন মিথ্যা প্রমাণিত হয়।



আড্ডাবাজ হুমায়ূন

AMARBOI.COM

হুমায়ূন আহমেদ মূলত অফিস করার মতো প্রায় সারা দিনই লেখেন বা পড়েন। সন্ধ্যাবেলা বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেন। এটা তাঁর অনেক পুরোনো অভ্যাস। দখিন হাওয়ায় আড্ডার নির্দিষ্ট কোনো চরিত্র থাকে না।

খোঁজ নিয়ে জেনেছি, আমেরিকা থেকে পিএইচডি নিয়ে ১৯৮২ সালে যখন দেশে ফিরে এলেন, খুব বেশি মানুষের সঙ্গে তাঁর জানাশোনা ছিল না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার্স ক্লাবে বসে চা খাওয়া বা দাবা খেলার মধ্যেই তাঁর আড্ডা সীমাবদ্ধ ছিল। একই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বা ড. হুমায়ুন আজাদের সঙ্গে তাঁর আড্ডা হতো। লেখকের সঙ্গে লেখকের আড্ডা। ড. হুমায়ূন আহমেদ বিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষক, কিন্তু বিজ্ঞানীদের সঙ্গে তাঁর খুব মিল ছিল না। তিনি খুঁজতেন সাহিত্যের লোক।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের বাইরে তাঁর প্রথম আড্ডা ছিল মতিঝিলের দৈনিক বাংলা ভবনে *বিচিত্রার* অফিসে। *দৈনিক বাংলার* সহকারী সম্পাদক ছিলেন সালেহ চৌধুরী। তাঁর বাড়ি সিলেটে। বয়সে হুমায়ূন আহমেদের ১০ বছরের বড়। হুমায়ূন আহমেদের বাবা যখন সিলেটে ছিলেন, তখন হুমায়ূনের বাবার সঙ্গেও তাঁর জানাশোনা ছিল। ১৯৭০ সালে সালেহ চৌধুরী আর হুমায়ূন আহমেদ

ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা শুরু করেন। হুমায়ূন আহমেদ তাঁকে ডাকতেন 'নানাজি' বলে। কারণ, একদিন এক মুক্তিযোদ্ধা বন্ধুকে সঙ্গে করে দৈনিক বাংলার অফিসে হুমায়ূন আহমেদ গিয়েছিলেন সালেহ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে। যে ভদ্রলোক তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি সম্পর্কে সালেহ চৌধুরীর নাতি। বন্ধু তখন নানাজি বলে ডাকতেন সালেহ চৌধুরীকে, হুমায়ূনও তাঁকে একই সংবোধনে ডাকা শুরু করেন। সেই সূত্রে আমরাও সালেহ চৌধুরীকে নানাজি বলেই ডাকি। নানাজিই মূলত *দৈনিক বাংলা* অফিসে সংযোগ ঘটিয়ে দেন সম্পাদক আহমেদ হুমায়ূন এবং দেশের সেরা কবি শামসুর রাহমানের সঙ্গে। একই ভবনে *বিচিত্রার* অফিস। *বিচিত্রা* সম্পাদক শাহাদাৎ চৌধুরীর সঙ্গে সম্পর্কের সূচনা একই সূত্রে। ১৯৭৪ সালে সাপ্তাহিক *বিচিত্রা* যখন বাংলাদেশে প্রথম ঈদসংখ্যা বের করে, সেখানে হুমায়ূন আহমেদের একটি উপন্যাস *অচিনপুর* ছাপা হয়। শাহাদাৎ চৌধুরীর সঙ্গে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা সেখান থেকেই।

হুমায়ূন আহমেদ একসময় আমেরিকা চলে যান। ১৯৮২ সালে দেশে ফিরে এলে আবার এই *বিচিত্রাকে* কেন্দ্র করে তাঁর আড্ডা শুরু হয়। দিনের বেলা পত্রিকা অফিসের আড্ডা শেষ হলে সন্ধ্যাকালীন আসর বসত কখনো ড. হুমায়ুন আজাদ কখনো বা কবি শামসুর রাহমানের বাসায়। নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত এভাবে বিক্ষিপ্তভাবে তাঁদের আড্ডা চলত। সালেহ চৌধুরী, শামসুর রাহমান, ড. হুমায়ুন আজাদ, ইমদাদুল হক মিলন, কখনো বা ড. মুনতাসীর মামুন—এঁরাই ছিলেন তাঁর আড্ডার সঙ্গী।

AMARBOI.COM

বাংলাদেশ টেলিভিশনের জন্য *অয়োময়* নাটক নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আড্ডার চেহারায় পরিবর্তন আসে। এ নাটকের সূত্রে তাঁর বেশ কিছু নতুন বন্ধুবান্ধব জোটে। এঁরা কেউ তাঁর নাটকের শৌখিন শিল্পী, কেউ সমঝদার। বাংলা একাডেমীর পরিচালক ওবায়দুল ইসলাম এবং অভিনেতা মোজাম্মেল হোসেন, আসাদুজ্জামান নূর, আলী যাকের, আবুল হায়াত, আবুল কাশেম, এনামুল হক—এঁদের নিয়ে নাটকের আলোচনা, নাটক পাঠ ও আড্ডা।

হুমায়ূন আহমেদ নানা প্রসঙ্গে লিখেছেন যে তাঁর বন্ধুভাগ্য খুব ভালো না। একনাগাড়ে বেশি দিন কাউকেই তাঁর সহ্য হয় না; এক বছরের বেশি ঘনিষ্ঠতা থাকে না কারও সঙ্গেই। ২০০০ সাল থেকে, মূলত শাওনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার পরপরই তাঁর আড্ডার এই চরিত্রে বদল ঘটে। তিনি নিজেকে গুটিয়ে ফেলেন, প্রায় বন্ধ করে দেন বাইরে যাওয়া।

২০০৮ সালের এপ্রিল মাস থেকে তাঁর এই শেষ পর্যায়ের সান্ধ্য আড্ডাগুলোতে আমি প্রায় অনিবার্য এক সদস্যে পরিণত হই। আমারও সান্ধ্য

রুটিনে পরিবর্তন আসে। আগে আমি অফিস থেকে সন্ধ্যায় চলে যেতাম আমার ক্যাডেট কলেজ ক্লাবে। দেড়-দুই ঘণ্টা লন টেনিস খেলতাম প্রতি সন্ধ্যায়। তারপর বাসায় ফিরে যেতাম। সে রুটিনের পরিবর্তন এল।

কখনো কখনো সপ্তাহে সাত দিনই চলত আড্ডা। মাঝে মাঝে লেখালেখির চাপ বেড়ে গেলে আড্ডার দিন কমে আসত। সপ্তাহে দুই বা তিন দিন। একসময় এমনও হলো যে শুধু বৃহস্পতিবার হবে আড্ডা। এ রকম এক-দুই সপ্তাহ আড্ডাটি সপ্তাহান্তে চলে যাওয়ার পর হঠাৎ হয়তো কোনো এক মঙ্গলবারেই ফোন আসত মাজহারের কাছ থেকে, 'স্যার বলছেন আজ বৃহস্পতিবার, সুতরাং চলে আসো।'

এই আড্ডা ছিল দুই ধরনের। একটি প্রাত্যহিক। এখানে সদস্যসংখ্যা সীমিত। অন্যপ্রকাশ আর দখিন হাওয়ার লোকজন, যেমন—আলমগীর ভাই, মাজহার, কমল আর আমি। সঙ্গে স্যার আর শাওন। এই দলে আকস্মাৎ এসে হাজির হতেন তাঁর বন্ধু লাল দাড়ি পাকানো সেহেরী ভাই (প্রকৌশলী আমিনুল ইসলাম)। বগুড়া জিলা স্কুলে ক্লাস এইট থেকে দুজনে একসঙ্গে পড়াশোনা করেছেন। সিটি করপোরেশনের প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে অবসর নেওয়ার পর তাঁর যে বেশভুষা, তাকে প্রায় হাজির মতো দেখায়। সাংঘাতিক ফুর্তিবাজ ছিলেন এই মানুষটি। স্যারের আরেক বন্ধু স্থপতি আবু করিম। তিনিও ধানমন্ডিতে থাকেন। একসময় দখিন হাওয়াতেই তাঁর ফ্ল্যাট ছিল। দখিন হাওয়া ভবনের স্থপতিও তিনি। তাঁরও আগমন ছিল প্রায় নৈমিত্তিক। অনিয়মিত আড্ডায় বসেছি তাঁর পুরোনো বন্ধু সালেহ চৌধুরী (নানাজি), মনির আহমেদ, এস এম মনিরুজ্জামান—এঁদের সঙ্গেও। স্যারের আরও কিছু প্রিয়জনকে ডেকে আনা হতো। তাঁদের মধ্যে আছেন ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, জাদুকর জুয়েল আইচ, ইমদাদুল হক মিলন—এঁরা। এ তিনজনের মধ্যে স্যারের সবচেয়ে পুরোনো বন্ধু জুয়েল আইচ।

AMARBOI.COM

জাদুবিদ্যার প্রতি হুমায়ূন আহমেদের অনুরাগ ছোটবেলা থেকেই। তাঁর এক লেখায় পড়েছি, ১৯৬৫ সালে ঢাকা কলেজে ভর্তি হওয়ার সুবাদে তাঁর প্রথম ঢাকা আসা। ঢাকা এসেই তিনি জাদুর কৌশল শেখার জন্য এক জাদুকরকে ৩০০ টাকা দিয়ে সর্বস্বান্ত হন। এই প্রতারক জাদুকরের স্মৃতি তিনি ভুলতে পারেন না। এরপর জাদুবিদ্যার ওপর বইপত্র পড়া শুরু করেন। ১৯৮৪-৮৫ সালের দিকে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় জুয়েল আইচের। তাঁর *এইসব দিনরাত্রি* নাটকে একটি বিশেষ অংশে জাদুকর জুয়েল আইচের চরিত্রে তিনি নিজেই অভিনয় করেন। সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা সেখান থেকেই। জুয়েল আইচের সহযোগিতায় হুমায়ূন

আহমেদ বিশ্ব জাদুকর সংঘের সদস্যও হয়ে যান। তিনি বেশ কটি জাদু দেখাতে পারেন। আড্ডায় তাঁর বেশ কিছু জাদু দেখে আমরা মুগ্ধ হয়েছি। হুমায়ূন আহমেদ হাতের তালুর ভাঁজে মুদ্রা লুকানোর এক জটিল কৌশল আয়ত্ত করেন। বারবার দেখার পরও তাঁর কৌশল ধরে ফেলা যায় না। জুয়েল আইচের সামনেও তিনি জাদু দেখাতেন। জুয়েল আইচ মুচকি হাসতেন শুধু।

জুয়েল আইচকে সাড়ে চার বছরে বহুবার দখিন হাওয়ার আড্ডায় দেখেছি। আসরে তাঁকে কেউ জাদু দেখানোর জন্য অনুরোধ করে না, এমনকি হুমায়ূন আহমেদ নিজেও না। আসরে জুয়েলদা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মুগ্ধ শ্রোতা। যখন কথা বলেন, তখন অত্যন্ত মাপা, পরিমিত এবং খুব গোছানো থাকে তাঁর শব্দমালা।

হুমায়ূন আহমেদ জাদুবিষয়ক একটা উপন্যাস লিখেছিলেন, *ম্যাজিক মুনসি*। বইটি উৎসর্গ করেন জুয়েল আইচকে। উৎসর্গপত্রে লিখেছিলেন :

> জুয়েল আইচ। যাদুবিদ্যার এভারেস্টের চূড়ায় যিনি উঠেছেন। এভারেস্ট বিজয়ীরা শৃঙ্গ বিজয়ের পর নেমে আসেন। তিনি নামতে ভুলে গেছেন।

আমাদের আড্ডা সবচেয়ে জমজমাট হতো যেদিন এস আই টুটুল এসে হাজির হতো। টুটুল কখনো একা আসে না, সঙ্গে তানিয়া এবং তাদের দুই ছেলে। তানিয়াও ভালো আড্ডাবাজ। টুটুল হয়তো জানত যে এখানে এলে তাকে গান গাইতে হবে। সে ঘরে ঢুকেই দরজার কোনায় গিটারটা রেখে দিত। স্যার একটু পর হয়তো বলতেন, 'টুটুল, ওই গানটা ধরো তো।' টুটুল বলত, 'স্যার, আমি একটু গিটারটা নিয়ে আসি।'

—'গিটার এখন পাবা কোথায়? খালি গলায় গাও।'

—'পাব, আছে।'

টুটুল গিটারযোগে গান ধরে। কখনো একা, কখনো দ্বৈত। হুমায়ূন আহমেদের লেখা, টুটুলের সুর দেওয়া অনেক গান আছে হুমায়ূন আহমেদের বেশ কটি সিনেমায়। সেগুলো গেয়েছেও টুটুল ও শাওন। সেইসব গানই আমাদের শোনা হতো বেশি।

হুমায়ূন আহমেদ আড্ডাপ্রিয় মানুষ। তিনি আড্ডায় বসবেন আর আড্ডা জমবে না, এটা হতেই পারে না। আসরে তিনি নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলতেন, কিছু বানানো কাহিনি আর কিছু কৌতুকও ছিল তাঁর প্রিয় বিষয়। তাঁর সমস্ত কৌতুক, অভিনয় এবং সত্য-মিথ্যায় মাখানো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার গল্প আমরা বহুবার শুনেছি। বলার ভঙ্গিটা এত চমৎকার যে, এসব কৌতুককে প্রতিবারই মনে হতো নতুন।

AMARBOI.COM

কেবল একটি বিশেষ চরিত্রে তিনি অভিনয় করে দেখাতেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের সামনে দিয়ে এক দিগম্বর পাগল যাচ্ছে। হঠাৎ তার সামনে পড়ল বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্রী। তাদের কাছ থেকে নিজের শরীরের বিশেষ অংশ কেমন করে আড়াল করল লোকটা, তা অভিনয় নিজে করে দেখিয়েছেন বহুবার।

তাঁর কৌতুক আর মুগ্ধ-করা সত্য-মিথ্যা গল্প, সবই বলতেন তাঁর চেনাজানা মানুষদের নিয়ে। এ ক্ষেত্রে প্রায় সব আড্ডায় তাঁর 'বডিগার্ড' বলে খ্যাত অন্যপ্রকাশের অন্যতম অংশীদার ও অভিনেতা কমল ছিল সবচেয়ে সহজ টার্গেট। কমলের বাড়ি নোয়াখালী। সব মিলিয়ে নোয়াখালীর কোনো প্রসঙ্গ এলে গল্পটি পড়ে যেত কমলের ওপর।

কমলকে সঙ্গে নিয়ে একবার তিনি আমেরিকা গিয়েছিলেন। পথে দুবাই বিমানবন্দরের ট্রানজিট লাউঞ্জে চেক ইন করার সময় কমলকে নিয়ে তৈরি হলো কাহিনি। তিনি বলছেন,

> দুবাই এয়ারপোর্টে চেক ইন হচ্ছে, সিকিউরিটির ভেতর কমল যতবার পার হচ্ছে, ততবারই চিং চিং আওয়াজ। সিকিউরিটিতে আছে এক ইন্ডিয়ান, সে আমাদের চেহারার যে-কাউকে দেখলেই হিন্দিতে কথা বলে। কমলকে প্রথমবার বলে, জ্যাকেট নিকালো।
>
> কমল জ্যাকেট খোলে।
>
> আবার চিং চিং।
>
> বেল্ট নিকালো।
>
> বেল্ট খুলে কমল সিকিউরিটি পার হতে গেল।
>
> আবার চিং চিং।
>
> প্যান্ট নিকালো
>
> কমল এদিক-ওদিক তাকায়। আমরা ছাড়া আর কোনো পরিচিত লোক নেই। এদিকে ফ্লাইটের সময় হয়ে গেছে। সে টান মেরে তার প্যান্ট খুলে নামাল অর্ধেক। গোলাপ ফুলের নকশা করা আন্ডি পরে কমল দাঁড়িয়ে।
>
> সিকিউরিটি অফিসার ধমক দেন। 'প্যান্ট নেহি, পেন নিকালো।' কমল প্যান্টের পকেটে রাখা কলমটি বের করল।

এ গল্প বলার সময় কমলও আছে। সে মেঝের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। একবার আমাকে কানে কানে বলল, ঘটনা প্রায় পুরো ঠিক, শুধু প্যান্ট খোলার বিষয়টা স্যারের বানানো। কমলের কথা, 'স্যার যখন এসব গল্প বলেন, সবার মুখের দিকে তাকান, সবাই আনন্দ পায়। সবার আনন্দ দেখার জন্য তিনি এসব বানান, এ জন্য আমিও চেপে যাই। বলুক না!'

AMARBOI.COM

আমাকে দেখে মাঝে মাঝে তার সিলেটি জোকস মনে পড়ত। একবার শোনান ষাটের দশকের এক গল্প :

> এক লোক লন্ডন যাবে। জীবনে প্রথমবারের মতো সে প্যান্ট পরেছে এবং এই প্যান্ট পরেই বিমানে উঠেছে। বিমানে উঠে তার পেশাব করার প্রয়োজন হলো। টয়লেটে গিয়ে বহু চেষ্টা করে প্যান্ট খুলতে পারে না। হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে আসে। এয়ার হোস্টেসকে বলে তার সমস্যার কথা। এয়ার হোস্টেস অত্যন্ত তমিজের সাথে চেইনটি নামানোর বিষয়টি তাকে শিখিয়ে দেয়। ভদ্রলোক খুবই খুশি। তিনি হোস্টেসকে বলেন, 'নাতিন গো, খলিফা বেটায় আমার ফেন্টোর তালা মারি তুমার বেছে ছাবি ফাটাই দিছে, নায় নি?'

হুমায়ূন আহমেদের শৈশব কেটেছে সিলেটে। সিলেটি ভাষা এখনো সামান্য বলতে পারেন। বোঝেন এক শ ভাগ। ছোটবেলার তাঁর স্কুলের বন্ধুরা যে আবেগ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করত, তিনি তা অভিনয়-আবৃত্তি করে দেখাতেন :

> এ খতা জানিতে তুমি জগত ইশ্বর শাজাহান
> খালো শ্রোতে বেসে গেছে জীবন যৌবন দনমান
> যায় যাক শুদু তাক এ্যাক বিন্দু নয়নের জল
> খালের খপোল তলে শুবরো সমুজ্জল

আবৃত্তির সময় তাঁর হাত ওপরে উঠছে, আঙুল নড়ছে, চোখ কুঁচকে যাচ্ছে, মুখের অবয়ব বদলাচ্ছে—আবেগের শেষ নেই।

নিজের গল্প অন্যের ওপর বা অন্যেরটা নিজের ওপর, এমন বহু করেছেন তিনি। আমাদের আড্ডায় একবার তাঁর ছোট ভাই আহসান হাবীবের (শাহীন) রসবোধের প্রশংসা করে বলেছেন :

> একবার আমাদের পারিবারিক বৈঠকে বাবার কবর ঢাকায় এনে নুহাশ পল্লীতে দেবার প্রস্তাব দিলাম। সবাই রাজি। আমি বললাম, বাবার কবর তো পিরোজপুরেও থাকবে, ঢাকায়ও হবে, বিষয়টা কেমন? শহীন বলল, পিরোজপুরে বাবার কবরের ওপর সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দেব 'টু-লেট'।

পরে একবার শাহীন ভাই বলেছেন, 'ঘটনা পুরাই সত্য। টু-লেট লাগানোর কথা আসলে আমি বলি নাই, ওটা দাদাভাই-ই (হুমায়ূন আহমেদ) বলেছেন। আমার ওপর দিয়ে চালিয়ে দিয়েছেন আর কি।'

হুমায়ূন আহমেদ অনেক প্রচলিত গল্পকেও বদলাতেন। ইশপের একটা গল্প সবাই জানেন। নদীর পাড়ে কাঠ কাটতে গিয়ে কাঠুরের লোহার কুড়ালটি নদীতে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে এক মৎস্যকন্যা ভেসে উঠল পানি থেকে। তাকে একটা সোনার কুড়াল দেখাল, কাঠুরে বলল, 'না।' আবার ডুব দিয়ে

AMARBOI.COM

উঠে রুপার কুড়াল দিল, কাঠুরে এবারও বলল, 'না।' এরপর ডুব দিয়ে উঠে লোহার কুড়ালটি দেখাল, কাঠুরে বলল, 'হ্যাঁ, এটাই আমার কুড়াল।' তার সততায় মুগ্ধ হয়ে তাকে মৎস্যকন্যা তিনটি কুড়ালই দিয়ে দিল।

গল্পের এ অংশটি সবার জানা। হুমায়ূন আহমেদ সংযুক্ত করলেন পরের অংশ :

> অনেক দিন পর সেই কাঠুরে তার বউকে নিয়ে সেই নদীর পাড় দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। হঠাৎ পাড় ভেঙে তার স্ত্রী পানিতে পড়ে ডুবে গেল। আবার ভেসে ওঠে সেই মৎস্যকন্যা, তার হাতে মেরিলিন মনরো। তাকে দেখিয়ে কাঠুরেকে বলল, 'এটা কি তোমার বৌ?' কাঠুরে, 'জি ম্যাম, এইটাই আমার বউ। আমি তো চিনি।'
>
> মৎস্যকন্যা এবার বিভ্রান্ত। বলল, 'কিছুদিন আগে তোমার সততা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম, আজ আমি বড় কষ্ট পেলাম।'
>
> কাঠুরে বলল, 'ম্যাডাম, আপনাকে আমি চিনি। আমি যদি বলি এই মেরিলিন মনরো আমার বউ না, আপনি দেখাবেন শ্রীদেবীকে। আমি যখন বলব, না, ওই বেটিও আমার বউ না, তখন আমাকে আমার পুরোনো বউসহ এই দুইটারে আমারে দিয়ে দেবেন। জগতে একজন মাত্র মেয়েকে নিয়ে আমার জীবন অতিষ্ঠ। আমার পক্ষে তিনজনকে সামলানো সম্ভব নয় ম্যাডাম। বাকি দুই নারীর হাত থেকে বাঁচার জন্য আমি আসলে মিথ্যা বলেছি, প্রথমে যারে দেখাইছেন তারে নিয়াই আমি বাড়ি যেতে চাই, আমি আর চাই না।

ভোজনরসিক হুমায়ূন আহমেদ খাওয়াদাওয়া নিয়েও যথেষ্ট রসিকতা করতেন।

চিংড়ি আর ইলিশ মাছ তাঁর খুব প্রিয়। বলতেন, 'চিংড়ি এমন একটা মাছ, যা রান্না করতে কোনো প্রতিভা লাগে না।' এমন কথা বলতেন ইলিশ নিয়েও। বলেন, 'যারা নতুন ইলিশ রেসিপি শিখতে চাও আমার কাছে আসতে পারো। আমি একটা রেসিপি জানি, এর নাম "বগল ইলিশ"। মাছটাকে কেটেকুটে, লবণ-মসলা মাখিয়ে বগলের মধ্যে রেখে দিতে হবে। বগলের তাপে ইলিশ রান্না হয়ে যাবে। এর নাম বগল ইলিশ।'

সুন্দরবন ট্যুরে তাঁর স্কুলজীবনের বন্ধু সেহেরী ভাইও ছিলেন। সেহেরী ভাইয়ের বউ খুব সহজ-সরল মহিলা। জাহাজের ছাদে বসে আছি। তাঁর কাছে গিয়ে স্যার বলেন, 'ভাবি, কেকা ফেরদৌসীকে আমি উত্তম ভাত রান্নার একটা কৌশল শিখিয়েছি।'

সেহেরী ভাবি খুবই কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। ভাত রান্নার আবার কৌশল আছে নাকি?

হুমায়ূন আহমেদ বলেন, 'এমন পদ্ধতিতে ভাত রাঁধতে হবে, যাতে প্রতিটা ভাত আলাদা আলাদা থাকে। এর নাম "ভাত ঝরঝরি"।'

AMARBOI.COM

'কী সেটা?' সেহেরী ভাবির কৌতূহল।

'ট্রিকসটা হচ্ছে, প্রত্যেকটা চাউল আলাদা আলাদভাবে সেদ্ধ করতে হবে।'

নতুন কৌশলটি খুব পছন্দ হলো সেহেরী ভাবির। বেশ কিছুক্ষণ তিনি এ নিয়ে চিন্তা করলেন এবং একসময় বললেন, 'কিন্তু তাতে তো অনেক সময় লাগবে!'

সেহেরী ভাবি তাঁকে যে এ কথা বলেছেন, সেটা আরও রাঙিয়ে সবার কাছে হুমায়ূন আহমেদ যখন ঘটনাটি বলেন, তখন সেহেরী ভাবি অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেলেন। ট্রিপের বাদবাকি তিন দিন তাঁকে কেউ আর হাসতে দেখল না।

হুমায়ূন আহমেদের নিচতলার ফ্ল্যাটের বাসিন্দা এবং প্রকাশক আলমগীর রহমানের স্ত্রী, ঝর্ণা ভাবিকেও ঠাট্টা করতে ছাড়তেন না তিনি।

হুমায়ূন আহমেদ বলেন, 'একবার হলো কি, আমাদের ঝর্ণা ভাবি সিনেপ্লেক্সে গেছেন আমার ছবি দেখতে। ভুল করে ঢুকে গেছেন আরেক হলে। অন্য সিনেমা দেখে এসে আমাকে বলেন, হুমায়ূন ভাই, খুব সুন্দর বানাইছেন ছবিটা, অসাধারণ। কিন্তু শাওন এই ছবিতে আছে? তাকে তো দেখলাম না।'

প্রকৃত ঘটনা ছিল এরকম : *আমার আছে জলছবির* প্রিমিয়ার শোর একটা তারিখ ঠিক হয়েছিল। সেটা ঝর্ণা ভাবিকে জানানো হয়। দুদিন আগে তারিখ বদলে যায়, সেটা তাঁকে জানানো হয়নি। ঝর্ণা ভাবি অফিস থেকে ফেরার পথে তাঁর এক আত্মীয়কে নিয়ে সিনেপ্লেক্সে গিয়ে দেখেন, এ ছবির কেউ ওখানে নেই, ছবির প্রদর্শনীও হচ্ছে না। এসেই যখন গেছেন, অনেক দিন বাংলা সিনেমা দেখা হয় না, তাঁরা টিকিট কেটে অন্য একটি ছবি দেখে বাসায় ফিরে পুরো ঘটনাটি হুমায়ূন আহমেদকে জানান। কোথায় নিজে অনুতপ্ত হবেন, সেটা না করে তিনি উল্টো গল্প বানিয়ে ঝর্ণা ভাবিকে বোকা বানানোর চেষ্টা করেন। আমরাও মজা পাই।

AMARBOI.COM

লেখক-সাহিত্যিকদের নিয়ে নানা রকম কৌতুক করতেন। বিশেষ করে, যেসব লেখক তাঁকে তুলাধোনা করতেন, তাঁদের গল্প বলতেন বেশি।

হুমায়ুন আজাদকে নিয়ে একটা গল্প আছে। বহুবার বলেছেন। হুমায়ুন আজাদ প্রায়ই হুমায়ূন আহমেদকে বলতেন, 'তোমার লেখা ভালো, কিন্তু গভীরতা নাই।'

একবার গভীরতা আনার জন্য তিনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা গল্প নিজ হাতে কপি করে নিয়ে গেলেন। শুধু চরিত্রের নামগুলোকে মুসলমান করা হলো, পরিবর্তন এটুকুই। হুমায়ুন আজাদ নাকি এই গল্প পড়ে বললেন, 'হুম, সবই ঠিক আছে, গভীরতা একটু কম।'

একসময় হুমায়ুন আজাদ ও হুমায়ূন আহমদের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ছিল। পরে হুমায়ুন আজাদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের ইতি ঘটে। তাঁর এক লেখায়

হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাসকে 'অপন্যাস' এবং তার বেশি বেশি লেখার পরিপ্রেক্ষিতে 'ইতর প্রাণী প্রসব করে বেশি' ধরনের কথাবার্তা প্রকাশ হওয়ার পর তাঁদের মধ্যে আর কোনো যোগাযোগ থাকে না।

সৈয়দ শামসুল হককে নিয়েও রসিকতা করেছেন তিনি। বলেছেন, 'একবার *বিচিত্রা* অফিসে হক ভাইয়ের সঙ্গে আমাকে আড্ডায় বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। হক ভাইয়ের সে কী কঠিন কঠিন প্রশ্ন! প্রশ্নের একটি হচ্ছে, "তুমি কী করে বুঝতে পারো যে তোমার লেখা এই ৬ ফর্মা বা ৭ ফর্মায় শেষ হবে?" জবাবে আমি বলেছি, হক ভাই, আপনি যখন সনেট লিখেন, তখন কেমনে ঠিক করেন যে, ১৪ লাইনেই এটা শেষ হবে?'

হুমায়ূন আহমেদ এক-একটা প্রসঙ্গের কথা শেষ করেন, ঘুরে ঘুরে সবার মুখের দিকে তাকান। কে কেমন করছে দেখেন। সবাই তাঁর কথায় আনন্দ পায়, তোষামোদি করে, তিনি খুবই আপ্লুত হন।

হুমায়ূন আহমেদ বলেন, 'হক ভাই আমাকে কঠিন প্রশ্ন করেন, "হুমায়ূন, তোমার লেখায় কোনো নিরীক্ষা নাই কেন? আমি তো এক্সপেরিমেন্ট করি।" আমি বললাম, হক ভাই, এক্সপেরিমেন্ট লিটল ম্যাগাজিনের লেখকরা করবেন। নতুন লেখকরা করবে। আপনি করবেন কেন? আমি করব কেন?'

এসব কথা বলেই প্রথমে তাঁর স্বভাবসুলভ একটা মুচকি হাসি নিজে হাসবেন। তাঁর এই হাসি সংক্রামিত হবে আড্ডার অন্যদের মধ্যে।

বাঙালি কী পরিমাণ আবেগপ্রবণ জাতি, এর উদাহরণ দেওয়ার জন্য একটা গল্প বলতেন। গল্পটা মধ্যপ্রাচ্যের কোনো শহরের এক বাঙালি শ্রমিককে নিয়ে।

> এক বাঙালি শ্রমিক দুবাইতে ২৮ তলা ভবনের সবচেয়ে উঁচুতলার দেয়ালে রঙের কাজ করছিল। নিচে থেকে একজন চিৎকার করে বলল, 'ওই বশির, কাল তোর মাইয়া ফাতিমা মারা গেছে।' এ কথা শুনে লোকটি ভাবল, এ জীবন রেখে কোনো লাভ নাই। সে নিজেও আত্মাহুতি দেবে। ২৮ তলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়া শুরু করল। ৭ তলা পড়ার পর ২১ তলার কাছে এসে তার মনে হলো—আরে, ফাতিমা নামে তো আমার কোনো মেয়ে নাই! সে নামছে। ১৪ তলা পর্যন্ত নামার পর মনে হলো—আরে, আমার মেয়ে আসবে কোত্থেকে, আমি তো বিয়েই করিনি! কিন্তু লাভ নাই, সে তো পড়ছেই। পড়তে পড়তে আরও ৭ তলার ওপর এসে তার মনে হলো—আরে, বশির কেডা? আমার নাম তো বশির না!'

তাঁর কথা বলার ধরন তাঁর লেখার মতোই, প্রায় হুবহু। তিনি যেভাবে কথা বলেন, গল্প করেন, ঘটনার বর্ণনা দেন, ঠিক সেভাবেই লেখেন।

AMARBOI.COM

তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ১৯৮৬ সালে। কিন্তু ২০০৮ সালের পর খুব সামান্য সময় পেয়েছি তাঁকে। যেটুকু সময় পেয়েছি, তাঁকে লেখক-নাট্যকার হিসেবে নয়, তিনি ছিলেন খুব কাছের বন্ধুর মতো একান্ত আপন, এক অতি সাধারণ আড্ডাবাজ, একজন ভালো মানুষ।



যে আড্ডায় তিনি ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন

আমার ক্ষেত্রে এমন কোনো ঘটনা না ঘটলেও আমি এমন অনেক শুনেছি যে এই দখিন হাওয়ার আড্ডায় তিনি বহুবার বহু লোকের ওপর মারাত্মকভাবে ক্ষিপ্ত হয়েছেন। এসবের ফল হতো দুই রকমের।

এক. যাঁর ওপর ক্ষিপ্ত হতেন তিনি অপমানিত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে চলে যেতেন, আর কখনো আসতেন না। নিয়মিত আড্ডা থেকে তাঁর চিরবিদায় হতো। এ হলো এক রকম। আরেক রকম হলো, পরদিন সকালবেলা ফোন করে একান্তে তাঁর কাছে দুঃখ প্রকাশ করা হতো। তিনি অপমানের যন্ত্রণা ভুলে যাওয়ার সময় পর্যন্ত দখিন হাওয়ায় উপস্থিত থাকা থেকে বিরত থাকতেন। এভারেস্টের বরফ গলে গলে একসময় তারও উচ্চতা কমে। মানুষের দুঃখ-কষ্ট-অপমানবোধও কমতে থাকে। এক-দুই সপ্তাহ বা মাস দু-তিন পর তিনি আবার এসে হাজির হতেন।

দখিন হাওয়ার আড্ডায় নয়, নাটকের সেটে আমি দুজনকে চরম অপমানিত হতে দেখেছি। সামান্য কারণে ক্ষিপ্ত হয়ে ছোট-বড় সবার সামনে দুজন জ্যেষ্ঠ শিল্পীকে তিনি এক রাতে চরম অপমান করেছেন। দুজনই আলাদাভাবে চোখ মুছতে মুছতে সেট ছেড়ে গেলেন। আমি নিশ্চিত ছিলাম, এঁরা আর কখনো হুমায়ূন আহমেদের কাছে আসবেন না। কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে দুই সপ্তাহের মাথায় তাঁদের অন্য নাটকে শুটিং করতে দেখি।

কেউ কেউ এ-ও বলেছেন যে তিনি আসলে মানুষজনকে অপমান করতেন প্রকাশ্যে, কিন্তু পরক্ষণেই এ জন্য অনুশোচনায় ভুগতেন। মাথা ঠান্ডা করে পরের দিন সকালবেলা হয়তো এমন মধুর সুরে তাঁদের কাছে বিষয়টা উপস্থাপন করতেন, তখন আর কেউ রাগ পুষে রাখতে পারতেন না। মানুষকে

AMARBOI.COM

অভিভূত করার এক বিশেষ ক্ষমতা তাঁর ছিল বলেই অনেক অপমান নিমেষেই মানুষ ভুলে যেত।

আমার ক্ষেত্রে এমন ঘটনা প্রায় ঘটেই গিয়েছিল। অল্পের জন্য রক্ষা। অনেকেই আমাকে বলেছেন, 'কি ভাই, আপনি এখনো আছেন! বাইরের কেউ তো এত দিন থাকেনি!' আমি বলি, 'কই, আমাকে নিয়ে তো সে রকম কিছু হয়নি, তবে সেদিন হতে গিয়েছিল।'

২০১০ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ঢাকা এসেছেন *মনের মানুষ* ছবির প্রিমিয়ারে। সঙ্গে গৌতম ঘোষ। সমরেশ মজুমদারও আছেন। ছবির প্রিমিয়ারের আগের দিন ঢাকা ক্লাবের সিনহা লাউঞ্জে ফরিদুর রেজা সাগরের একটা শিশুতোষ বইয়ের প্রকাশনা উৎসব ছিল।

প্রধান অতিথি হুমায়ূন আহমেদ, উদ্বোধক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। অনুষ্ঠান শেষে দুপুরের খাওয়ার আগে নিচের লাউঞ্জে আড্ডায় মিলেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বেলাল চৌধুরী, হুমায়ূন আহমেদ, শাওন, স্থপতি আবু করিম ও মাজহার। তাঁদের সঙ্গে আমি। এ আসরে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে বাদবাকি সবাই পরিচিত। শুধু আমি অচেনা। আমাকে পরিচয় করিয়ে দেন হুমায়ূন আহমেদ। এবং এ পরিচয়ের সময় আমি যেসব কাজ করি তা অনেক গুণ বাড়িয়ে বাড়িয়ে বললেন। তাঁর একটা অংশ ছিল এরকম : 'সে খুব ভালো ভ্রমণকাহিনি লেখে এবং বেশ কিছু অসাধারণ ট্রাভেল ডকুমেন্টারি বানিয়েছে...।' হুমায়ূন আহমেদের কথা শেষ হলে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আমার দেশভ্রমণ নিয়ে জানতে চান। আমি সব বলি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর *ছবির দেশে কবিতার দেশে* নিয়ে অনেক প্রশ্ন করি। মার্গারিটা নামের মেয়েটি কি আসলেই ছিল, নাকি তাঁর বানানো, নাকি কিছু আসল কিছু নকল? জিজ্ঞেস করি, 'নন-ফিকশন লেখার সময় আপনি কি সত্যের সঙ্গে কিছু রংচং মাখান?' জবাবে তিনি বলেছিলেন, 'আমি যখন আত্মজৈবনিক কোনো কিছু লিখি, আমি মিথ্যা কিছু বা কোনো কল্পনার আশ্রয় নিই না। কল্পনা করে গল্প-উপন্যাস লিখি।'

AMARBOI.COM

আমি মুগ্ধ হয়ে তাঁর কথা শুনি। আমার হাতে আইফোন। তাঁর ছবি তুলি কয়েকটা। আমার এক বন্ধুকে সঙ্গে সঙ্গে ই-মেইল করে পাঠাই। আইফোন কী করে কাজ করে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে বোঝাই। একসময় লক্ষ করি, কথাবার্তা শুধু আমাদের মধ্যেই হচ্ছে, বাকিরা আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে, আমি কথা কমাই। খাবারে মনোযোগ দিই।

পরদিন *মনের মানুষ* ছবির প্রিমিয়ার শেষে সন্ধ্যায় দখিন হাওয়ায় গিয়ে ছবিটির অনেক প্রশংসা করি আমি। হুমায়ূন আহমেদ পুরো দেখেননি,

ইন্টারভেলের সময় চলে আসেন। এর একটু পরই ঘটল বড় বিপত্তি। তিনি আমার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন।

আমরা আড্ডার জন্য ডাইনিং টেবিলে বসব। আজ তাস খেলা হবে। স্যার আমাকে দেখেই বলেন, 'আচ্ছা, গতকাল আমি অবাক হলাম তোমাকে দেখে। তুমি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের হাজার হাজার ছবি তুলছ, ড্যাবড্যাব করে তাকাচ্ছ—কেন?'

বললাম, 'স্যার, একসময় তাঁর অনেক অনেক লেখা পড়েছি। কখনো তাঁকে দেখিনি। কাল প্রথমবারের মতো তাঁর সঙ্গে আমার দেখা। রক্ত-মাংসের সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আমার পাশের সোফায় বসে আছেন, আমি স্যার সত্যিই কিছুটা মুগ্ধ ছিলাম।' এবং হঠাৎ মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, 'তা ছাড়া স্যার, আমি মনে করি, তিনি দুই বাংলার সেরা লেখক।'

'কে বলেছে সুনীল দুই বাংলার সেরা লেখক?'

আমি কাঁচুমাচু করছি। স্যার যথেষ্ট উত্তেজিত। কী করব ঠিক বুঝতে পারছি না। তিনি বেশ চটে আছেন। এত জোরে কখনো আমার সঙ্গে কথা বলেননি। আবার চিৎকার শুরু করলেন, 'তোমার চেহারা দেখে মনে হয়েছিল, তুমি মুগ্ধ হয়ে ঈশ্বর দেখছ। এত মুগ্ধতা দেখানোর তো কিছু ছিল না?'

আমি অত্যন্ত ঠান্ডা স্বরে বললাম, 'স্যার, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়ে যে পরিমাণ মুগ্ধতা আপনি দেখিয়েছেন, আমি সে তুলনায় কিছুই দেখাইনি। আপনার মুখে শুনেছি, আপনার বড় মেয়ে নোভার বিয়েতে আপনি সস্ত্রীক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে বিয়ের আসরে উপস্থিত করিয়েছেন। মেয়ের বিয়েতে এটাই ছিল আপনার উপহার। আপনি তাঁকে কলকাতা থেকে ঢাকায় এনে রিসিপশন দিয়েছেন। আপনার নুহাশ পল্লীতে সুনীলকে কেন্দ্র করে বিশাল পার্টি দিয়েছেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কতবার আপনাকে কলকাতায় দাওয়াত করে নিয়েছেন আর কী আতিথেয়তা দেখিয়েছেন! আপনার মুগ্ধতার কাছে আমার মুগ্ধতা কিছুই না।'

আমার বক্তৃতা শেষ। এবার তৈরি হয়ে আছি। এখনই তিনি বিশাল চিৎকার করে একটা বাজে কথা বলবেন আমাকে এবং হয়তো এক্ষুনি আমার বেরিয়ে যেতে হবে দখিন হাওয়া থেকে। আমার একবার বেরিয়ে যাওয়া কিন্তু এক মাস পর আবার ফেরত আসা নয়।

কিন্তু ঘটনা সে রকম কিছুই ঘটল না। তিনি প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য কমলকে টেবিল সাজানোর নির্দেশ দেন। আমরা খেলাধুলা শুরু করে দিই এবং স্বাভাবিক ঠাট্টা-মশকরায় মশগুল হয়ে যাই।

AMARBOI.COM

তিনি এত স্বাভাবিক আচরণ করেন, আমার বিশ্বাস করতেই বরং কষ্ট হচ্ছিল যে কিছুক্ষণ আগে আমরা বিশাল ঝগড়াঝাঁটির মধ্যে ছিলাম।



তাঁর কয়েকটি জন্মদিন

ঘরের বাইরে হুমায়ূন আহমেদ তাঁর প্রথম জন্মদিন পালন করেছিলেন ১৯৯৫ সালে। সেটা ছিল তাঁর ৪৭তম জন্মদিন। হুমায়ূন আহমেদের প্যাকেজ যুগের প্রথম দিকের নাটকগুলোর পরিচালক এবং পরবর্তী সময়ে প্রধান সহকারী মনির হোসেন জীবন আমাকে বলেছিল এ কথা। এই আয়োজনে সস্ত্রীক হুমায়ূন আহমেদ, তাঁর তিন মেয়ে, ছেলে এবং স্ত্রী গুলতেকিন আহমেদের এক ভাই ও তাঁর স্ত্রী—এ কজনই উপস্থিত ছিলেন। নিতান্ত ঘরোয়া পারিবারিক আয়োজন।

হুমায়ূন আহমেদের বইয়ের প্রকাশকেরা তাঁর জন্মদিন অনুষ্ঠানকে ঘরের ভেতর থেকে বের করে আনেন ১৯৯৮ সালে, তাঁর ৫০তম জন্মবার্ষিকীতে। *ভোরের কাগজ*-এ তাঁর জন্মদিনের এ সংবাদটি দেখে আমিও ছুটে গিয়েছিলাম। অনেক দিন হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে দেখা হয় না। ভাবলাম, যদি এ উপলক্ষে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়। *অঙ্গনা* ছেড়ে দেওয়ার পর আমার যোগাযোগ রাখার সুযোগ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু লেখকের জন্মদিনে কী উপহার নিয়ে যেতে পারি! হাতের কাছে একটা মূল্যবান ছবি আছে। ভাবলাম, এটা যদি উপহার হিসেবে নিয়ে যাই, কেমন হয়?

১৯৮৬ সালে বইমেলার সংবাদ সংগ্রহের জন্য তাঁর একটি ছবি তুলেছিলাম ইয়াসিকা এমএফটু অটোফোকাস ক্যামেরায় নিউ মার্কেট থেকে সস্তায় কেনা সাদাকালো রিফিল ফিল্মে। সেই ছবিটা ছিল—অ্যাপ্রন পরা কয়েকজন মেডিকেল ছাত্রী তাঁর অটোগ্রাফ নিতে বই হাতে দাঁড়িয়ে আছে। সেই অটোগ্রাফ-প্রার্থীদের একজন আজ নানা কারণে আলোচিত। তিনি তসলিমা নাসরিন। তসলিমা কয়েকজন বান্ধবীর সঙ্গে বই উঁচিয়ে রেখেছেন লেখকের সই নেওয়ার জন্য, এমন একটা দৃশ্য যে আমার কাছে আছে, তা তাঁর জানা নেই। এ ছবিটা সে সময় যদিও কাগজে ছাপা হয়েছিল, এটা কি তাঁর চোখে পড়েছিল? জানি না। এ ছবিটা অনেক আগেই আমি ফুলপেজ প্রিন্ট করে রেখেছিলাম। ছবিটা রয়ে

AMARBOI.COM

গেছে। বাঁধাই করার সময় নেই এখন, আমি শুক্রাবাদের এক দোকান থেকে ছবিটা লেমিনেশন করে রওনা দিই ইস্কাটনের লেডিস ক্লাবের দিকে।

লেডিস ক্লাবের মূল হলটির পেছনে শামিয়ানা টাঙিয়ে বানানো হয়েছে প্যান্ডেল। মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। এক পাশে তাঁর বইয়ের স্টল। পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে *হুমায়ূন ৫০* নামে একটা বেশ মোটাসোটা বই ছেপেছে সময় প্রকাশন। অনেকেই বক্তৃতা করছেন। আমি বক্তৃতা-মঞ্চের কাছে যাই না। বাইরে দেখা হয় আহসান হাবীবের সঙ্গে। তাঁর কাছে আমার উপহারটি দিয়ে বলি, 'এটা স্যারের কাছে পৌঁছাবেন।' শাহীন ভাই ছবিটা দেখে বলেন, 'খুবই ইন্টারেস্টিং ছবি, সে খুব মজা পাবে এটা দেখে।'

বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করি তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য। একসময় তিনি এলেন এবং মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে, অত্যন্ত নার্ভাস ভঙ্গিতে কিছু বললেন। আজ ১৪ বছর পর তার সবটুকু আর মনে নেই। যেটুকু মনে আছে, তিনি বলেন, 'প্রকাশকেরা যখন এখানে আমার জন্মদিনের অনুষ্ঠান করার প্রস্তাব দেয় তখন আমি কিঞ্চিৎ দ্বিধার মধ্যে পড়ি। ঘরের বাইরে আমার জন্মদিনের অনুষ্ঠান হবে—এটা ভাবতে আমার বেশ সংকোচ বোধ হচ্ছিল। মনের একটা অংশ আবার বলছিল—হোক না, দেখি কী হয়।' তিনি বলেন, 'আমি কখনোই আশা করিনি যে আমার জন্য এ রকম একটা অনুষ্ঠান হবে আর এত লোক এখানে উপস্থিত থাকবে। আমি আপনাদের ভালোবাসায় ধন্য...।'

AMARBOI.COM

পরবর্তী ১০ বছরের জন্মদিনের ইতিহাস আমার আর জানা হয়নি।

২০০৮ সালে হুমায়ূন আহমেদ ষাটে পড়বেন। ৬০তম জন্মদিন পালনের জন্য নানা রকম জল্পনাকল্পনা শুরু হলো দখিন হাওয়ার আড্ডায়। মাসুদ আখন্দ প্রতি সন্ধ্যায় নতুন নতুন আইডিয়া নিয়ে আসছেন। আমি শুনি। আমার এক কানের এপাশ দিয়ে ঢোকে—আর্মি স্টেডিয়াম, এসএমএস, ফোন কোম্পানি, কয়েক হাজার হিমু, সারা দেশ, চ্যানেল আই লাইভ—এসব শব্দ। আমার অপর কানের পাশ দিয়ে এগুলো বেরিয়ে যায়, সব মনে থাকে না। কারণ, কোনো কিছুই কার্যকর হয় না। যা হলো সেটা হচ্ছে, হুমায়ূন আহমেদের প্রকাশকেরা মিলে পাবলিক লাইব্রেরিতে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর জন্মদিন পালন করবেন।

২০০৮ সাল থেকে নতুন করে তাঁর জন্মদিনের আনুষ্ঠানিক উদ্‌যাপন করছেন হুমায়ূন আহমেদের বইয়ের প্রকাশকেরা। যদিও ১৪ জন প্রকাশক তাঁর বই ছাপেন, এত দিনে তার প্রায় একক কর্তৃত্ব চলে আসে অন্যপ্রকাশের ওপর। ৫০তম জন্মদিনের বছর আসলে অন্যপ্রকাশ ভূমিষ্ঠ হয়েছিল বলতে গেলে হুমায়ূন আহমেদের বই নিয়েই। এই ১০ বছরে প্রকাশনা সংস্থাটি

দাঁড়িয়ে যায় প্রধানত হুমায়ূন আহমেদের বইগুলো সম্বল করে। বাণিজ্যিক ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক পরস্পরকে এমনভাবে পরিপূরক করে রাখে যে হুমায়ূন আহমেদও সবচেয়ে নির্ভার থাকতেন অন্যপ্রকাশের কাছে বই দিয়ে।

২০০৮ সালে পাবলিক লাইব্রেরি চত্বরে হুমায়ূন আহমেদের বইয়ের সপ্তাহব্যাপী মেলা দিয়ে শুরু হয় জন্মদিনের উৎসব। ১৩ নভেম্বর বেলা এগারোটায় বইমেলার উদ্বোধন করেন লেখকজননী আয়শা ফয়েজ, তাঁর সঙ্গে থাকেন হুমায়ূনপত্নী মেহের আফরোজ শাওন, ছেলে নিষাদ।

২০০৮ সাল থেকে আমি আছি আসরের সব আয়োজনে। কিন্তু আমার এই অংশগ্রহণের প্রথম বছরই মাজহারের সঙ্গে আমার গন্ডগোল লেগে গেল। মাজহার চেয়েছিল, হুমায়ূন আহমেদের ৬০তম জন্মদিনের অনুষ্ঠান দিয়েই শুরু হবে তাঁকে নিয়ে আমার বানানো প্রামাণ্যচিত্রের কাজ। আমি বলে দিলাম, 'ক্যামেরাম্যানসহ আমি ক্যামেরা পাঠিয়ে দেব, অনুষ্ঠান শেষে তোমার কাছে ক্যাসেটগুলো চলে যাবে। আমি ডকুমেন্টারি করছি না।'

'এত ইমোশনাল হতে নাই, একদিন পস্তাবা। ওটা ভুলে যাও, তুমিই করবা ডকুমেন্টারি, একজন মানুষকে নিয়ে অনেকেই তো বানাতে পারে, তুমি তোমার মতো বানাবা।'

'আমি বানাব না। এটাই আমার সিদ্ধান্ত।'

মাজহার এ ক'দিনে জেনে গেছে আমার একটা রগ সামান্য ত্যাড়া। ফলে আমাকে বেশি খোঁচায় না।

হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গ পর্বের সূচনার কিছুদিন পরই (মে-জুন ২০০৮) আমার গাড়ির বুটে ক্যামেরা ট্রাইপয়েড নিয়ে গিয়েছিলাম নুহাশ পল্লীতে। রাতে আড্ডা চলছে। কাল দিনের বেলায়ও আমরা থাকব। বিকেলে ঢাকা ফেরা। আড্ডার এক ফাঁকে বললাম, 'স্যার, আমি ক্যামেরা নিয়ে এসেছি, আপনি যদি অনুমতি দেন, কাল সকালবেলা আপনাকে নিয়ে নুহাশ পল্লীতে হাঁটব, গল্প করব এবং এটা ক্যামেরায় রেকর্ড করব। আমি শাহ আবদুল করিমকে নিয়ে *ভাটির পুরুষ* বানিয়েছি, আপনাকে নিয়েও একটা বানাব।'

হুমায়ূন আহমেদ কিছু বলতে যাবেন, এমন সময় শাওন বলে, 'হবে না, ওকে নিয়ে আমি ডকুমেন্টারি বানাব।'

ঠুস করে বেলুন ফুটার মতো আমিও ফুটে গেলাম। মেনে নিলাম শাওনের সিদ্ধান্ত। স্যারও নির্বাক। আমরা আড্ডা মারি, খাই এবং ঘুমাই। পরদিন বেলা করে ঘুম থেকে উঠি, নুহাশ পল্লীতে হাঁটাহাঁটি করি, ফুলের নাম, গাছের নাম শুনি। বিকেলবেলা দুপুরের ভাত খেয়ে ঢাকার পথে আমরা রওনা দিই। মাজহারও দেখল

AMARBOI.COM

আমার ভিডিও ক্যামেরা আর গাড়ির বুট থেকে বের করা হয় না।

তাঁর ৬০তম জন্মদিনের এই অনুষ্ঠান বসেছিল পাবলিক লাইব্রেরি অডিটোরিয়ামে। পুরো মঞ্চে লম্বা একটা টেবিল, পুরো টেবিলটি তাজা গোলাপ দিয়ে মোড়ানো। টেবিলের পেছনে একটিমাত্র চেয়ার। সেখানে বসে আছেন বার্থডে ম্যান—হুমায়ূন আহমেদ। মঞ্চে আর কোনো অতিথি নেই। তাঁর জন্মদিনে চারটি নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হলো, তিনটি ছিল অন্যপ্রকাশ থেকে ছাপা, অপরটি অনন্যার। এ ধরনের অনুষ্ঠানে কোনো বিশিষ্টজন প্রধান অতিথি হিসেবে থাকেন। এখানে তাঁর নিজের পরিবারের বাইরে কোনো অতিথি নেই।

বইগুলোর মোড়ক উন্মোচন করেন লেখকজননী আয়শা ফয়েজ, লেখকপত্নী মেহের আফরোজ শাওন, লেখকপুত্র নুহাশ হুমায়ূন ও অপর লেখক ইমদাদুল হক মিলন।

ইমদাদুল হক মিলনের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে কথা বলেন নানাজন, জন্মদিনের শুভেচ্ছা দেন এবং প্রথমবারের মতোই হলভর্তি দর্শকের সামনে কথা বলতে আসে মেহের আফরোজ শাওন। পিনপতন স্তব্ধতার ভেতর দর্শকেরা তার কথা শোনেন। কথা শেষ হলে হলের মধ্যে বেশ জোরে তালিও পড়ে।

অনুষ্ঠানের পর হুমায়ূন আহমেদ তাঁর ঘনিষ্ঠজনদের নিয়ে রাতের খাবারদাবারের জন্য যাবেন গুলশানের ক্যাডেট কলেজ ক্লাবে। মাজহার আমাকে দিয়ে দোতলার পুরো রেস্টুরেন্ট ফ্লোর বুক করিয়ে রেখেছে। সন্ধ্যা সাড়ে আটটার দিকে ২০-২৫ জনের দল নিয়ে হুমায়ূন আহমেদ যখন এসে বসলেন, তখন একটা থমথমে ভাব দেখি পুরো চত্বরেই। প্রিয় লেখকের জন্মদিনের অনুষ্ঠান, সেখানে হই-হুল্লোড়, আনন্দ-ফুর্তি থাকার কথা, সেটা নেই।

একটা টেবিলের এক পাশে হুমায়ূন আহমেদ ও নুহাশ, অপর পাশের একটা চেয়ারে শাওন বসে আছে। কারও মুখে কোনো কথা নেই। শাওনের দিকে তাকিয়ে মনে হলো, সে বোধ হয় কাঁদছে। তার মুখ নিচু, ভালো করে দেখা যাচ্ছে না।

কিছুক্ষণ পর কোনো খাবার না খেয়েই নুহাশ চলে গেল। নুহাশের বক্তৃতার একটা কথা নিয়ে এ পরিস্থিতি। হুমায়ূন আহমেদ নিজে এ ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন এ রকম :

> সে বলল, আমার বাবা যখন খুব অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ছিলেন তখন তাঁর পাশে আমি উপস্থিত থাকতে পারিনি। তিনি যখন চার-পাঁচটা বিয়ে করেন তখনো আমি ছিলাম অনুপস্থিত। আজ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে ভালো লাগছে।

AMARBOI.COM

আমার মাথার ভেতর সব কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে গেল। ছেলে এইসব কী বলছে? আমি দ্বিতীয় বিয়ে করেছি। চার-পাঁচটা করিনি। আজকের অনুষ্ঠানে দ্বিতীয় বিয়ে টেনে আনাও অশোভন। সে সেখানে চার-পাঁচটা বিয়ে কোথায় পেল?

অনুষ্ঠান চলছে। গানবাজনা হচ্ছে। আমি ছেলের পাশে চুপচাপ বসে আছি। একবার ভাবলাম জিজ্ঞেস করি, 'বাবা! চার-পাঁচটা বিয়ের ব্যাপারটা কী?' তারপরই মনে হলো, কী হবে জিজ্ঞেস করে।

(বল পয়েন্ট, হুমায়ূন আহমেদ)

৬০ বছর পূর্তি জন্মোৎসবের পর হুমায়ূন আর মাত্র দুটি জন্মদিনের অনুষ্ঠান পেয়েছিলেন দেশে ২০০৯ ও ২০১০ সালে। ২০১১-এর জন্মদিনে তিনি চিকিৎসার জন্য আমেরিকার নিউ ইয়র্কে ছিলেন। তবে তিনটি জন্মদিনেই ২০০৮ সালের জন্মদিন উৎসবের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। পাবলিক লাইব্রেরির চত্বরে হুমায়ূন আহমেদের বইয়ের প্রকাশকেরা ১০ দিনের জন্য বইমেলার আয়োজন করেন।

হুমায়ূন আহমেদের আনুষ্ঠানিক জন্মদিনের বাইরে তাঁর আরেকটি জন্মদিন উৎসব হতো তাঁর নিজের ফ্ল্যাট দখিন হাওয়ায়। আগে নিশ্চয়ই নুহাশ পল্লীতেও হয়েছে, আমি পাইনি। তবে ২০০৮ সালের পর থেকে তাঁর সব জন্মদিন খুব কাছে থেকে দেখেছি আমি।

নিজেকে তিনি বলতেন, 'বাইরে যাব মরতে?/ থাকব আমি গর্তে।' আমজনতার কাছাকাছি যাওয়া বা তাঁর কাছে আমজনতার আসার সুযোগ থাকত না। জন্মদিনে যে তাঁর দরজা সবার জন্যই খোলা থাকত, সেটাও সবাই জানত না। যারা জানত, তারা ১২ নভেম্বর সন্ধ্যার পর আসতে শুরু করত। হুমায়ূন আহমেদের ফ্ল্যাটের দরজা সব সময় খোলা থাকত—সেটা জন্মদিন বলে কথা নেই। এক রহস্যময় কারণে তিনি দরজা ভেতর থেকে বন্ধ না করেই ঘুমাতেন। ভাগ্যিস, খবরটা পাড়ার চোর-ডাকাতদের জানা ছিল না। অভ্যাগতদের পরিচয় জানার জন্য নিচের তলায় অ্যাপার্টমেন্টের দারোয়ানরা অবশ্য সব সময়ই সক্রিয় থাকে। ওদের কাছে অচেনা মনে হলেই গেট পাস করার আগে অনুমতি নিয়ে নিত। কিন্তু ১২ নভেম্বরের রাতে এটা থাকত না। খুব বেশি না হলেও কুড়ি-পঁচিশ-তিরিশ জন ভক্ত-অনুরাগী প্রবেশ করত সে সময়। এমনও শুনেছি, তাঁর এমন দু-চারজন অনুরাগী ছিলেন, যাঁরা বছরের এই একটি সন্ধ্যায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। বেশির ভাগই ফুল নিয়ে আসতেন, কেউ কেউ কাপড়চোপড়। এগুলো খুলে দেখার পর কিছু এপাশে কিছু ওপাশে রাখতেন। ওপাশেরগুলো কাউকে দিয়ে দেওয়ার জন্য। কাপড়চোপড় পরতেন খুব সাদামাটা—নরম, সুতির।

AMARBOI.COM

১২ নভেম্বরের রাতে তাঁর বন্ধুদের কখনো ডাকতেন না। কিন্তু বন্ধুদের জন্য খাবারের পুরো আয়োজন করে রাখতেন। রাত আটটার পর প্রিয় বন্ধুদের নিয়ে আড্ডায় বসে যেতেন। এঁদের সঙ্গে প্রাত্যহিক আড্ডার লোকজন তো আছেনই। প্রায় প্রতি সন্ধ্যায়ই তাঁর মা, সন্তানসহ বোনেরা, ভাই আহসান হাবীব এবং ছেলে নুহাশকেও দেখেছি। তাঁরা একটু দেরি করেই আসতেন।

আমাদের আড্ডা শেষ হতো রাত ১২টার পাঁচ মিনিট আগে। তারপর তিনি মাকে নিয়ে কেক কাটতেন, সঙ্গে স্ত্রী-পুত্র, ভাই-বোন। সে রাতে গানের আসর হতো। এস আই টুটুল দেশে থাকলে তানিয়া ও ছেলেদের নিয়ে আসত। ৪০-৫০ জনের মহাফুর্তির আয়োজন। অবারিত খানাপিনা, আনন্দ উৎসব।

২০১০-এর জন্মদিনের রাতে, কাকতালীয়ভাবে ভরা জ্যোৎস্না ছিল। আকাশে পূর্ণচন্দ্র। পরদিন বলেছিলেন, 'কাল রাতে আমি খুব চিন্তায় ছিলাম। আমার মনে হয়েছিল, আমার মৃত্যু হবে কোনো এক পূর্ণিমা রাতে। মৃত্যুর জন্য জন্মদিনের তারিখটা বেশ ভালো। যে তারিখে জন্ম, সে তারিখে মৃত্যু। কাল রাতে মনে হয়েছিল, আমি বোধ হয় আজ মারা যাব। যাক, রাতটা পার করে দিয়েছি, কোনোমতে এ যাত্রা রক্ষা!' সম্ভবত এটাই ছিল বাংলাদেশে হুমায়ূন আহমেদের শেষ জন্মদিন পালন।

২০১১ সালের ১৩ নভেম্বর ছিল জীবৎকালে হুমায়ূনের শেষ জন্মদিন। কিন্তু সেদিন তিনি দেশে ছিলেন না। তাঁর চিকিৎসা চলছে আমেরিকায়। অথচ জন্মদিনের আয়োজন হঠাৎ আরও বেড়ে গেল। সবকিছু আগের বছরের মতোই। সেই পাবলিক লাইব্রেরিতে বেলুন ওড়ানো, একক বইমেলা, তার সামনের স্টেজে আলোচনা অনুষ্ঠান। আলোচনা অনুষ্ঠানটি ছিল মূলত লেখকের রোগমুক্তি ও দীর্ঘ জীবন কামনার। বক্তৃতা করতে এসে সালেহ চৌধুরী কান্নাভেজা কণ্ঠে একটি চন্দনকাঠের মালা দেখালেন। ভারতের বেঙ্গালুরুর কোনো এক পীরের কাছ থেকে তাঁর ছেলে এই মালা পাঠিয়েছেন বাবার কাছে। তিনি এটা দু-তিন দিনের মধ্যে আমেরিকায় পাঠাবেন। তাঁর ধারণা, এই মালা হাতে পরে থাকলে তিনি দ্রুত আরোগ্য লাভ করবেন। বক্তৃতার সময় ওই মালা তিনি দেখালেন। তাঁর আবেগের সংক্রমণ ঘটল উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাদের মধ্যে। এ রকম একটা আবেগময় পরিবেশের মধ্য দিয়ে শেষ হলো অনুষ্ঠান।

সে রাতে তাঁর একান্ত উপস্থিতি ছিল দখিন হাওয়ায় কম্পিউটারে। দখিন হাওয়ার দোতলার এক পাশে হুমায়ূন আহমেদের বাসা, অপর পাশে মাজহারুল ইসলামের। তিনি সপ্তাহ খানেক আগে মাত্র এসেছেন নিউ ইয়র্ক থেকে। সেখানে গিয়ে ইন্টারনেটে স্কাইপে দিয়ে কথা বলা ও ছবি দেখার বিষয়টি রপ্ত করে

AMARBOI.COM

এসেছেন। হুমায়ূন আহমেদ বলে দিয়েছেন, জন্মদিনের প্রথম প্রহরেই তিনি তাঁর মা, ভাইবোন ও সন্তানদের সঙ্গে কথা বলতে চান, তাঁদের দেখতে চান। এ জন্যই স্কাইপের আয়োজন। মাজহারের ল্যাপটপে দ্রুত স্কাইপে ইনস্টল করে দিই এবং খুব সহজে সংযোগও ঘটে যায়। রাতে এ ফ্ল্যাটে এসে উপস্থিত হয়েছেন মা আয়শা ফয়েজ, বোন শেফু এবং তাঁর ছেলেমেয়েরা, এসেছে নুহাশও।

বাংলাদেশের রাত ১২টা মানে নিউ ইয়র্কের দুপুর দুইটা। হুমায়ূন আহমেদ কম্পিউটারের সামনে এসে বসেন। ক্যামেরার দিকে তাকান। তাঁর মাথায় টুপি। একবার টুপি খোলেন, মাথায় চুল প্রায় নেই। ছাঁটার পর একটু একটু গজালে যেমনটি দেখায় তেমনই।

মাজহার প্রথমে কথা বলে একে একে যারা উপস্থিত আছে সবার কথা জানিয়ে দেয়। নুহাশের সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন প্রথমে। নুহাশ এসে সামনের চেয়ারে বসে। সে তার বাবার মাথায় চুলের দিকে তাকিয়েই দুহাতে মুখ ঢেকে উঠে যায়, 'না, আমি কথা বলব না।'

নুহাশ চলে যাওয়ার পর পর কথা বলেন মায়ের সঙ্গে, বোনের সঙ্গে। সবাই একটু একটু হাই-হ্যালো করছেন। সবার একটিই কথা—আমরা দোয়া করছি, আপনি দ্রুতই সুস্থ হয়ে উঠবেন। তিন-চার মিনিট পর আবার ডাক পড়ল নুহাশের। নুহাশ এসে বসল। এবার সে বেশ স্বাভাবিক। এবার বাবা-ছেলের কথা হয়। হুমায়ূন আহমেদ প্রশ্ন করেন, 'তোমার পড়াশোনা কেমন চলছে? ক্লাস কবে শুরু হবে?' এটুকুই।

এরপর নিজেই বলেন, 'আমি এখন যাই, সবাই ভালো থেকো তোমরা।' হুমায়ূন আহমেদ চেয়ার ছেড়ে উঠে যান। ল্যাপটপের স্ক্রিনে একটা খালি চেয়ার পড়ে থাকে।

AMARBOI.COM



দখিন হাওয়ার দুঃখী আড্ডা

দখিন হাওয়ার আড্ডাটা একটা নতুন রূপ পেল ২০১১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ার দিকে। হুমায়ূন আহমেদ যখন সিঙ্গাপুর থেকে ফিরেছেন এক দুঃসহ সংবাদ নিয়ে।

খবরটা আমি শুনি আরও চার দিন আগে, সেপ্টেম্বরের ৭ তারিখে, যেদিন মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালের নিষ্ঠুর ডাক্তার তাঁকে দুঃসংবাদটি শোনালেন। সিঙ্গাপুর থেকে খোকন ভাই (সিঙ্গাপুর-প্রবাসী লেখক ও ব্যবসায়ী শহীদ হোসেন) এ খবর প্রথম শোনায় মাজহারকে। মাজহারের কণ্ঠ থেকে স্বর বেরোচ্ছে না, আমিও কথা বলতে পারছি না। ঢাকার দুই প্রান্তে দুজন কানের কাছে ফোন লাগিয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকি। একসময় মাজহার বলল, 'খবরটা আপাতত কাউকে জানানোর দরকার নেই। খেয়াল রাখবা, মিডিয়া যেন কোনোভাবেই না জানে।'

খবরটি সে আরও কয়েকজনকে জানায়। প্রত্যেককে আমার মতোই সাবধান করে দেয়। কিন্তু কেউ কেউ কথা রাখেনি। ১০ সেপ্টেম্বর রাতে তিনি ঢাকা এসে নামেন, পরদিনই কাগজে বেরিয়ে যায় খবরটি। দখিন হাওয়ার বাসায় আসা শুরু হয় তাঁর স্বজনদের।

এমনিতে আমি কখনোই ডাক না পেলে তাঁর বাসায় যেতাম না। কারণ, প্রতি সন্ধ্যায় আড্ডার জন্য তিনি প্রস্তুতও থাকতেন না। কিন্তু এখন নিয়মকানুন সব পাল্টে গেছে। ঘরের মধ্যে ঢুকেই দেখি ঠিক আগে যে রকম লেখা পাঠের আসর বসত, সে রকম একটা আড্ডার পরিবেশ। ড্রয়িংরুমের মেঝেতে বিছানো কার্পেটের ওপর বসেছেন হুমায়ূন আহমেদ। দর্শক-শ্রোতারা যথেষ্ট মনমরা। কিন্তু যাঁর জন্য মন খারাপ, তিনি যথেষ্ট হাসিখুশি রয়েছেন। তাঁর যেন ফুর্তির শেষ নেই। ক্যানসার ধরা পড়েছে, এ যেন এক অতি আনন্দের সংবাদ!

AMARBOI.COM

প্রথমবার আমেরিকার ভিসা পেলে যেমন ফুর্তি-ফুর্তি একটা ভাব দেখা যায়, অনেকটা সে রকম। ভিসা কনফার্ম, শুধু টিকিট কাটা হয়নি, ডেট পাওয়া যাচ্ছে না বলে ডিপারচার ডেট বলা যাচ্ছে না। সে রকম একটা ভাব তাঁর মধ্যে।

মাজহারকে বলছেন, 'তুমি কাল আমার কুলখানির ব্যবস্থা করো। আইটেম রাখবা ভাত, গরুর মাংস ভুনা আর কালোজিরার ডাল। আমার সব বন্ধুকে দাওয়াত দিয়ে দাও। আমি নিজ হাতে তাদের খাওয়াব। মরার পর যদি কোনো ভেজাল-টেজাল হয়, সবাই হয়তো দাওয়াতই পাবে না। আর শোনো, সন্ধ্যায় শোকসভাটাও করে ফেলো। মরার পর কে কী বলবে আমি তো শুনতে পাব না।'

এর মধ্যে ফোন আসে। তিনি কথা বলেন এপাশ থেকে। আমরা শুনি।

'জি আপা, স্লামালেকুম...হ্যাঁ...হ্যাঁ...আমি তো যাচ্ছি, আপনার

হাজব্যান্ডের সঙ্গে দেখা হবে ওখানে, আপনার কোনো খবর থাকলে দিবেন, আমি বলে দেব।' এসব।

কথা হচ্ছিল তাঁর কন্যা নোভার শাশুড়ির সঙ্গে। নোভার শ্বশুর নেই, মারা গেছেন অনেক আগে। তাঁর কথাই বলা হচ্ছিল।

আমরা শুনে হাসি। এ বড় কঠিন হাসি।

মনে পড়ে, বহু বছর আগে তাঁর লেখা দুই চরিত্রের একটা মঞ্চনাটকে (*স্বপ্নবিলাস*) ক্যানসারে আক্রান্ত নায়িকার বাবাকে নিয়ে নায়কের কী রকম রসিকতাই-না ছিল। একটা রেলস্টেশনের ওয়েটিং রুমে দুটি ছেলেমেয়ের দেখা হয়। তাদের সংলাপ :

ছেলে : 'আপনার বাবার কী হয়েছে?'

মেয়ে : 'ক্যানসার।'

ছেলে : 'ক্যানসার হলে খামাখা চিকিৎসা করে টাকা নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। একটা বাঁশ দিয়ে ঠাশ করে মাথায় বাড়ি দেন। যন্ত্রণা শেষ করে দেন।'

মেয়ে : 'আপনি এসব কী বলছেন!'

ছেলে : 'সত্যি কথা বলছি।'

এখন যে লেখাটি তিনি পড়ে শোনাচ্ছেন তাঁর নাম 'মাইন্ড গেইম'। ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়ার পরে তাঁর লেখকসত্তা ঠিক আছে কি না, এটা পরীক্ষা করে দেখার জন্যই এই লেখা।

তিনি কয়েকটি শিশুর উদাহরণ দিচ্ছেন, যাদের প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'তোমার বাবা এবং মা এ দুজনের একজনকে যদি বাঁচানোর সুযোগ থাকে, তুমি কাকে বাঁচাবে?'

এ রকম একটি জটিল পরিস্থিতিতে কোন শিশু কেমন জবাব দিয়েছিল, সে নিয়েই লেখা। লেখায় দেখা গেল, প্রায় সব বাচ্চাই তাদের মাকে বাঁচাতে চেয়েছে। একমাত্র ইমদাদুল হক মিলনের মেয়ে বলেছে, সে তার বাবাকে বাঁচাতে চায়। কারণ, তার বাবা একজন লেখক।

লেখাপড়া শেষ। হাততালি পড়ে। হুমায়ূন ভিডিও ক্যামেরায় প্যান করার মতো তাঁর চোখটি ঘোরান। লেফট টু রাইট, আবার রাইট টু লেফট সবার মুখের দিকে তাকান। কে কেমন আচরণ করছে, দেখছেন।

এর মধ্যে আলমগীর ভাই খবর দিলেন, পূরবী বসুকে পাওয়া গেছে, 'স্লোন ক্যাটারিং'-এ অ্যাপয়েন্টমেন্টের খবর নিচ্ছেন। মাজহার জানাচ্ছে, টিকিট হয়ে গেছে, ১৪ তারিখ ভোরের ফ্লাইটে, কুয়েত এয়ারওয়েজে। হুমায়ূন আহমেদ

AMARBOI.COM

আলমগীর ভাইকে বলছেন, 'পূরবীকে বলেন, ১৫ বা ১৬ তারিখেই যেন অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যবস্থা করে। শাওন ইন্টারনেট নিয়ে বসেছে হাসপাতালের কত কাছাকাছি দুই বেডরুমের ফার্নিশড ফ্ল্যাট কত কম ভাড়ায় পাওয়া যায় তার খোঁজখবর নিতে। আয়োজন দেখে মনে হচ্ছে, বেশ ক'মাসের জন্য তাঁদের থাকার চিন্তা।'

সিঙ্গাপুর থেকে ফেরত আসার পর এবং ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১১ রাত শেষে নিউ ইয়র্কের উদ্দেশে যাত্রা করার আগে পর্যন্ত আড্ডার হালচাল ছিল মোটামুটি এ রকমই।

১২ সেপ্টেম্বর ২০১১, আড্ডা বসেছে নিষাদের রুমে। এ রুমে ছয়-সাতজন বসা যায়, এসি আছে। লোকজন কম হলে এ জায়গাটিই স্যারের বেশি পছন্দ। আড্ডায় আছেন তাঁর প্রাত্যহিক সঙ্গীরা। সেদিনও স্যারের সেই লেখাটা আবার পড়ে শোনানো হলো। বিমর্ষ মুখে শাওন পড়ছে। এর মধ্যে নতুন খবর নিয়ে ঘরে ঢুকলেন ডা. এজাজ। তিনি একই ধরনের রোগের তিনজন রোগীর কেস হিস্ট্রি দিলেন। এক মহিলা চেন্নাইতে কোলন ক্যানসারের অপারেশন করার পর ১১ বছর ধরে বহাল তবিয়তে বেঁচে আছেন। আরও দুজন সফল হয়েছেন। ডা. এজাজকে গাজীপুর চৌরাস্তার এক ডাক্তার বলেছেন, অপারেশন হয়ে গেলে স্যারের জীবন মিনিমাম ১০ বছর বাড়ানো যাবে। এ ১০ বছরের মধ্যে আরও অনেক উন্নত ব্যবস্থা চলে আসবে। সুতরাং অন্তত আগামী ২০ বছরের মধ্যে আল্লা চায়তো স্যারের মৃত্যুর কোনো আশঙ্কাই নেই। এসব।

AMARBOI.COM

এই ফাঁকে হুমায়ূন আহমেদ নিজে শোনান তাঁর অসুখ ধরা পড়ার কথা। সিঙ্গাপুরে পায়ের চিকিৎসার জন্য যাবেন শাওনের মা বেগম তহুরা আলী এমপি। হুমায়ূন আহমেদ ও বাচ্চাদের নিয়ে সঙ্গে গেলেন শাওন। শাশুড়ির চিকিৎসা চলছে মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে। একপর্যায়ে তাঁর নিজেরও শরীরটা পরীক্ষা করানো দরকার মনে করলেন। রক্ত পরীক্ষা ও টিউমার মার্কিং টেস্টে অতিউচ্চ একটা মাত্রা ধরা পড়ল। চৈনিক চিকিৎসকের সঙ্গে তাঁর সংলাপ ছিল অনেকটা এরকম :

ডাক্তার : 'আপনার পায়খানা কি ফিতার মতো, না মোটা মোটা?'

হুমায়ূন : 'এটা খেয়াল করিনি।'

ডাক্তার : 'মলের সঙ্গে কি রক্ত যেত?'

হুমায়ূন : 'ভাই, আমি তো নিউজ পেপার বিছিয়ে পায়খানা করি না, কী করে বলব?'

আসলেই তাঁর রক্ত যেত। তিনি খেয়ালও করেছেন। আসলে আমল দেননি।

সিঙ্গাপুরের এ ডাক্তার তাঁর টিউমার টেস্টের খারাপ রেজাল্ট পেয়ে আরও কতগুলো পরীক্ষা করতে বলেন। তাঁর একটি হচ্ছে রেকটামের মধ্যে একটি টিউব প্রবেশ করিয়ে কিছু-করা। তাকে নিয়ে যাওয়া হয় এক রুমে।

এ পরীক্ষা করার জন্য এসেছে 'অত্যন্ত রূপবতী' এক তরুণী নার্স। সে ভারতীয়। হুমায়ূন আহমেদ কোনো অবস্থায় তাকে দিয়ে এ কাজটি করতে দেবেন না। বললেন, 'পুরুষ পাঠাও।' মেয়েটি একসময় বলল, 'ইফ আই কল ইউ পাপা, উইল ইউ লেট মি টু ডু সো?'

এ কথা শুনে তাঁর মন ভিজে গেল। তিনি বললেন, 'ইয়েস ইউ ক্যান ডু।'

মেয়েটি বলল, 'পাপা, প্লিজ টার্ন অ্যাবাউট।'

হুমায়ূন আহমেদ পাশ ফিরলেন।

এই পরীক্ষার পরপরই আগের ডাক্তারের কাছে তাঁর রিপোর্ট চলে যায়। তিনি ডাক্তারের কাছে গিয়ে হাজির হন। চৈনিক ডাক্তার অত্যন্ত স্বাভাবিক স্বরে বলেন, 'ইট ইজ পজিটিভ দ্যাট ইউ হ্যাভ ক্যানসার, নো ডাউট অ্যাবাউট ইট।'

হুমায়ূন আহমেদ বলেন, 'ডাক্তার আমাকে খবরটা এমনভাবে দিলেন যে, তোমার একটু আমাশয় হয়েছে।'

এসব গল্পই তিনি বলছেন হাসতে হাসতে। এ সময় তাঁর শাশুড়িকে নিয়ে আরেকটি ঘটনা বলেন।

তাঁর শাশুড়ি একই হাসপাতালে এ সময় চিকিৎসা নিচ্ছেন এক ভারতীয় বাঙালি চিকিৎসকের কাছে। এ চিকিৎসক বাংলাদেশের লেখক হুমায়ূন আহমেদের কিছু বই পড়ছেন, আরও পড়তে চান। তিনি তাঁর রোগীদের প্রায়ই বলেন, 'আপনারা দেশে চলে যাচ্ছেন, আবার তো কিছুদিন পর আসবেন। আসার সময় সম্ভব হলে হুমায়ূন আহমেদের কয়েকটি বই আমার জন্য নিয়ে আসবেন।'

নানাজন নানা কথা বলে। যেমন :

'এটা কোনো বিষয়ই না, তিনি আমাদের ফ্যামিলি ফ্রেন্ড, প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসেন। বই নিয়ে আসব।'

'আরে হুমায়ূন আহমেদ তো আমাদের দূরসম্পর্কের আত্মীয়...।'

'এটা কোনো বিষয় হলো? আমার সঙ্গে রেগুলার দেখা হয়, আমি প্রত্যেকটা বইতে আপনার নাম লিখে সাইন করিয়ে নিয়ে আসব।'

কিন্তু কেউই তাঁর জন্য বই নিয়ে যায় না।

AMARBOI.COM

বেগম তহুরা আলী ডাক্তারকে বললেন, 'চিন্তা করবেন না ডাক্তার সাহেব। আমি আপনার জন্য হুমায়ূন আহমেদের বই নিয়ে আসব। উনি তো আমার মেয়ের জামাই।'

ডাক্তার ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে রইলেন।



আপনি ভালো আছেন তো!

১৩ সেপ্টেম্বর ২০১১। ভোর রাতেই তিনি চলে যাবেন নিউ ইয়র্কে। এ পর্যায়ে আজ তাঁর শেষ রাত দখিন হাওয়ায়। দুপুর থেকেই দর্শনার্থীদের আসা-যাওয়া। কাউকে খুব বেশি সময় দিচ্ছেন না। বিকেলবেলা লেখক আনিসুল হক বিদায় নিতে গিয়ে বললেন, 'স্যার, আমি নিশ্চিত, আপনি অন্তত আরও ১০ বছর বাঁচবেন।'

হুমায়ূন আহমেদ রসিকতা করে বললেন, 'চাইবাই যখন একটু বেশি চাও। ১০ বছর কেন, বলো ২০ বছর।' বলে নিজেই হেসে উঠলেন।

সন্ধ্যার পর গিয়ে দেখি, লোকসমাগম আরও বেশি। আসর বসেছে ড্রয়িংরুমে। *প্রথম আলোর* আলীম আজিজ ও চিত্রশিল্পী ধ্রুব এষ বসে আছেন। সম্ভবত আগে একটা সাক্ষাৎকার পর্ব হয়ে গেছে। সাক্ষাৎকার শেষ হয়ে গেলে সাংবাদিকদের চলে যাওয়ার কথা। কিন্তু তাঁরা যাচ্ছেন না। মুগ্ধ হয়ে স্যারের রসিকতা শুনছেন। সাধারণত এ রকম সময়ে হুমায়ূন আহমেদ সাংবাদিক মোকাবিলা করেন না। আজ সবকিছু আলাদা।

তিনি সব সময় ফ্লোরের ওপর কার্পেট বিছিয়ে বসেন, তাঁর সঙ্গে বাকিরাও। কিন্তু আজ বসেছেন চেয়ারের ওপর পা তুলে। তাঁর হাতে কিছু কাগজ। ঘরের মধ্যে দুজন আত্মীয় আছেন, একজন তাঁর মামা। এর বাইরে তাঁর প্রতিদিনের আড্ডার প্রায় ফুল টিম। শাওন শেষ মুহূর্তের গোছগাছ নিয়ে ব্যস্ত। একই রকমের ব্যস্ততা মাজহারেরও। সে-ও যাচ্ছে সঙ্গে। আড্ডায় যাঁরা আছেন, সবার মুখে খুব হাসি-হাসি ভাব। সবাই তাঁকে এটাই বোঝাতে চাইছেন যে কোলন ক্যানসারের যে অপারেশনটা হবে নিউ ইয়র্কে সেটা কিছুই না। সবচেয়ে আত্মবিশ্বাসী দুই ডাক্তার। ডা. এম এ করিম এবং তাঁর ছাত্র

AMARBOI.COM

অভিনেতা ডা. এজাজুল ইসলাম। চান্স পেলেই এ দুজন বোঝাতে চেষ্টা করছেন যে আজকাল ক্যানসার কোনো অনিবার্য মৃত্যুবাহী রোগের নাম নয়। সবচেয়ে বেশি কনফিডেন্ট ডা. এম এ করিম। তিনি ১০০ পারসেন্ট গ্যারান্টি দিয়ে বলছেন সব কথা। কথা বলার সময় মাঝে মাঝে আঙুলও উঁচু করছেন।

ডা. করিম হুমায়ূন আহমেদের সবচেয়ে পুরোনো বন্ধু। বাল্যবন্ধু। ষাটের দশকের গোড়ার দিকে হুমায়ূন আহমেদের বাবা সিলেট থেকে বদলি হয়ে যখন বগুড়া চলে যান, সেখানে বগুড়া জিলা স্কুলে ক্লাস এইটে ভর্তি হয়ে হুমায়ূন আহমেদ পরিচিত হন করিমের সঙ্গে। ডা. করিম প্রায়ই বলেন, 'ও আমার একমাত্র বাল্যবন্ধু, যার সঙ্গে তুই-তোকারি সম্পর্ক। হুমায়ূন তার কোনো বন্ধুকে "তুই" বলে না, শুধু আমাকে বলে।' প্রায় ৫০ বছর ধরে তাঁরা পরস্পরের বন্ধু।

কোনো এক অভিমানে দীর্ঘদিন তিনি হুমায়ূন আহমেদের দখিন হাওয়ার ফ্ল্যাটে আসেননি। অসুখের খবর শুনে নিজেকে আর আটকে রাখতে পারেননি। গত তিন দিনে দুবার এসেছেন।

হুমায়ূন আহমেদের আরেক বন্ধুর নামও করিম, তিনি স্থপতি। এই করিম ভাইও ১৯৬৫ সাল থেকে তাঁর সব সুখ-দুঃখের সঙ্গী। হুমায়ূন আহমেদের যাবতীয় স্থাপনার ডিজাইনার তিনি। মজার ব্যাপার, যখন তাঁর বিষয়সম্পত্তি হয়ে ওঠেনি, তখন স্থপতি করিমকে দিয়ে তাঁর নিজের কবরের একটা নকশা করিয়েছিলেন হুমায়ূন আহমেদ। সাদা মার্বেল পাথরের কবর। ২০০৯ সালের জন্মদিনে (১৩ নভেম্বর) প্রকাশিত তাঁর আত্মজৈবনিক গ্রন্থ *কাঠ পেন্সিল*-এর 'অসুখ' নামের একটা অধ্যায়েও (পৃষ্ঠা ৭৫) তাঁর এ শ্বেতপাথরের কবরের কথা, এমনকি তাঁর ওপর কী এপিটাফ লেখা থাকবে তার বর্ণনাও আছে:

> ...আমার উচিত কাগজ কলম নিয়ে এপিটাফ লিখে ফেলা। কল্পনায় দেখছি নুহাশ পল্লীর সবুজের মধ্যে ধবধবে শ্বেত পাথরের কবর। তার গায়ে লেখা:
>
> চরণ ধরিতে দিয়োগো আমারে
> নিয়ো না, নিয়ো না সরায়ে।

১৯৯৬-৯৭ সালের দিকে *আজ রবিবার* ধারাবাহিক নাটকেও তাঁর নিজস্ব মৃত্যুভাবনাগুলো এসেছিল। সেখানেও বৃদ্ধ বাবা (আবুল খায়ের) মৃত্যুর আগে তাঁর কুলখানি করানোর কথা বলেছিলেন তাঁর পরিবারের লোকজনকে ডেকে। এবং তাঁর (আবুল খায়ের) স্থপতি পুত্রকে (আবুল হায়াত) দিয়ে তাঁর নিজের কবরের একটা নকশাও করিয়েছিলেন। হুমায়ূন আহমেদের বন্ধু স্থপতি করিমকে দিয়ে তাঁর নিজের কবরের জন্য যে নকশা করিয়েছিলেন, সেটাই সে

AMARBOI.COM

নাটকের প্রপস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ১৯৯৬ সালে মৃত্যু নিয়ে রসিকতা করার জন্য যে কমেডি দৃশ্যগুলোর রচনা করেছিলেন, ১৫ বছর পর এখন তাঁর নিজের ক্ষেত্রে তাঁর বাস্তব প্রয়োগ ঘটাতে চাইছেন। হায় রে নিয়তি!

রাত ১০টার দিকে নুহাশ এসে দাঁড়ায় ঘরের দরজায়। শুনেছি, দিনের বেলা কয়েক মিনিটের জন্য হুমায়ূন আহমেদের দুই কন্যা নোভা ও শীলা, দুই জামাই এবং নাতি-নাতনিরা এসেছিল। অপর কন্যা বিপাশা আমেরিকা-প্রবাসী। তারা একবার ঘরে ঢুকে পরে বেরিয়ে সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। একসময় হুমায়ূন আহমেদ ওখানে গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করেন। সিঙ্গাপুর থেকে ফেরার সময় নাতি-নাতনিদের জন্য নিজ হাতে কয়েকটি খেলনা নিয়ে এসেছিলেন। খেলনাগুলো তাদের হাতে দেন। একসময় লিফটের সামনের লবি থেকেই তারা সবাই চলে যায়। নুহাশ দরজায় দাঁড়াতেই হুমায়ূন আহমেদ উপস্থিত সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন : 'এই আমার বড় ছেলে, নুহাশ। আসো বাবা, বসো।'

তাঁর পাশে একটা চেয়ার, সেখানে নুহাশকে বসতে বলা হলো।

নুহাশ চুপচাপ বসে থাকে। এত লোকের সামনে বাবা-ছেলে কেউ কোনো কথা বলে না। নুহাশকে খাবার দিতে বলা হয়। নুহাশের জন্য হুমায়ূন আহমেদের কী পরিমাণ ভালোবাসা ও দরদ, তা নুহাশ কেন, সবাই জানেন। তাঁর প্রথম বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের নাম 'নুহাশ চলচ্চিত্র'। তাঁর সবচেয়ে বড় যে বৈষয়িক সম্পত্তি, তার নামও নুহাশ পল্লী। একই সঙ্গে ভাগ্যবান ও ভাগ্যাহত এই ছেলের জন্য হুমায়ূন আহমেদের প্রাণ কতটা হাহাকার করত তার প্রমাণ পাওয়া যায় একটি উৎসর্গপত্রে। ২০০৫ সালে *কহেন কবি কালিদাস* উপন্যাসটির উৎসর্গপত্রে লেখেন :

> একসময় তার পছন্দের চরিত্র ছিল হিমু। সে হিমুর মতো কথা বলতো, হিমুর মতো ভাবতো। তার বোনরা তার কাণ্ড দেখে তাকে একটা হলুদ পাঞ্জাবীও বানিয়ে দিলো। সে গম্ভীর মুখে হলুদ পাঞ্জাবী পরে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলো। কিছুদিন হলো সে জানাচ্ছে হিমু এখন আর তার প্রিয় চরিত্র না। সে এখন মিসির আলীর ভক্ত। মিসির আলীর এই বইটি তার জন্যে—নুহাশ হুমায়ূন দ্য গ্রেট।

একমাত্র নুহাশকেই দেখেছি হুমায়ূন আহমেদের দ্বিতীয় সংসারে বাবার কাছে আসতে, কথা বলতে, এমনকি নুহাশ পল্লীর শুটিংয়ে বাবার কাছে থাকতে। দেশে-বিদেশে বাবার সফরসঙ্গী হয়েছে নুহাশ। আমার দুর্ভাগ্য, বিচ্ছিন্নভাবে তাঁর মেয়েরা কখনো কখনো এ বাসায় এলেও এই চার বছরে

AMARBOI.COM

তাঁদের কাউকে আমি দখিন হাওয়ায় দেখিনি। অবশ্য খালাম্মাকে (হুমায়ূন আহমেদের মা) দীর্ঘদিন এ বাড়িতে থাকতে দেখেছি। আপাদের দেখেছি, আহসান হাবীবও এসেছেন, আড্ডায় যোগ দিয়েছেন। শুনেছি তাঁর ছোট ভাই মুহম্মদ জাফর ইকবালও এ বাড়িতে এসেছেন, কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা হয়নি।

২০১০ সালের কোনো এক সময়, এক সন্ধ্যায় হুমায়ূন আহমেদকে বড় বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। আড্ডার জন্য বন্ধুদের ডেকে আনা হয়েছে, অথচ মুড নেই তাঁর। পাশে একটা চেয়ার দেখিয়ে আমাকে বসতে বলেন। বসে তাঁর মুখের দিকে তাকাই। খুবই বিমর্ষ। একবার মনে হলো, তাঁর চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। কিছুক্ষণ পর চোখ মুছলেন। আমাকে বলেন, 'জানো শাকুর, আমার সবচেয়ে ছোট যে মেয়ে, বিপাশা, আমার সবচেয়ে আদরের মেয়ে ছিল। ওর গায়ের গন্ধ না শুঁকলে আমার ঘুম আসত না। সে যখন একটু বড় হয়ে গেল, আমার বিছানা ছেড়ে দিল। একদিন ছোট্ট একটা শিশি দিয়ে বলে, বাবা, এই শিশির মধ্যে আমার গা ধোয়া পানি আছে। শুঁকে দেখো আমার শরীরের গন্ধ পাবে। তোমার যখন আমার শরীরের গন্ধ শুঁকতে ইচ্ছা করবে, তুমি এই শিশির গন্ধ শুঁকো।'

AMARBOI.COM

এটুকু বলে থামলেন এবং আবার দুই হাত দিয়ে চোখ মুছলেন। অন্ধকারের মধ্যে বসে থাকার কারণে তাঁর চোখের পানি আমি দেখতে পাইনি। আমি আর কোনো প্রশ্নও করি না, কোনো কথাও বলি না। তিনি নিজেই আবার কথা শুরু করেন, 'জানো, আজ তার গায়েহলুদ হচ্ছে ও বাড়িতে। কাল তার বিয়ে। আমি বাবা হিসেবে জানি না, আমার মেয়ের সঙ্গে কার বিয়ে হচ্ছে, কোথায় বিয়ে হচ্ছে। আজ বিকেলে নুহাশ এসেছিল একটা কার্ড নিয়ে। কার্ডটি হাতে নিয়ে বললাম, বাবা, তোমাদের কার্ডে একটা মারাত্মক প্রিন্টিং মিসটেক আছে, এটা সংশোধন করতে পারবে? নুহাশ ড্যাবড্যাব করে তাকায়। তাকে বললাম, এখানে তোমাদের লেখা উচিত ছিল—পিতা মৃত ড. হুমায়ূন আহমেদ। "মৃত" কথাটি থাকলেই বরং তোমাদের জন্য অনেক সুবিধা হতো। বিপাশার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা "বাবা কোথায়" টাইপের কোনো প্রশ্ন করার সুযোগ পেত না।'

হুমায়ূন আহমেদের ধারণা ছিল যে পিতার এই কঠিন অসুখের কথা শুনে অন্তত তাঁর ছেলেমেয়েগুলো আসবে। শেষ রাতের দিকে কুয়েত এয়ারওয়েজের বিমানে উঠবেন, এই শেষ সময়ে যে নুহাশ এসেছে, তাতেই তাঁর অনেক আনন্দ।

এ কদিনে মিলন ভাই বেশ কবার এসেছেন। এত নিয়মিত তাঁকে কখনোই দেখিনি এখানে। স্পেশাল কোনো আয়োজন থাকলে আগে থেকে ডাকা হতো তাঁকে। মিলন ভাইকে নিয়ে অনেক রসিকতা করেন হুমায়ূন আহমেদ। বলেন, 'আমার মৃত্যুর পর যে শোকসভা হবে, সেখানে মিলন কী বক্তৃতা দেবে, জানো?'

'কী স্যার?'

'মিলন বলবে, একদিন বাংলা একাডেমীর মেলায় হুমায়ূন ভাইয়ের সঙ্গে আমার দেখা। হঠাৎ করে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলেন, কাল রাতে তোমার *ও রাধা ও কৃষ্ণ* পড়ে আমি চোখে জল আটকাতে পারলাম না। সারা রাত কাঁদলাম। আমি মিটিমিটি করে হেসে বললাম, থ্যাংক ইউ হুমায়ূন ভাই, আপনার যে এত ভালো লাগবে, এটা আমি কখনো ভাবিনি। এমন সময় হুমায়ূন ভাই বলেন, আরে না, শোনো, আমি কাঁদলাম এটা মনে করে যে, যে ছেলেটা এতটুকুন বয়সে *পরাধীনতা* লিখতে পারে, সে কিনা আজ এসে এসব গাঁজাখুরি সস্তা উপন্যাস লেখে। তার এই লেখক-মৃত্যুর কথা মনে করে আমি সারা রাত কাঁদলাম।'

হাসির রোল পড়ে আড্ডায়। আসলে এমন গল্প তাঁর নিজের বলে চালিয়েছেন আমাদের কাছে আগের কোনো আড্ডায়। ইমদাদুল হক মিলনের জায়গায় বসাতে হবে হুমায়ূন আহমেদ, হুমায়ূন আহমেদের জায়গায় বসাতে হবে আহমেদ ছফার নাম। *পরাধীনতার* জায়গায় *নন্দিত নরকে*, আর *ও রাধা ও কৃষ্ণ*-এর জায়গায় হুমায়ূন আহমেদের বস্তাপচা যেকোনো উপন্যাস। জিনিস একই।

AMARBOI.COM

আড্ডা জমে যায়। তাঁর 'মাইন্ড গেইম' নামক লেখাটি আরেকবার পড়ে শোনান এ আসরে। আস্তে আস্তে বিদায় নেওয়ার পালা শুরু হয়েছে। রাত তখন প্রায় ১২টা। তিন-চার ঘণ্টা পর বেরিয়ে যাবেন। আমরা সবাই চলে যাব। শুধু ডা. এজাজ যাবেন না। তিনি এয়ারপোর্টে তাঁদের নামিয়ে তবেই গাজীপুরে তাঁর বাড়িতে যাবেন। এয়ারপোর্টে বিদায় দিতে যাবেন আলমগীর ভাই ও কমল। আমাকে বললেন, 'বাড়ি চলে যাও।'

আমি যখন বিদায় নিতে চাইলাম, হুমায়ূন আহমেদ হাত বাড়ালেন। এর আগে কখনো আমি হ্যান্ডশেক করে বিদায় নিইনি। এবার তিনি হাত বাড়ালেন। এবং হাত শক্ত করে ধরে বললেন, 'তুমি কিন্তু নিউ ইয়র্কে আসছ। কি, আসবে না?'

খুব সংকটে পড়ে যাই। কী জবাব দেব। আমার ইউএস ভিসা নেই। ইউকে হলে বলতাম, 'স্যার, আপনি যান, আমি সামনের সপ্তায় আসছি।'

কেবল স্যারের সঙ্গ দেওয়ার জন্য কি আমার পক্ষে আমেরিকা যাওয়া সম্ভব?

এর আগে বিদেশ ভ্রমণ নিয়ে আমাদের অনেক কথা হতো। বেশ কয়েকবার বলেছেন, 'তোমাকে নিয়ে একবার বিদেশ ঘুরতে যাব।' বলতাম, 'স্যার, কোথায় যাব?'

স্যার বলতেন, 'অ্যান্টার্কটিকা যাব।' আবার বলতেন, 'আলাসকা কেমন হয়, এস্কিমোদের সঙ্গে কয়েক দিন থাকলাম!' তাঁদের শ্রীলঙ্কা সফরের আগে আমাকে টোপ দিলেন, 'তুমি কি আমাদের সঙ্গে যাবে, তোমার ট্রিপ আমি স্পনসর করব। তুমি শুধু পাসপোর্ট দেবে। তোমার আর কোনো দায়িত্ব নেই।'

আমি তাঁর সঙ্গে কখনো বিদেশ ভ্রমণ করতে পারিনি। এবার সুস্থ হয়ে এলে নিশ্চয়ই শুধু বেড়ানোর জন্য তাঁর সঙ্গে কোথাও যাব। আর যদি তিনি ফিরে না আসেন?

জানি না, আমি কিছুই জানি না। আমি স্যারের হাতের শক্ত বাঁধন থেকে নিজের হাত ছাড়াই, বলি, 'স্যার, আমি চেষ্টা করব।'

এইটুকু বলে বেরিয়ে আসছি। হঠাৎ মনে হলো, কী যেন বাদ পড়ে গেছে। ছোটবেলা আমার বাবা যখন জাহাজের চাকরিতে যোগ দেওয়ার জন্য বাড়ি ছাড়তেন, আমি তো কদমবুসি করে বিদায় দিতাম বাবাকে। তবে হুমায়ূন আহমেদকে নয় কেন? আমি তাঁর কাছে গিয়ে পায়ের কাছে বসি। তাঁর দুটি পা স্পর্শ করি। তিনি আমাকে টেনে তোলেন। বলেন, 'যাও, ভালো থেকো।'

স্যার, আমরা ভালো আছি।

আপনি আছেন তো?

AMARBOI.COM

